তামিল পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাবা-মাকে

দক্ষিণ ভাবতেব কথা ছিল দু খানি গ্রন্থে—দক্ষিণ ভাবত ও দ্রাবিড পর্বে। কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ ভাবতেব কথা এতে সম্পূর্ণ ছিল না।

অন্ধ্রের কথা অন্ধ্র পর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সেই গ্রন্থে দক্ষিণ ভাবত পর্বেব কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছিল কেবালার কথা বাদ দিয়ে বাকি অংশ এই তামিল পর্বে সন্নিবেশিত হল। অনেক নূতন তথ্যও সংযোজিত হযেছে।

কেবালাকে নিয়েও একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বচনাব ইচ্ছা আছে।

গ্রন্থকাব

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বা
সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্।
দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং
দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্॥

ঋগ্বেদ, ৫।৬২।১

"ঋতের দ্বারা সংবৃত আছে এক ধ্রুব, এক ঋত, সূর্য যার মাঝে বিমুক্ত করেন তাঁর অশ্বদের। দশ শত (রশ্মি তাঁর) একত্র হল—সেই তো অদ্বিতীয় তৎ। দেবতাদের সকল বপুর শ্রেষ্ঠ বপু দেখলাম আমি।"

(অনির্বাণ-কৃত অনুবাদঃ 'দিব্যজীবন'—শ্রীঅরবিন্দ)
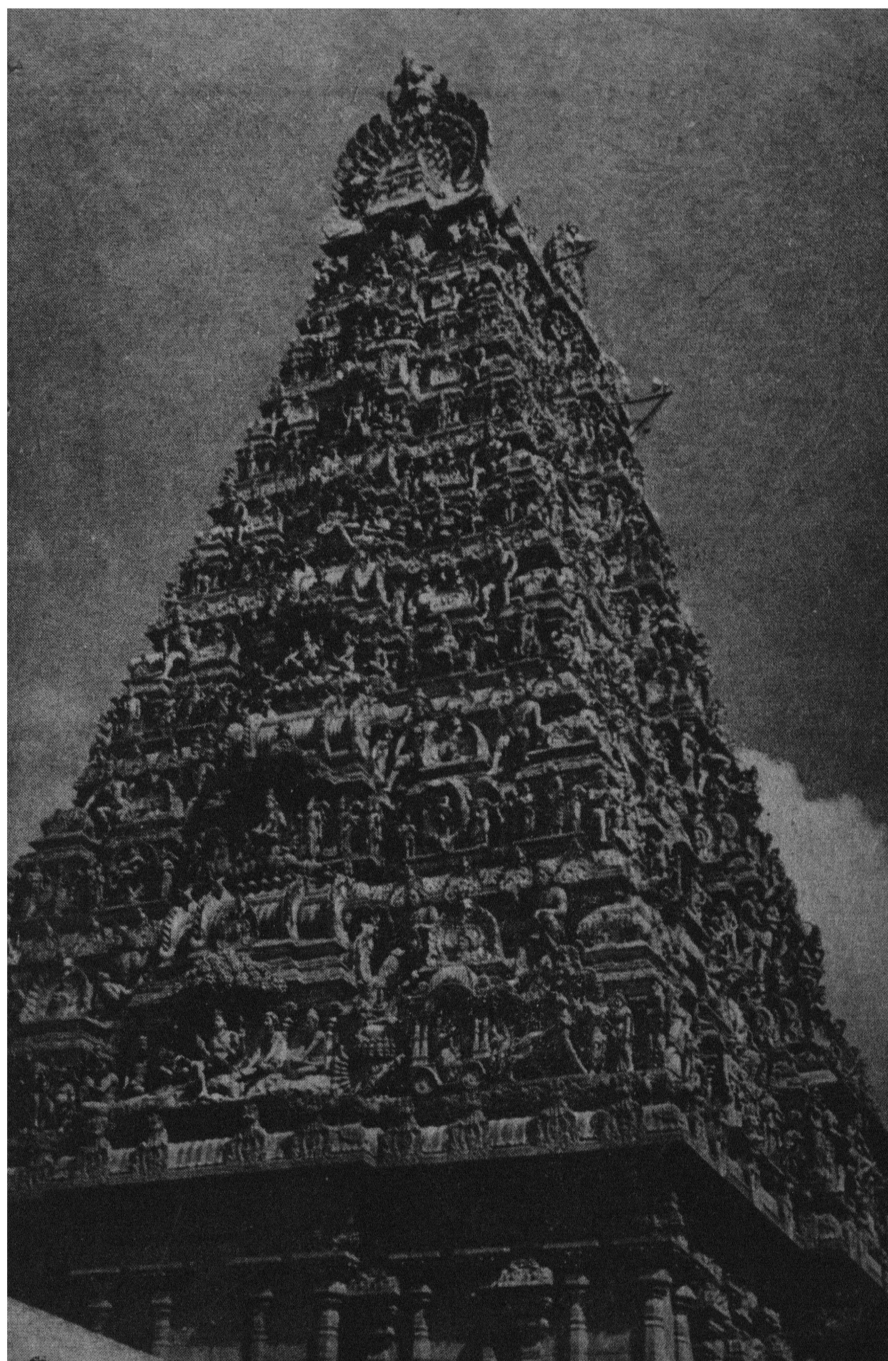
(উপরে) মাদ্রাজের মেরিনা, (নিচে) তাঞ্জোরের রাজপ্রাসাদ
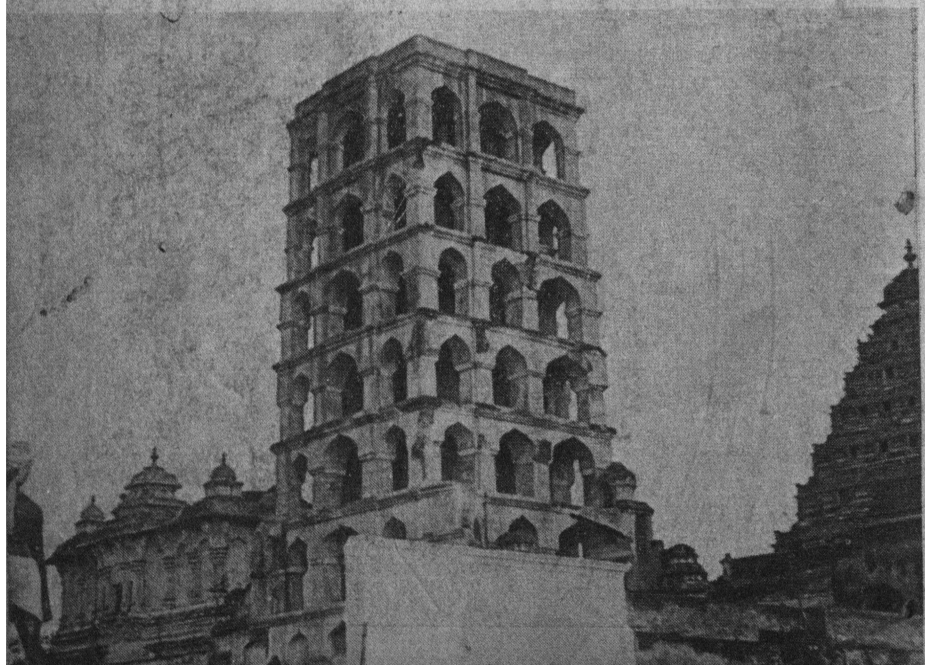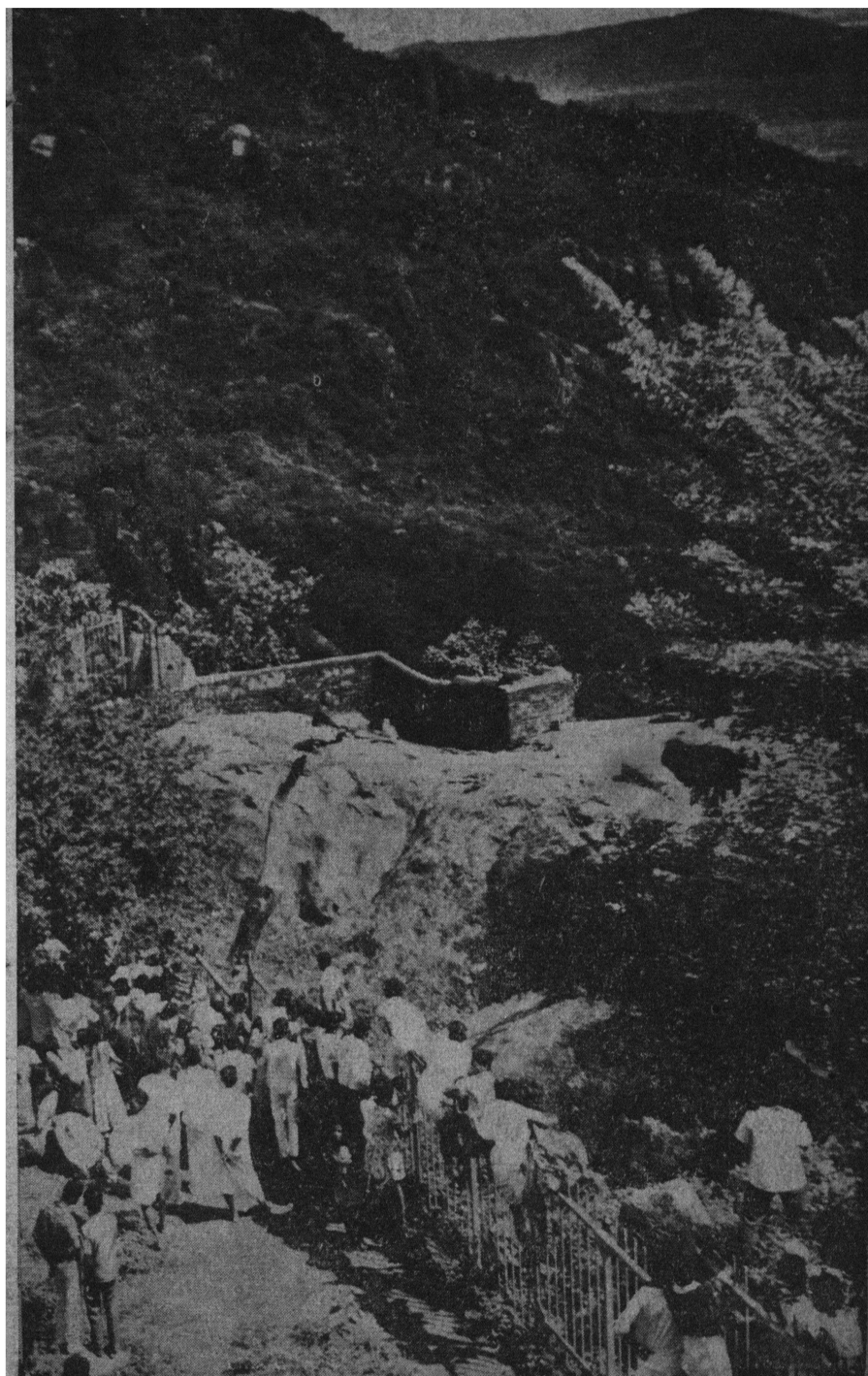
(উপরে) মহিষমর্দিনী গুহা, (নিচে) সপ্তরথ, মহাবলীপুরম ফটো : শীতাংশু মিত্র
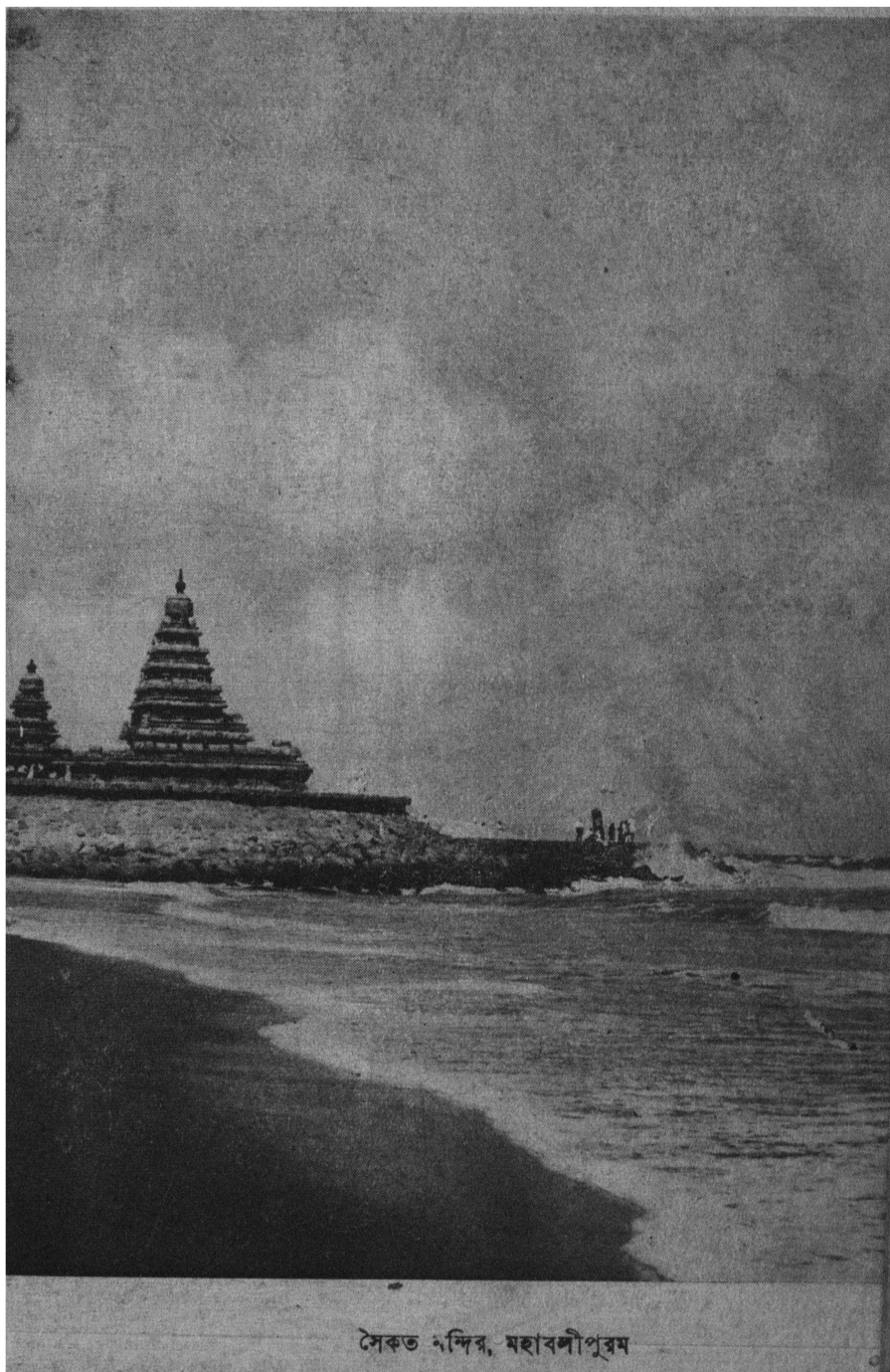
সৈকত মন্দির, মহাবলীপুরম
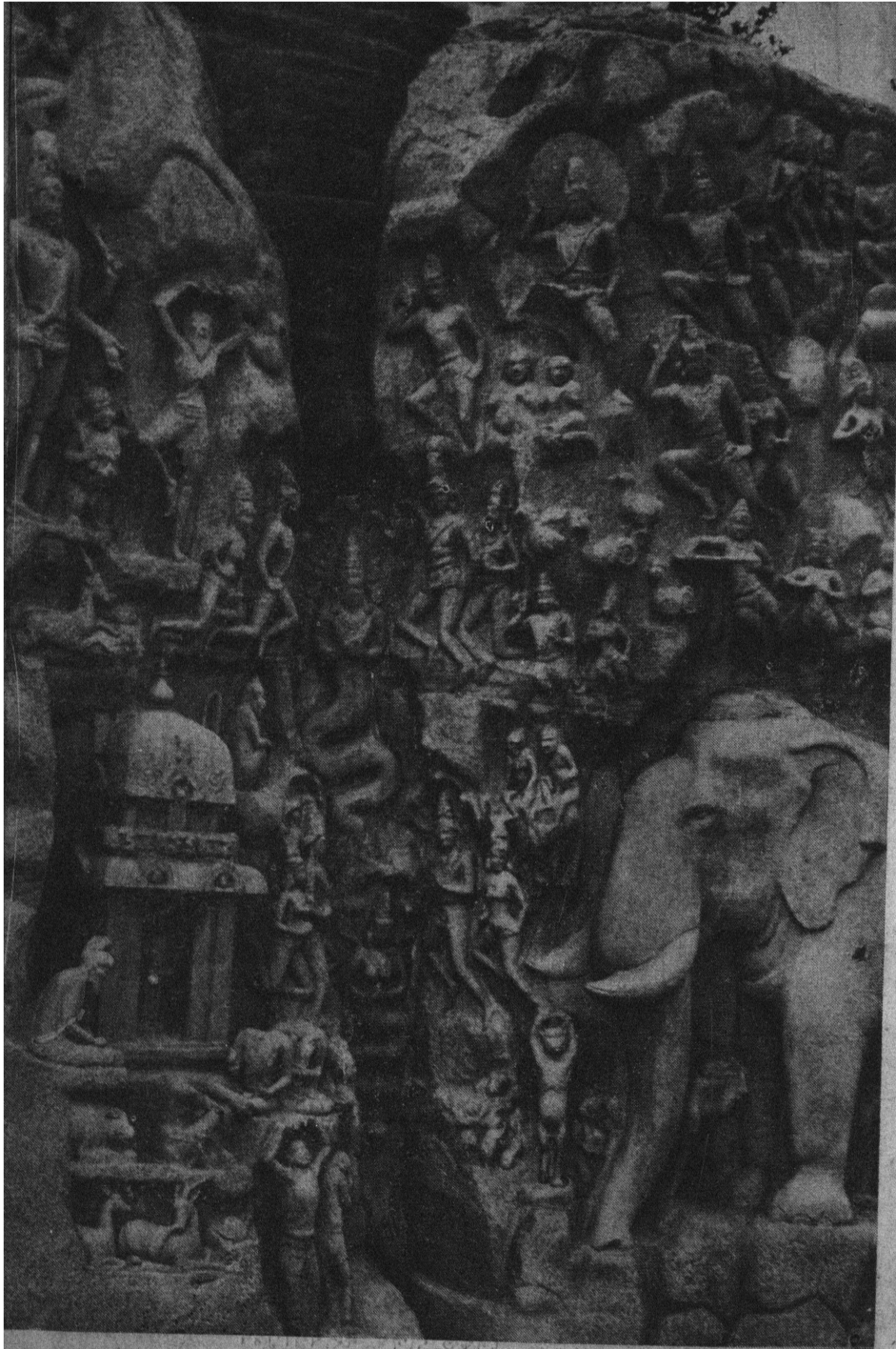
অর্জ্জুনের তপস্যা, মহাবলীপরম
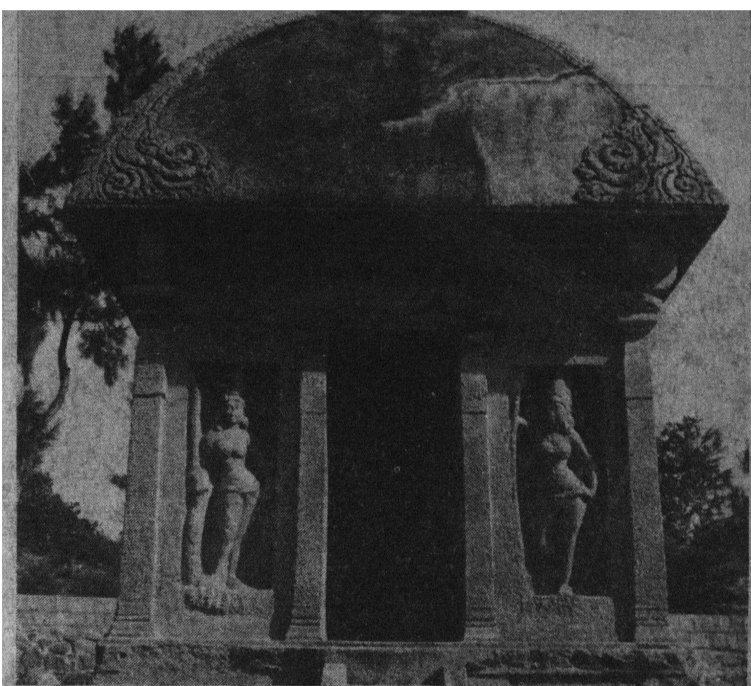
(উপরে) মহাবলীপুরমে দ্রৌপদীর রথ, (নিচে) বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দির

শিবকাঞ্চী মন্দিরের গোপুর
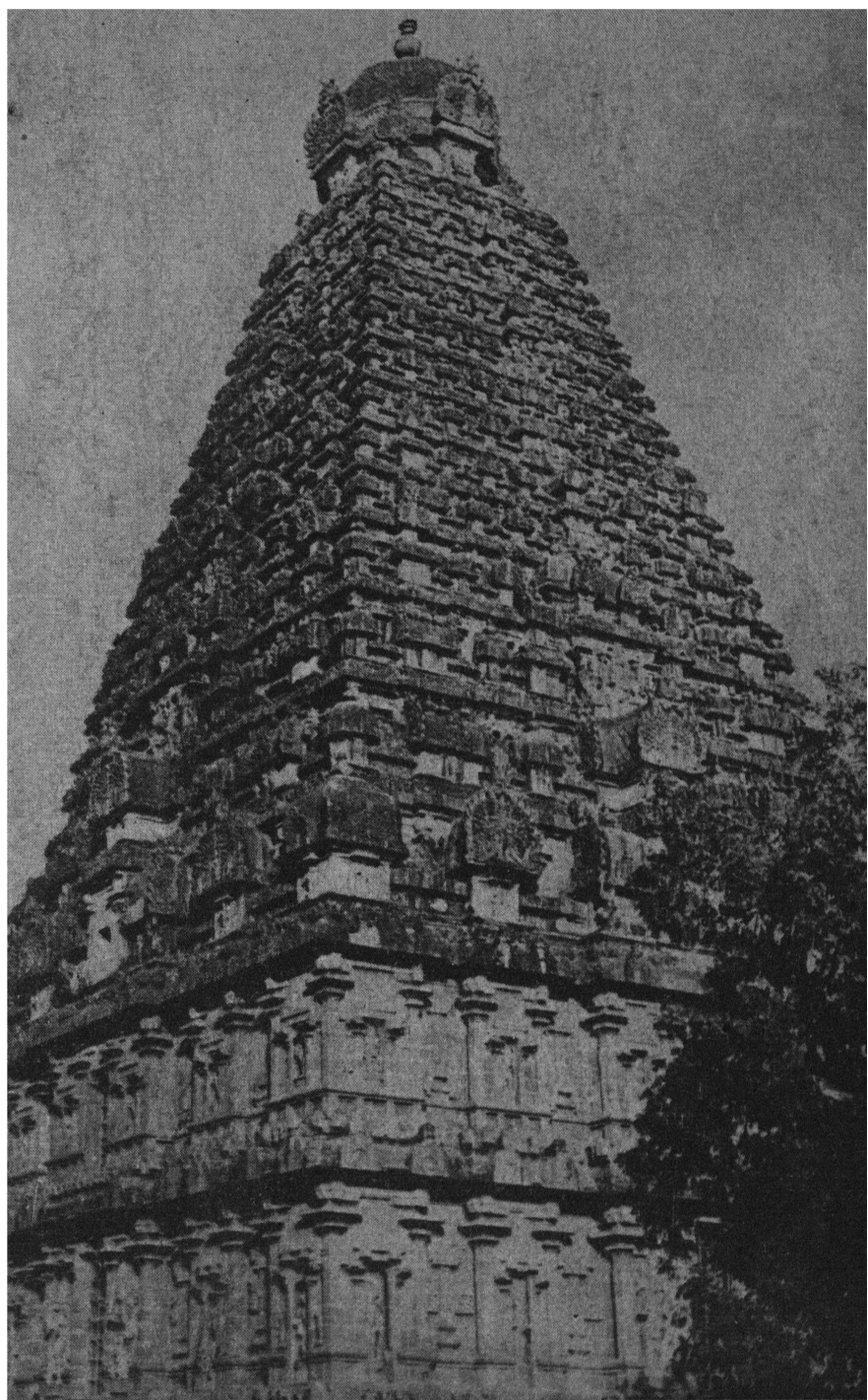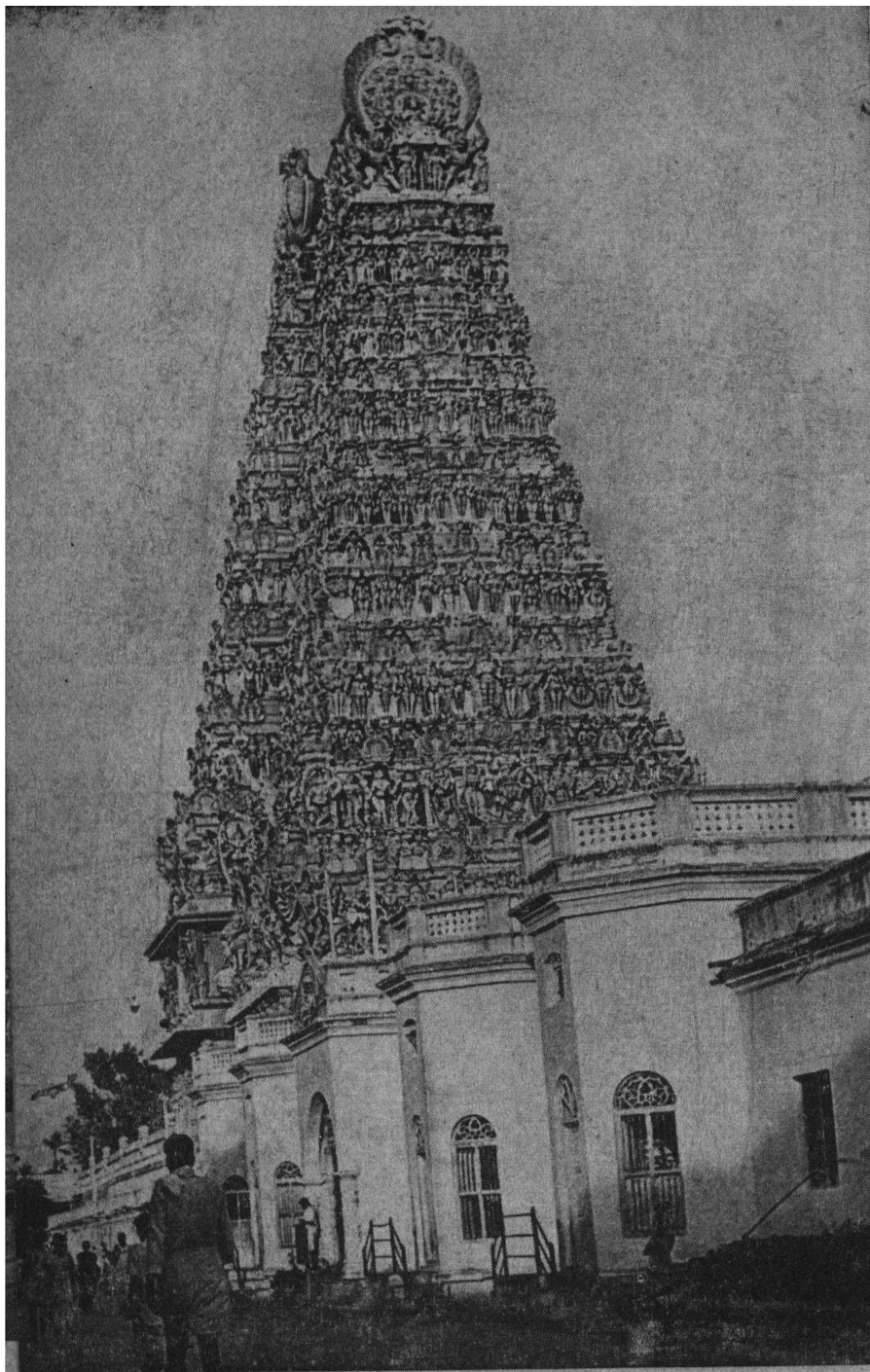
মীনাক্ষী মন্দির, মাদুরা
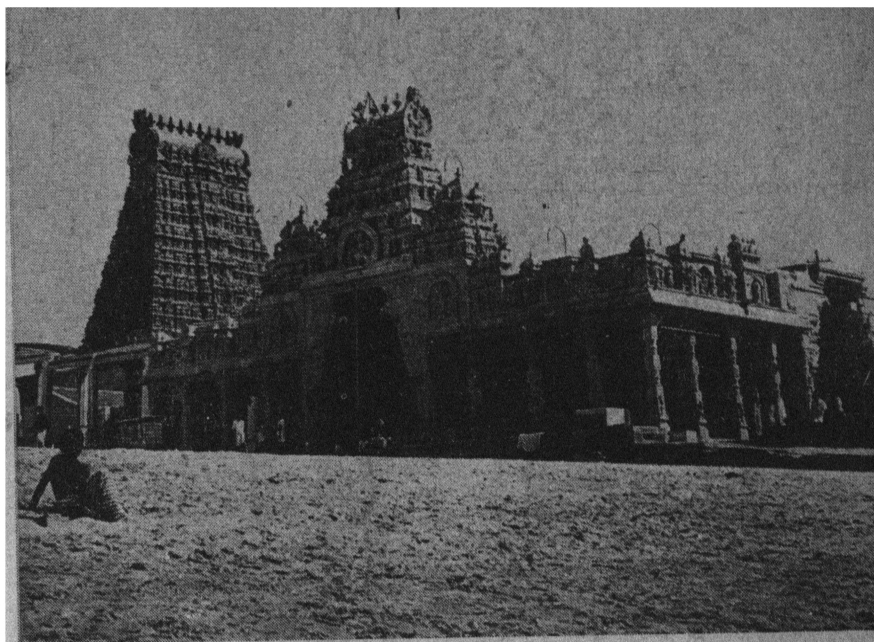
(উপরে) মন্দির, (নিচে) সমুদ্র, তিরুচেন্দুর

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলা

১
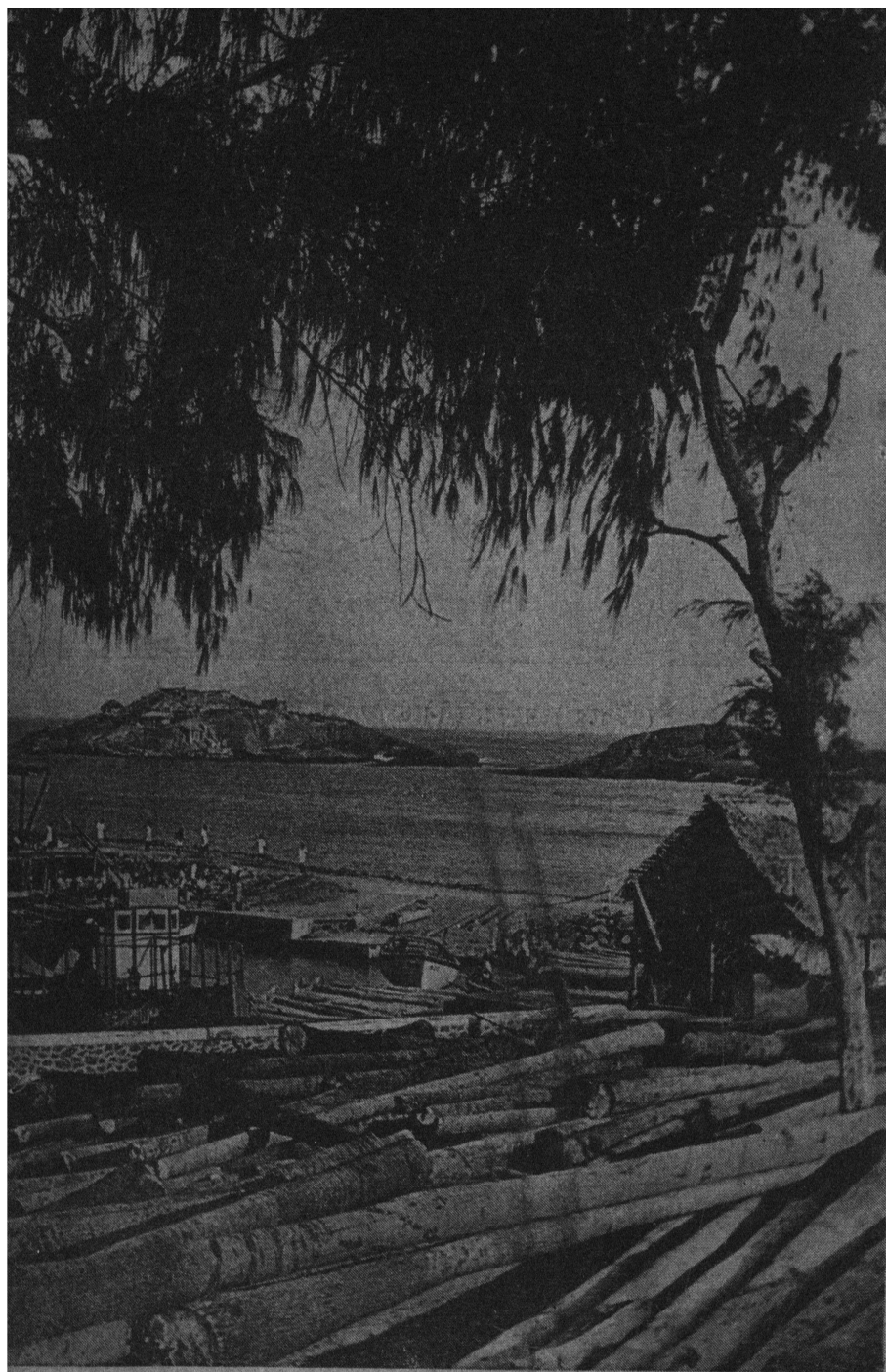
মানুষের জীবনে এমন দিন আসে যা তার স্বপ্নেরও অতীত। চোখের সামনে ঘটতে দেখেও সত্য বলে মেনে নিতে সময় লাগে অনেকটা। এ ঘটনাও ঠিক এমনি। তিরুপতি থেকে আমরা মাদ্রাজ যাচ্ছি। বম্বে-ম্যাড্রাস এক্সপ্রেসের একটা থার্ড ক্লাস গাড়িতে আমরা দুজনে মুখোমুখি বসেছি জানালার ধারে। স্বাতি আর আমি। আর কোন পরিচিত লোক আমাদের সঙ্গে নেই। আমি মুখ তুলে স্বাতিকে দেখছি, আর স্বাতি দেখছে আমাকে।

খানিকক্ষণ লক্ষ্য করবার পরে স্বাতি বলল ঃ ভারি আশ্চর্য হয়েছ দেখছি !

বললুম ঃ সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি।

কেন ?

কলকাতা থেকে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন জানতুম যে তোমাদের চাকর রামখেলাওনের বদলি হিসেবে যাচ্ছি। তার কাজ যে সুষ্ঠুভাবে করতে পারছি নে তা বুঝি। তাই শাস্তির জন্যে প্রস্তুত আছি, পুরস্কারের আশা রাখি নি।

স্বাতি হেসে ফেলল, বলল ঃ একে তুমি পুরস্কার ভাবছ !

নামা একথা বললে উত্তর দিতুম, বড়লোকের কৃপা-দৃষ্টিই গরিবের পুরস্কার। কিন্তু স্বাতিকে একথা বলতে পারলুম না। আমার মনে পড়ল, হাওড়া স্টেশনের আর একটি স্বপ্নাতীত ঘটনা।

পূজার ছুটি হয়েছে। বাড়ি ফেরার লোকাল ট্রেন ধরতে না পেরে মাদ্রাজ মেল দেখতে এসেছিলুম সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে। সেইখানেই দেখা হয়েছিল এই পরিবারের সঙ্গে। এঁরা দক্ষিণভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল এঁদের পুরাতন ভৃত্য। এত দূরের

দেশে একা যেতে মামা ভয় পাচ্ছিলেন,; গাড়ি থেকে নেমে পড়বেন কিনা সেই কথা ভাবছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন ঃ গোপাল কোথায় যাচ্ছ ?

আমি তাঁকে দেখে যত আশ্চর্য হয়েছি, তার চেয়ে বেশি হয়েছি আমাকে চিনেছেন দেখে। বছর কয়েক আগে যখন তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলুম, তখন তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি। না চেনবারই কথা। গরিবকে চেনার নানারকম বিপদ আছে তো !

স্বাতিকে সেদিন আমি চিনতুম না, মামীকেও না। দরজার হাতল ধরে স্বাতি দাঁড়িয়ে ছিল, আর মামী বসে ছিলেন জানালার ধারে। ঢং ঢং করে পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়তেই করুণভাবে মামী বলেছিলেন ঃ তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না বাবা ?

হঠাৎ থই পেয়ে মামা আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন, বললেন ঃ তুমি রাজী হয়ে যাও গোপাল, তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমি তো জাত বাউণ্ডুলে। কাজের দিনে অফিস পালাই আর ছুটির দিনে বাড়ি ফিরি নে। বাহিরের আকাশ আমাকে টানে, সেই টানে ঘরে আমার আজও মন বসে নি। কাল থেকে অফিস ছুটি, ঘরে কেউ নেই যার অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে। তবু—

মামা আমার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন ঃ কই, কথা কইছ না যে !

বড় অসহায় মনে হল তাঁকে। জানালার ভিতর দিয়ে মামীর চোখও দেখলুম বেদনায় ছলছল করছে। আর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁদের কন্যা স্বাতি বড় বড় চোখ মেলে আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে।

ভাববার আর সময় নেই। বড় তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দিল শেষের ঘণ্টা। বড় তীব্র আলো এই প্ল্যাটফর্মে। এই যাত্রীরা যেখানে চলেছে, সেই উদার দিগন্তের স্নিগ্ধ পরিবেশের কোন আভাষ নেই এই কৃত্রিম আলোয়। তবু আমার চোখে রঙ লাগল। মনেও কি তার ছায়া পড়েছে !

মামাকে আমি দরজা দিয়ে ঠেলে তুলে দিয়েছিলুম। সামনে সবুজ আলো, পিছনেও সবুজ নিশান। চলতি ট্রেনে আমিও উঠে পড়েছিলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল : কই, কোন উত্তর দিচ্ছ না যে!

আমি কিছু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। তাই চমকে উঠলুম। আর স্বাতি আবার হাসল আমার চমকানি দেখে। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বললুম : তুমি পুরস্কার ভেবেছ, আমি ভাবছি পুরুষকারের কথা।

স্বাতি সোজা হয়ে বসল, বলল : মানে ?

এবারে আমি তার প্রশ্ন শুনে হাসলুম, বললুম : মানে খুবই সহজ। পুরুষ পুরস্কার পায় পুরুষকারের জন্যে। তাই এত তাড়াতাড়ি এই পুরস্কারের আশা করি নি।

স্বাতি লজ্জা পেল, না রাগ করল, তা বুঝতে পারলুম না। বলল : এ কালের সংলাপ কিছু মার্জিত হওয়া দরকার।

আমি এই তিরস্কারের উত্তর দিলুম না। মামার কথাই আমার মনে পড়ল। রায় সাহেব অঘোর গোস্বামী এত কাল জমিদারী চালিয়েছেন। সম্পত্তি বেদখল হবে জানতে পেরেই বাণিজ্যে হাত দিয়েছিলেন। বিচক্ষণ লোক, তাই নিজের বিষয়বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে ব্যবসাদার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগে ব্যবসা চালাচ্ছেন। তাতে লাভ কম হোক, লোকসানের ভয়ও কম। স্বাতি এখনও কলেজে পড়ে, আর আমি কলেজ ছেড়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ করবার পরে। তাই তত্ত্বজ্ঞানী প্রাচীনদের কথা মানতে হলে তার জ্ঞান আমার চেয়ে কম বলেই মানতে হবে। কলকাতা ছাড়ার পরে আমার প্রথম ভাবনা হয়েছিল এই ভেবে যে মাদ্রাজে পৌঁছে আমাকেই গাইডের কাজ করতে হবে এবং প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধুনিক মতবাদ পর্যন্ত সব কিছুর ফিরিস্তি আমাকেই পেশ করতে হবে। রামখেলাওনের কর্তব্য কর্মের বদলে এটুকুও যদি না পারি তো আমাকে বহন করার সার্থকতা কোথায়। এ যুগের বিষয়ী লোক মামা, তাঁর দাঁড়ি পাল্লায় লাভের ওজন একটু বেশিই চাইবেন।

সহযাত্রীদের তাই আমি নানা প্রশ্নে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলুম। কেউই বিরক্ত হয় নি, হাসিমুখে সবাই সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

ভেঙ্কটাইয়ারও দিয়েছিলেন। তাঁরই কাছে আমি মাদ্রাজের অনেক কথা শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে যে মাদ্রাজ শহর যেন আমার অনেক দিনের চেনা। মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশন দেখেছি অনেকবার, ছোট লাইনের এগমোর স্টেশনও দেখেছি। ভবঘুরের মতো ঘুরেছি মাদ্রাজের পথে পথে ও দক্ষিণ ভারতের শহরে শহরে। মনে হল যে মহাবলীপুরমেব সপ্তরথ আমার দেখা, পক্ষীতীর্থের পাখিও আমার না দেখা নয়। ত্রিচির শৈল মন্দিরে উঠেছি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, আর মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের আলোকমালা দেখে পাগল হয়েছি কত রাতে। মনে হল যে ধনুষ্কোডির পথে দেখেছি বামচন্দ্রের সেতুবন্ধ, আর কন্যাকুমারীতে দেখেছি তিন সমুদ্রের মিলন। তাঁকে বিদায় দেবার আগে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলুম। আর তিনি আমাকে তাঁর পরিচয় জানিয়েছিলেন। একটা দৈনিক পত্রিকাব তিনি সাব-এডিটর, থাকেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউর কাছে একটা সাউথ ইণ্ডিয়ান হোটেলে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বার বাব অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমিও তাঁর মতো একটা চাকরির চেষ্টা বহু দিন করেছিলুম। ভেবেছিলুম সেখানে পড়বার ও লেখবার প্রচুর সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু মনের এই ইচ্ছার কথা বেমালুম চেপে গিয়ে বলেছিলুম, কলকাতায় ফিরে দেখা করব বৈকি!

আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে স্বাতি বলল: রাগ করলে নাকি!

রাগ!

চুপ করে আছ কিনা, তাই এ কথা মনে হচ্ছে।

নিজেকে আমি আবার সামলে নিয়েছি। বললুম: রাগ হয় মনে অনুরাগ থাকলে। কিন্তু সেও তো অমার্জিত ব্যাপার। এ যুগে শুনেছি মনটাকে বাদ দিয়ে হয় সভ্যতায় হাতে খড়ি।

স্বাতি বলল: তোমার বুদ্ধির তরোয়ালখানা এবারে খাপে তুলে রাখ, ও খোলা দেখে যে বাহবা দেবে তাকে দেখিও।

হেসে বললুম: আমরা কলম-পেষা কেরাণী, তরোয়ালের খেলা জানি নে।

তবে কি দড়ির খেলা দেখাচ্ছ ? পড়ে গেলে যে নিজের পা ভাঙবে !

কিন্তু এ কথার উত্তর দেবার আগেই ট্রেন একটা ছোট স্টেশনে এসে দাঁড়াল। তিরুপতি দর্শন করে এসে দুপুর আড়াইটের গাড়িতে আমরা রেনিগুণ্টা ছেড়েছি। মধ্যাহ্নের রৌদ্র এখনও তীব্র। বাহিরের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। তবু আমি স্টেশনের নামটি পড়বার চেষ্টা করলুম।

তিরুত্তনি।

নামটি আমার শোনা মনে হল। তারপরেই মনে পড়ল রাধাকৃষ্ণানের কথা। তিরুপতি থেকে তিরুমালাই পাহাড়ে ওঠবার সময় তিনি আমাকে এই তীর্থের নাম শুনিয়েছিলেন। এখানে আছে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির। সুব্রহ্মণ্য হলেন কার্তিক। বাঙলা দেশেও কার্তিক পূজো হয়, কিন্তু কার্তিকের কোন মন্দির আছে বলে শুনি নি।

স্বাতি বলল : আবার অন্যমনস্ক হয়েছ দেখছি।

আমি বললুম : আর হব না। দেবসেনাপতি কার্তিক আমার সামনে এসে গেছেন।

স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

তিরুত্তনিতে ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। গাড়ি চলতে শুরু করতেই বললুম : এই ছোট স্টেশনটি দক্ষিণের একটি বড় তীর্থস্থান। কার্তিকের বিখ্যাত মন্দির আছে তিরুত্তনিতে।

স্বাতি হেসে ফেলল আমার কথা শুনে, বলল : কার্তিকের আবার মন্দির ! ভাল করে সাজগোজ করলে তোমাকেই লোকে কার্তিক বলবে।

আমি একটু আহত হবার ভান করে বললুম : কার্তিকের দুর্ভাগ্য যে বাঙলা দেশে তাঁর আদর নেই।

কিন্তু এখানে তাঁর আদরের কথা কে বলবে ?

বলে চারি ধারে একবার তাকাল।

আমি বুঝতে পারলুম যে এই তীর্থের কথা শোনবার জন্যে তার কৌতূহল জেগেছে। তাই যে ভদ্রলোক এই স্টেশন থেকে উঠলেন, তাঁকে একটা নমস্কার করে নিজের পাশে বসবার জায়গা দিলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। সেই পুরনো হাসি।

কৌতুকের হাসি। মামা মামীকে একটা আপার ক্লাসে ঠেলে তুলে দিয়ে নিজে সেই গাড়িতে ওঠে নি। বলেছিল, থার্ড ক্লাসে চড়তে গোপালদা কেন ভালবাসে তাই আজ দেখব।

অনুমান তার মিথ্যা নয়। থার্ড ক্লাসে হয়তো কষ্ট আছে শারীরিক, কিন্তু মনের দিক থেকে দেউলিয়া নয় থার্ড ক্লাসের যাত্রী। শরীরের কষ্টই মনের সেতুবন্ধন করে। একাত্ম হতে আমাদের সময় লাগে না। ভদ্রলোক একটু গুছিয়ে বসতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ তীর্থ করতে এসেছিলেন বুঝি ?

ভদ্রলোক আমাদের দুজনকেই একবার দেখে নিলেন, তারপরে বললেন ঃ হ্যাঁ।

আর কিছু বললেন না দেখে আমি আবার প্রশ্ন করলুম ঃ এ বুঝি খুব বড় তীর্থ ?

ভদ্রলোক এবারেও একটা হ্যাঁ বলে আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ আপনারা কি পাঞ্জাব থেকে আসছেন ?

আমি বললুম ঃ না। আমরা বাঙলা দেশ থেকে আসছি। তিরুপতি দর্শন করে এখন মাদ্রাজ যাচ্ছি, রামেশ্বর দর্শন করে দেশে ফিরব।

ভদ্রলোক আর একবার স্বাতির দিকে চেয়ে দেখলেন। স্বাতি লজ্জা পেল খানিকটা। ভদ্রলোক কী দেখলেন, আর কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। আমাকে বললেন ঃ কষ্ট করে এতদূর এসেছেন, তিরুত্তনির সুব্রহ্মণ্য স্বামীকে আপনারা অনায়াসেই দেখে যেতে পারতেন। এই ট্রেন থেকে নেমে পরের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ম্যাড্রাস যেতে পারতেন। আমিও তাই করেছি।

কী রকম ?

তিরুমালাই পাহাড় থেকে নেমে সকাল দশটার ট্রেন ধরেছিলাম। ভোর বেলায় বালাজীর দর্শন হয়েছে, সুব্রহ্মণ্য স্বামীরও দর্শন পেলাম। পথ তো বেশি নয়, তিরুপতি থেকে উনচল্লিশ মাইল দক্ষিণে, ট্রেনে সোয়া ঘণ্টার পথ।

তারপরে বললেন ঃ কাঞ্চীপুরম আরও কাছে, ছাব্বিশ মাইলের বেশি

নয়। একটু পরেই আমরা আর্কোলাম পৌঁছব, সেখান থেকে দক্ষিণে যেতে হয়।

স্বাতি বলল ঃ তিরুত্তনি তাহলে আমাদের দেখা হল না।

উত্তরের আশায় স্বাতি ইংরেজীতে এই আফশোস করেছিল, তাই উত্তরও পেয়ে গেল তখনি। ভদ্রলোক বললেন : ইচ্ছে করলে ম্যাড্রাস থেকেও এসে দেখে যেতে পারবেন। সকাল নটায় বেরিয়ে এই ট্রেনে ফিরতে পারবেন। বাসও যাতায়াত করে। দূরত্ব তো মাইল পঞ্চাশেক।

তিরুত্তনির গল্প আমরা এই ভদ্রলোকের কাছেই জেনে নিলুম। রেল স্টেশন থেকে মাইল খানেকও নয়, একটা পাহাড়ের মাথায় সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দির। খুব উঁচু পাহাড় নয়, তিনশো পঁয়ষট্টি ধাপ সিঁড়ি ভাঙলেই উপরে পৌঁছনো যায়। এক একটি ধাপ হল বছরের এক একটি দিন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ দিকে কত দিন থাকবেন আপনারা ?

বললুম ঃ দুএক দিনের বেশি কোথাও থাকব না।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় যদি থাকেন তো আসবেন এই মন্দিরে। সুব্রহ্মণ্য স্বামীর উৎসব দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। ইনি আমাদের প্রিয় দেবতা। নানা নামে আমরা এঁর পূজো করি। কার্তিকেয় কুমারন সুব্রহ্মণ্যম মুরগন—

ভদ্রলোক আমাদের কাছে ছটি মন্দিরের নাম করলেন। তার মধ্যে তিরুত্তনি অন্ধ্রে, বাকি সবগুলি তামিল এলাকায়। সব চেয়ে বিখ্যাত হল পালনি আর তিরুচেন্দুরের মন্দির। জিজ্ঞাসা করলেন : কন্যাকুমারী যাবেন তো ?

স্বাতি উত্তর দিল ঃ নিশ্চয়ই যাব।

ভদ্রলোক বললেন ঃ তবে ত্রিবেন্দ্রামের পথে না গিয়ে তিরুনেল-ভেলির পথে যাবেন। একদিন সেখানে থেকে দেখে আসবেন তিরু-চেন্দুরের মন্দির। এর চেয়ে সুন্দর পরিবেশে একটি দেবতার মন্দির বোধহয় ভারতবর্ষে আর নেই।

রাধাকৃষ্ণনও আমাকে এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু স্বাতি আমাদের

গল্প বোধহয় শুনতে পায় নি। তাই আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ কন্যাকুমারীর চেয়েও সুন্দর !

ভদ্রলোক বললেন ঃ কন্যাকুমারীর মন্দির তো দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ! সমুদ্র থেকে মন্দির দেখা যায় না, মন্দির থেকেও দেখা যায় না সমুদ্র। তিরুচেন্দুর না দেখলে এর সৌন্দর্য আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না।

স্বাতি বলল ঃ কী আশ্চর্য ! এত ভ্রমণকাহিনী পড়েছি, কিন্তু আমরা এ জায়গার নামও শুনি নি।

আমি হেসে বললুম ঃ এই রকমই হয়। মানুষের সঙ্গে পরিচয় না হলে দেশ দেখা আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এ কথাগুলি আমরা বাঙলায় বলেছিলুম, তাই বুঝতে না পেরে ভদ্র-লোক আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম ঃ এ সব জায়গার নামই আমরা শুনি নি।

ভদ্রলোক বললেন ঃ সত্যিই তো, এত দূর দেশের খবর আপনারা জানবেন কী করে !

তারপরেই প্রশ্ন করলেন ঃ কোন্ কোন্ জায়গা আপনারা দেখবেন স্থির করেছেন ?

এবারে তিনি আমার দিকে না চেয়ে তাকিয়ে ছিলেন স্বাতির দিকে। স্বাতি উত্তর দিল ঃ এখনও কিছু স্থির করি নি।

পক্ষীতীর্থ ও মহাবলীপুরম নিশ্চয়ই দেখবেন ?

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল ঃ ইচ্ছে আছে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ কাল রবিবার, টুরিস্ট বাস পাবেন সকাল বেলায়। পক্ষীতীর্থ আর মহাবলীপুরম দেখে সন্ধ্যা বেলায় ফিরে আসতে পারবেন।

পরম উৎসাহে স্বাতি বলল ঃ খুব ভাল আইডিয়া।

ভদ্রলোকও উৎসাহ পেয়ে বললেন ঃ কাঞ্চীভরম ও তাঞ্জোর বাদ দিলেও আপনাদের চলবে না। পল্লব ও চোল রাজাদের পুরাকীর্তি আপনাদের দেখতেই হবে।

আমি বললুম ঃ তারপর ?

তীর্থের আকর্ষণ যদি থাকে, তাহলে চিদম্বরম কুম্ভকোনাম ও শ্রীরঙ্গমও দেখতে হবে।

স্বাতি হেসে বলল ঃ তাহলে বাকি রইল কী!

বাকি অনেক কিছু রইল। চোখ মেলে যদি চলেন তো নিজেরাই দেখতে পাবেন।

বলে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আমি ভেবেছিলুম যে স্বাতির পরিহাসে বোধহয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু পরে বুঝতে পারলুম যে তাঁর নামবার সময় হয়েছে। ট্রেন এসে আর্কোলাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই বললেন ঃ আমি এইখানে নামব, কাঞ্চীভরমে আমার বাড়ি।

বলে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লেন। আমরা নমস্কার করলুম তাঁকে।

২

ভদ্রলোক নেমে যাবার পরে স্বাতি বলল ঃ গাড়ি তো এখানে অনেক-ক্ষণ দাঁড়াবে, বাবা মাকে দেখে আসব একবার ?

আমি বললুম ঃ থার্ড ক্লাসে কষ্ট করবে কেন, ওঁদের সঙ্গেই বসে যেও।

স্বাতি তার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভৎর্সনা করল, তার পরে বলল ঃ না বাবা, দরকার নেই। কতক্ষণ দাঁড়াবে জানিনে তো, শেষে হয়তো পড়েই থাকব আর্কোলামে।

কফির গ্লাস ট্রের উপর সাজিয়ে কফিওয়ালা যাচ্ছিল হেঁকে। স্বাতি বলল ঃ এই কফি।

বলে আমাকে হুকুম করল দুটো গ্লাস নেবার। আমি যখন দুহাতে দুটো গ্লাস নিয়ে একটা তার হাতে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম, সে তার ব্যাগ খুলে পয়সা দিয়ে দিল। ফেরৎ পয়সা ব্যাগে রেখে তারপর গ্লাসটা নিজের হাতে নিল। এক চুমুক খেয়ে বলল ঃ এরা কফিটা ভাল করে।

স্বাতি যে আমার সঙ্গে একটা রসিকতা করল, তা বুঝতে পেরেছি। নিজের হাতে কফির গ্লাস নিলে পয়সা আমি দিতে পারতুম। আমাকে ভুলিয়ে রেখে সে পয়সা দিয়েছে। দাম যাই হোক, জব্দ করেছে আমাকে। তাই আমি কোন উত্তর দিলুম না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি বলল ঃ মা কিছুতেই কফি খেতে চান না, বলেন যে ঠিক হুঁকোর জলের মতো গন্ধ।

আমি এ কথারও জবাব দিলুম না, আর তাই দেখে স্বাতি খিল খিল করে হেসে উঠল।

আর্কোলামে আর কেউ উঠলেন না, আমরাই মুখোমুখি বসে রইলুম। কফিওয়ালা এসে তার গ্লাস নিয়ে গেল, গাড়ি ছাড়ল। আর

ঘণ্টা তুয়েকের মধ্যেই আমরা মাদ্রাজে পৌঁছে যাব। কিন্তু বলবার মতো কোন কথা খুঁজে পেলুম না।

এক সময় স্বাতি বলল: তোমার ইতিহাসের কথা আজ আমি শুনব না।

আমি বললুম: এখন মুখোমুখি বসে ইতিহাসের আলোচনা করলে লোকে পাগল বলবে।

স্বাতি হেসে বলল: আকাশে তো অনিবার জল ঝরছে না যে গভীর তুখে তুখী হয়ে বসে থাকব!

তবে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব কর।

স্বাতি বলল: আবার কি তোমার তলোযাবের খেলা শুরু হল!

তলোয়ার যে তুমিই বাব করলে।

স্বাতি বলে উঠল: দোহাই তোমার গোপালদা, বড় কষ্ট হয় আমার। তুঘণ্টা ধরে এই তলোয়ারের খেলা আমি খেলতে পাবব না। তার চেয়ে তোমার ইতিহাস ভাল। তুমি ইতিহাসেব কথাই শোনাও।

আমি হেসে বললুম: কিছু না বলেও তো থাকা যায়!

যায় না। চুপ করে থাকতে গেলে মাথায় কিলবিল করে ওঠে নানা রকমের ভাবনা, ঘুমোলেও স্বপ্ন আর তুঃস্বপ্ন। শান্তিব জন্যেই কথা বলার দরকার।

আমি বললুম: মনে বাখবার মতো কথা। এসব মূল্যবান কথা অপাত্রে না বলে খাতায় লিখে রেখো।

স্বাতি বলল: আমার খাতাটা আমি তোমাকে দিয়ে দেব। তোমার স্মৃতিশক্তি ভাল, তুমি মনে রেখো সব কথা।

স্বাতির ভাবনার কথা আমি জানি। কলকাতা থেকে যখন তারা বেড়াতে বেরিয়েছিল তখন তাদের গন্তব্য স্থান ছিল রামেশ্বর। পথে মাদ্রাজ আর মাতুরা দেখত, ফিরত কন্যাকুমারী হয়ে। বাঙলাদেশ থেকে যারা দক্ষিণভারত ভ্রমণে যায়, তারা সবাই তাই করে। যারা তুএকটা স্থান বেশি দেখে, তারাই লেখে ভ্রমণ কাহিনী। কিন্তু আমরা ঠিক তা করি নি। আমরা প্রচলিত পথ বর্জন করে অনেক অখ্যাত অথচ

সুন্দর স্থান দেখতে দেখতে চলেছি। ওয়ালটেয়ার সীমাচলম দেখেছি, বিজয়ওয়াড়ায় নেমে দেখেছি—মঙ্গলগিরি অমরাবতী আর নাগার্জুন সাগর। তিরুপতিও দেখলুম। যা দেখিনি সে সব জায়গার কথা শুনেছি যাত্রীদের কাছে। হায়দ্রাবাদ শহরটা দেখা হলে বলতে পারতুম যে সমগ্র অন্ধ্র রাজ্যটাই আমাদের দেখা হয়ে গেছে। এই যাত্রায় তা দেখা হবে কিনা জানি না।

স্বাতি আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল ঃ কী ভাবছ বলতো?

বললুম ঃ ভাবছিলুম অন্ধ্রের কথা। হায়দ্রাবাদ শহরটা দেখা হলে গোটা অন্ধ্ররাজ্য দেখা হয়েছে বলতে পারতুম।

স্বাতি বলল ঃ বাবা এই কথা শুনলে ঠেঙাবেন তোমাকে।

বললুম ঃ পাগল হয়েছ! এ কথা তাঁকে বলতে যাব কেন!

তবে দেখবে কী করে?

এক যাত্রায় কি সব দেখা যায়! এ কথাটা মেনে নিলেই না দেখার আপশোস আর থাকবে না।

স্বাতি আর তর্ক করল না, বলল ঃ দক্ষিণে কোন আপশোস রেখে যেও না। মাদ্রাজ থেকে বাবা রামেশ্বরের গাড়ি ধরবেন, মাদুরায় একবার নামতে পারেন। কিন্তু তা করলে যে চলবে না, তা বুঝতেই পারছ। কোন রকমে ম্যানেজ করতে হবে।

কিন্তু বিচক্ষণ লোক মামা, কোন ষড়যন্ত্র করেছি সন্দেহ করলেই উল্টো ফল হবে।

ষড়যন্ত্র টের পাবেন কি করে?

তারপরে পাকাপাকি হল আমাদের ষড়যন্ত্র। আমরা কোন জায়গা দেখার ব্যাপারে একমত হব না। একজন ভাল বললে আর একজন মন্দ বলব, একজন একটা জায়গার নাম করলে আর একজন আর একটা জায়গার নাম করব। মাদ্রাজে নেমে স্বাতি পক্ষীতীর্থ আর মহাবলীপুরমের নাম করবে, আমি বলব কাঞ্চীপুরমের কথা। আর মামা যাতে দু দিকেই সায় দেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ষড়যন্ত্র পাকা হবার পর স্বাতি বলল ঃ মনে থাকবে তো?

বললুম ঃ থাকবে।

থ্যাঙ্ক ইউ।

বলে স্বাতি তার ব্যাগ খুলে আমাকে একটা টফি দিল, নিজের মুখেও পুরল একটা।

আমি বললুম ঃ কফি খেয়ে মুখটা বিস্বাদ হয়েছিল বুঝি ?

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে হাসল।

টফি চুষে খাবার মতো ধৈর্য আমার নেই, দাঁতের চাপে সেটাকে কাবু করে বললুম ঃ আগে থেকেই ভ্রমণের একটা খসড়া করে নেওয়া দরকার, সময় মতো তা ক্যাবিনেটে প্লেস করা যাবে।

স্বাতি বলল ঃ দিন তিনেক ম্যাড্রাসে।

তিন দিন !

বেশি হল বুঝি ? কিন্তু তিন দিন না থাকলে পক্ষীতীর্থ আর মহাবলীপুরম দেখা যাবে কী করে !

বললুম ঃ কাল রবিবার পক্ষীতীর্থ আর মহাবলীপুরম।

স্বাতি বলল ঃ সোমবার কাঞ্চী। কাঞ্চীর ভার তোমার ওপর।

তাহলে পক্ষীতীর্থের গাইড তুমি।

স্বাতি বলল ঃ রাজী। আর একটা দিন ম্যাড্রাস দেখতে লাগবেই।

আমি একটু বিমর্ষ ভাবে বললুম ঃ তাহলে কাঞ্চী দেখা হবে না।

কেন ?

ম্যাড্রাসে তিন দিন থাকতে মামী কিছুতেই রাজী হবেন না।

স্বাতি বলল ঃ তবে এক কাজ কর। দ্বিতীয় দিন ম্যাড্রাস দেখে তৃতীয় দিন কাঞ্চী। রামেশ্বর যাবার পথে ট্রেন থেকে নেমে পড়তে হবে।

দেখি।

এতেই ভয় পেয়ে গেলে ! তাহলে তাঞ্জোর আর ত্রিচিতে নামবে কী করে !

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। আর স্বাতি সকৌতুকে প্রশ্ন করল ঃ সমুদ্রের ধারে আর একটা কী মন্দিরের নাম শুনলাম ?

বললুম ঃ তিরুচেন্দুর।

সগর্বে স্বাতি বলল ঃ সেখানেও যাব আমরা।

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম ঃ তাহলে মার খেতে হবে মামার কাছে।

তবে আর তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছি কেন! একটা ছুটো নতুন জায়গা হলে তো আমিই ব্যবস্থা করতে পারতাম।

মার খাবার ভয় তো তোমার নেই, তাই তোমার সাহস বেশি।

আমার নেই, আর তোমার আছে কেন?

মেযেদের গাযে হাত তোলার নিয়ম নেই যে। তাই মেয়েদের কাছে মার খেয়েও চুপ করে থাকতে হয়। তাকে বলে, চোরের মার।

ও।

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল কঠিন ভাবে।

এক সময় আবাদি নামে একটা স্টেশন আমরা পেরিয়ে গেলুম। এই নামটি আমাদের শোনা। অনেক দিন আগে এখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ পরে আমরা একটা কারখানার শহরের পাশ দিয়ে যেতে লাগলুম। স্টেশনের নাম পেরাম্বুর। এই কারখানায় রেলের কোচ তৈরি হয় বলে শুনেছি।

স্বাতি আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল ঃ খুব ভয় পেয়ে গেছ বুঝি?

আমি হেসে বললুম ঃ সমস্ত ভারটাই আমার ওপরে দিয়ে দাও। তাহলে আর ভয় পাব না।

স্বাতি সানন্দে বলে উঠল ঃ সাবাস গোপালদা, এই তো তোমার মুড এসে গেছে দেখছি।

পেরাম্বুর আমরা পেরিয়ে এলুম। কলকারখানা শেষ হয়ে এবারে রেল লাইনের সংখ্যা বাড়তে লাগল। গাড়ির গতিও মন্থর হয়ে এল। বাহিরে অন্ধকার হয়েছে অল্প, বাতি জ্বলেছে গাড়ির ভিতরে। ছটার আগেই আমরা ম্যাড্রাস সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছে গেলুম।

গাড়ি থামতেই স্বাতি টুপ করে নেমে পড়ল। বলল ঃ এস গোপালদা, আমাদের আর এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই।

আমিও নেমে পড়েছিলুম, বললুমঃ দায়িত্ব তো আমার ওপরেই দিয়েছ, তোমার আর ভাবনা কেন!

মামার গাড়ির দিকে এগিয়ে স্বাতি বলল: তোমার ওপরে যে ভরসা করতে পারি নে।

এ কথার উত্তর দেবার আগেই আমি মামার গাড়ির সামনে পৌঁছে গেলুম। আমাদের দেখতে পেয়ে মামা নিশ্চিন্ত হলেন। নেমে পড়লেন মামীকে নিয়ে। তারপরে বললেনঃ একটা ভাল হোটেলে চল।

ভেঙ্কটাইয়ারের কথা আমার মনে পড়ল। তিনি আমাকে রিটায়ারিং রুমে ওঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন, ম্যাড্রাস সেন্ট্রাল স্টেশনে ঘর না পেলে ছোট লাইনের এগমোর স্টেশনে। দুই স্টেশনের দূরত্ব মাইল খানেক, আর সেখান থেকেই রামেশ্বরের ট্রেন ছাড়বে। আমি তাই বিনীত ভাবে বললুমঃ যদি অনুমতি করেন তো স্টেশনে রিটায়ারিং রুম খালি আছে কনা তাড়াতাড়ি দেখে আসি।

মামা বললেনঃ সেও মন্দ নয়। অন্তত নোংরা যে হবে না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কাজেই আমি আর অপেক্ষা না করে ছুটতে যাচ্ছিলুম। বাধা দিয়ে স্বাতি বললঃ একখানা টিকিট নিয়ে যাও।

লজ্জা পেয়ে আমি বললুমঃ দাও।

স্বাতি আমার হাতে একখানা টিকিট দিয়ে বললঃ বেরোবার গেটের সামনেই আমরা অপেক্ষা করব।

আচ্ছা বলে আমি এগিয়ে গেলুম।

এই স্টেশন কতকটা হাওড়া স্টেশনেরই মতো। কিন্তু অনেক ছোট। টার্মিনাস স্টেশন বলেই বোধহয় এই রকম। এক দিক থেকেই ট্রেন আসে, আর সেই দিকেই ফিরে যায়। কাজেই ওভারব্রিজের বালাই নেই। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে অনেকটা প্রশস্ত জায়গা। এখানটায় দোকান-পাট আছে কিছু। ঝলমল করছে নানারকম বাতির আলোয়। তার-পরেই যাত্রীদের বেরোবার পথ। টিকিট দিয়ে বেরোবার সময় আমি

জেনে নিলুম যে রিটায়ারিং রুম এখানে উপরতলায়, একটুখানি এগিয়েই দুদিক থেকে সিঁড়ি উঠেছে।

আমি তৎপর ভাবে উপরে উঠে গেলুম। বাঁ হাতে পাশাপাশি দুটো রিফ্রেশমেণ্ট রুম, একটা আমিষ আর নিরামিষ একটা। তারপরে বড় ওয়েটিং রুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে। ডান দিকে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এক সারি রিটায়ারিং রুম। প্রথমেই মেট্রনের ঘর। দেওয়ালে টাঙানো বোর্ডে দেখেছি যে কোন ঘর খালি নেই। তবু মেট্রনকে একবার জিজ্ঞাসা করলুম। মেম সাহেব বললেনঃ না। খালি হবে কিনা তা জানা নেই।

এগমোর স্টেশনের কী খবর ?

সেখানে গিয়েই জানতে হবে।

আমি নেমে এলুম। দেখলুম যে জিনিসপত্র নিযে মামারা বাইরে আসছেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ পেলে জায়গা ?

বললুমঃ অপেক্ষা করলে হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু এগমোর স্টেশনে যাওয়াই ভাল মনে হয়।

সেখানে না পেলে কোথায় যেতে বলবে !

বলে মামা বাহিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

একখানা ট্যাক্সিতে আমাদের মালপত্র ওঠে না, তাই দুখানা ট্যাক্সি নিতে হল। বেশি মালপত্র নিয়ে আমি একা একখানা ট্যাক্সিতে উঠলুম।

স্টেশনের সামনে দিয়ে যে পথ গেছে সেই পথ ডাইনে গেছে এগমোরের দিকে। কিন্তু সরাসরি ডাইনে যাবার উপায় নেই। প্রথমে বাসে যেতে হবে, তারপরে ঘুরে আসতে হবে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যেমন সরা-সরি বেরবার উপায় নেই, কতকটা তেমনি। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা এগমোর স্টেশনে পৌঁছে গেলুম। আমি তাড়াতাড়ি নেমে মামাকে বললুমঃ আপনারা গাড়িতেই বসে থাকুন। জায়গা আছে কিনা আমি আগে দেখে আসছি।

পোর্টিকো দিয়ে স্টেশনে ঢুকেই বাম হাতে উপরতলায় উঠবার সিঁড়ি। এখানেও উপরে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম আর রিটায়ারিং রুম। কোন

মেট্রন নেই, বেয়ারা আছে। বলল যে একখানা ঘর খালি আছে, আর একখানাও খালি হতে পারে ঘণ্টা দুয়েক পরে।

নিচে এসে মামাকে এই সংবাদ দিতেই তিনি নেমে পড়লেন। বললেন: অন্ধকারে আর ছুটোছুটি করতে ভাল লাগছে না।

৩

রিটায়ারিং রুম দেখে মামা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু খাট একখানি। বললেন ঃ এই একখানা খাটে আমরা চারজন শোব ?

যে বেয়ারাটি বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় বদলে দিচ্ছিল, সে বলল ঃ আর কিছুক্ষণ পরে, একখানা ডবল বেড রুম খালি হবে।

আর একজন কোথায় শোবে ?

তাড়াতাড়ি আমি বললুম ঃ আমার জন্য ভাববেন না। ওয়েটিং রুমে আমি রাত কাটাতে পাবব।

ওয়েটিং রুমে কেন, ধর্মশালা নেই কাছে !

বলে মামা একটা মুখভঙ্গি করলেন।

বেয়ারা আমাদের বাঙলা কথা বুঝতে পারছিল কিনা জানি নে, বলল ঃ এ ঘরে দুজনের অসুবিধা হয় না। খাটে দুখানা গদি আছে।

মামী বললেন ঃ তবে আর ভাবনা কি, একখানা গদি মাটিতে নামিয়ে নিলেই চলবে !

কিন্তু মামা সহসা প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, বললেন ঃ এও কি গোপালের ব্যবস্থা নাকি !

দেখতে পেলুম যে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছে। উপরে উঠবার আগে আমিই বলে এসেছিলুম। কিন্তু মামার কথার কোন জবাব দিলুম না। রিটায়ারিং রুমের বেয়ারাকে বললুম যে ঘরখানা যেন আমাদের হাতছাড়া না হয়।

চা খেতে খেতে মামা বললেন ঃ এবারে কী করতে হবে বল।

আমি বললুম ঃ আজ আমাদের বিশ্রাম।

স্বাতি বলে উঠল ঃ না, সমুদ্রের ধারে আমরা বেড়াতে যাব। অনেক-দিন সমুদ্র দেখি নি।

মামা মামীর দিকে তাকালেন। মামী বললেন ঃ অন্ধকারে আবার সমুদ্র দেখবে কি!

মামা বললেন ঃ ঠিক বলেছ, কাল সকালে অমরা সমুদ্র দেখতে বেরব।

স্বাতি বলে উঠল ঃ সমুদ্র দেখবার জন্যে একটা দিন কেন নষ্ট করব! তার চেয়ে বাসে চেপে কাঞ্চী ঘুরে আসা ভাল।

কাঞ্চীর তাঁতি দেখতে যাব?

বলে আমি পরম অবহেলায় তাকালুম স্বাতির দিকে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কাঞ্চীতে তাঁতি দেখবে কেন! কথায় বলে, পুষ্পেষু জাতি, নগরেষু কাঞ্চী, স্ত্রীষু রম্ভা আর নরেষু রামঃ।

আমি বললুম ঃ জাতি তো চামেলি বা মালতী ফুল। চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে ফুল দেখতে হয়, আর নাকের কাছে এনে অজগরের মতো নিঃশ্বাস নিলে তবে একটুখানি গন্ধ পাওয়া যায়। এই যদি পুষ্পেষু জাতি হয় তো নগরেষু কাঞ্চীও বুঝতে পারছি।

আর মন্দির!

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম ঃ দক্ষিণ ভারতের কোন্ শহরে মন্দির নেই?

মামা বললেন ঃ তবে তুমি কী করতে চাও বল।

বললুম ঃ কাল রবিবার, সরকারী টুরিস্ট বাস পাওয়া যাবে। সকালে বেরিয়ে পক্ষীতীর্থ আর মহাবলীপুর দেখে বিকেলেই ফিরে আসা যাবে। ভাড়া নাম মাত্র, গাইডের দরকার নেই, শুধু সময় মতো বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছলেই হল।

মামা বললেন ঃ তুমি হেরে গেলে স্বাতি, গোপালের পরামর্শটাই ভাল মনে হচ্ছে।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে মনে হল হেরে গিয়েই সে খুশী হয়েছে বেশি। বললুম ঃ বাসের সময়টা আজ টেলিফোনে জেনে নেব।

সকালে সাতটায় আর সাড়ে সাতটায় বাস। মামা একটু অপ্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু উঠেছিলেন সময় মতো। চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বেয়ারা। কাজেই বাস ধরতে আমাদের অসুবিধা হয় নি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছিলুম বাস স্ট্যাণ্ডে। সেণ্ট্রাল স্টেশনের সামনে দিয়ে পথ। বড় ঘড়ি দেখেই এই বাড়িটা চেনা যায়।

পরে জেনেছিলুম যে বাস স্ট্যাণ্ড এখানে দুটো আছে কাছাকাছি। এটা থেকে সমস্ত সরকারী বাস ছাড়ে দূর পাল্লার। টুরিস্ট বাসগুলোও ছাড়ে এইখান থেকে। আর অন্য বাস স্ট্যাণ্ড থেকে শহরের বাস যাতায়াত করে। কাঞ্চীপুরমেরও বাস ছাড়ে এইখান থেকে। সরকারী ও বেসরকারী সব রকম বাসই আছে।

বুকিং অফিসের কাউণ্টারে টিকিট কাটবার সময় জানলুম যে প্রতি রবিবারে অনেকে কখানা টুরিস্ট বাস ছাড়ে। ম্যাড্রাস শহর দেখাবার ব্যবস্থা আছে কলকাতার মতো। আর একটি বাস আছে, তা বিদেশীদের খুব প্রিয়। সকাল বেলায় বেরিয়ে প্রথমেই যায় মহাবলীপুরম, সেখান থেকে পক্ষীতীর্থের পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে যায় ভেলিয়াথাঙ্গাল নামে একটি বন্য পাখি সংরক্ষণ ক্ষেত্রে। ফেরার পথে কাঞ্চীপুর শহর দেখিয়ে দেয়। সে বাস আগেই ছেড়ে গেছে।

ওয়েটিং রূমে মামা মামীকে মিনিট কয়েক বসতে হয়েছিল। এই বাসের কথা জানতে পেরে বলেছিলেন ঃ ঐ বাসে গেলে তো রাস দেখা আর কলা বেচা দুইই হত। তোমার পক্ষীতীর্থ আর স্বাতির কাঞ্চী।

আমি বললুম ঃ পক্ষীতীর্থের পাহাড়ে ওঠা হত না।

স্বাতি বলল ঃ কাঞ্চীও দেখা হত না ভাল করে।

আমি বললুম ঃ কাঞ্চীর বদলে তাঞ্জোর দেখ, দেখে আনন্দ পাবে। তাঞ্জোরকে নিয়েই তামিল দেশ, তামিল দেশের গৌরব হল তাঞ্জোর।

স্বাতি বলল ঃ অসম্ভব।

কিন্তু তর্ক আর হল না। তার আগেই আমাদের বাস এসে গেল। যাত্রীরা সব অপেক্ষা করছিলেন। দুচার দিন আগেই অনেকে টিকিট কেটেছিলেন, অনেকে কেটেছেন আজ সকালে। আমরা বসবার জায়গা

পেলুম মাঝামাঝি। স্থানীয় যাত্রী কম, আমাদের মতো টুরিস্টই বেশি। কণ্ডাক্টর সব টিকিটের সঙ্গে যাত্রীদের মিলিয়ে নিল। বাস ছাড়ল সাড়ে সাতটায়।

আমি বসেছিলুম মামার পাশে মামীর ঠিক পিছনে। স্বাতি মামার সামনে বসেছে। সমস্ত শহর অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে আমাদের যাত্রা। সমুদ্রের ধার দিয়ে যে পথ সোজা দক্ষিণে গেছে, সে পথে গেলে মহাবলীপুরম পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। আমরা যে পথ ধরেছি, তা ন্যাশনাল হাইওয়ে। চিঙ্গলপুট শহরের উপর দিয়ে দক্ষিণের বড় বড় সব শহরে পৌঁছনো যায়। চিঙ্গলপুটের দূরত্বও মাদ্রাজ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল। তার পর পূর্ব দিকে আঠারো মাইল গেলে সমুদ্রতীরে হল মহাবলীপুরম। এই পথেরই মাঝখানে পক্ষীতীর্থ, প্রথমে আমরা পক্ষী-তীর্থেই যাব।

মাদ্রাজ শহরটা শেষ হয়ে যেতেই মামা বললেন: গোপাল তো এক কথায় কাঞ্চীকে বাতিল করে দিলে, কিন্তু পক্ষীতীর্থের পাখি দেখতে কেন নিয়ে চলেছ তা জানি নে।

পক্ষীতীর্থের পাখির কথা আমি ভ্রমণের বইএ পড়েছিলুম। বললুম: এই পাখি তো সাধারণ পাখি নয়, তাঁরা সাক্ষাৎ ঋষি। কোন পাপ করার জন্যে পাখি হয়ে আছেন, কিন্তু ধর্মজ্ঞান আছে ঋষির মতো। তাঁরা রামেশ্বরে থাকেন, খান এখানে, আর বিশ্রাম করেন কাশীতে।

মামা বললেন: তোমার বিশ্বাস হয় এই কথা?

আমি বললুম: ঋষির গল্প বিশ্বাস হয় না, কিন্তু পাখি যে প্রতি দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে তা বিশ্বাস হয়। কেননা অনেকেই এই ঘটনা নিজের চোখে দেখে গেছেন।

মামা বললেন: তামার পুরাণ কী বলে?

পুরাণের কথা তো জানি নে, স্থল পুরাণের গল্প শুনেছি এক বন্ধুর কাছে। বেদ চতুষ্টয় একবার শিবের কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের বাসের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দিন, সেইখানে থেকে যেন আমরা আপনার সেবা করতে পারি। শিব তাঁদের পর্বতে পরিণত করে পরস্পর সংলগ্ন

করে রাখলেন, আর নিজে বাস করতে লাগলেন একটি পাহাড়ে। এই পাহাড়েরই নাম পক্ষীতীর্থ আর শিবের নাম বেদগিরীশ্বর। প্রবাদ আছে যে এই পাহাড়ে যেখানে তিনি কোটি রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁদের পরাস্ত করেন, সেইখানে তাঁর বিজয় ঘোষণার জন্যে একটি মন্দির তৈরি হয়েছিল। ইন্দ্র এসে যেখানে শিবের উপাসনা করেন, সেই জায়গাটির নাম ইন্দ্রতীর্থ। এর সম্বন্ধেও একটি অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে। বারো বছর পরে পরে দেবরাজ ইন্দ্র নাকি শিব পূজার জন্যে তাঁর বজ্রকে পাঠান। সেই বজ্র মন্দিরের শিখর পর্যন্ত নেমে এসে দেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পাহাড়েই অদৃশ্য হয়ে যায়।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: সত্যি কথা নাকি?

বললুম: তাতো জানি নে। তবে শুনেছি যে দেবতার এই অদ্ভুত অভিষেক দেখবার জন্যে গ্রামের লোকের কৌতূহলের আর সীমা থাকে না। অনেকে অবশ্য এই ঘটনাকে নৈসর্গিক বলেই মনে করেন।

নৈসর্গিক হলে বারো বছর পরে পরে কেন হয়?

বললুম: প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে না শুনলে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে না।

মামা বললেন: প্রত্যক্ষদর্শীর কি আর দেখা পাবে?

পেলে আর একটি অলৌকিক ঘটনার কথা জেনে নেব।

কী?

শঙ্খতীর্থ নামে নাকি একটি পুকুর আছে। বারো বছর পর পর সেই পুকুরের জল থেকে দুটি শঙ্খ ওঠে। হঠাৎ দেখা যায় যে জল ঘোলা হতে আরম্ভ হয়েছে, আর ফেনা দেখা যাচ্ছে জলে, আর একরকমের গর্জনও শোনা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে এই খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে যায়, লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় পুকুরের চারিধার। দুতিন দিন পরে শঙ্খ দুটি ভেসে ওঠে। লোকেরা তখন সেই শঙ্খ তুলে একটা রূপোর পাত্রে রাখে, তারপরে মহাসমারোহের সঙ্গে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মন্দিরে তুলে রাখে সেই শঙ্খ দুটি।

মামা বললেন: তুমি কোথা থেকে এ সব গল্প বলছ?

স্বাতি পিছন ফিরে বলল: গোপালদা আজ কোন নেশা করে নি তো!

আমি বললুম: এ আমার শোনা গল্প। যিনি বলেছেন, তাঁরও দেখা নয়।

তবে?

কোন বইএ তিনি পড়েছেন।

মামা বললেন: এ সব গল্প সত্য কিনা কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

বললুম: শঙ্খতীর্থের সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। সেখানে দুবেলা স্নান করে অনেক রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাতের রোগী নিরাময় হয়েছে, এমন কি পাগলও সুস্থ হয়েছে বলে শোনা যায়। তার জন্যে সকাল সন্ধ্যায় স্নান করে দেবদর্শন করতে হয়। স্বল্পাহারী হয়ে ধ্যান করতে হয় দেবতার।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন: অনেক কুণ্ডের জলে নানারকমের রোগ-মুক্তি হয় শুনেছি, কিন্তু পাগলের মাথা ঠিক হয় এ রকম কথা শুনি নি।

তিন শো বছর আগে ওলন্দাজরা এই অঞ্চলে এসে এই সব অলৌকিক গল্প শুনে বিশ্বাস করে নি। তাই নিজেদের চোখে সব দেখতে এসেছিল।

কী দেখেছিল তারা?

জানি নে কী দেখেছিল, তবে পাহাড়ের গায়ে তাদের নাম লিখে গিয়েছিল বলে শুনেছি।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: পক্ষীতীর্থ তো বাঙলা নাম। এদেশের লোকও কি পক্ষীতীর্থ বলে?

আমি বললুম: এদেশের লোক যে নাম বলে তার সঠিক উচ্চারণ আমি করতে পারব না।

কেন?

আমার দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুদের আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তারা আমাকে এই উচ্চারণ শেখাবার অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

এ জায়গার নাম ইংরেজীতে লেখা হয় তিরুক্কালুকুণ্ড্রম। তিরু হল শ্রী বা পবিত্র, কলুকু মানে চিল, আর ছোট পাহাড়কে বলে কুন্‌রম, কুণ্ড্রম নয়। সব কটি কথা যোগ করলে নাকি তিরুকড়ু কুন্‌রম হয়, তিরু-কজ্‌হুগুকুণ্ড্রম্ বলা চলে।

স্বাতি হেসে উঠল আমার কথা শুনে, বলল: সংক্ষেপে বলতে গেলে হিং টিং ছট্।

বললুম: একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সেটা হল যে এই জায়গাটি হল পবিত্র চিলের পাহাড়। যে পাখি আমরা দেখতে যাচ্ছি তা সাদা চিলের মতো পাখি। এই পাহাড়ে এ রকমের পাখি নাকি অনেক আছে।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: এ কত দিনের পুরনো তীর্থ বলতে পার?

খুব প্রাচীন তীর্থ বলে শুনেছি। শুধু হিন্দুর তীর্থ নয়, বৌদ্ধদেরও তীর্থ ছিল বলে শোনা যায়। তারানাথ ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস নামে তিব্বতী ভাষায় যে গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে এই অঞ্চলের একটি সংঘা-রামের উল্লেখ আছে, তাম নাম পক্ষী সংঘারাম। এই মন্দিরে জৈনদেরও শিলালিপি আছে বলে শুনেছি।

তারপর?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: পেরম্বিল তম্বিরাল নামে এক শৈব উপাসকের নাম শুনেছি। পাঁচশো বছর আগে নাকি তাঁরই চেষ্টায় এই পক্ষীতীর্থের প্রসিদ্ধি চারি দিকে ছড়িয়েছে।

টুরিস্ট বাস কোনখানে দাঁড়ায় না। সুন্দর সরল পথে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলুম। আকাশের রৌদ্রে উত্তাপ নেই, বাতাসে আছে আরামের প্রলেপ। কথায় কথায় কখন যে আমরা পঁয়ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলুম বুঝতে পারি নি। বাস এসে চিঙ্গলপুট শহরের বাজারে দাঁড়াতেই সচকিত হয়ে উঠলুম।

যাত্রীরা একে একে নেমে পড়লেন। তাই দেখে স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল : এ কোথায় এলাম গোপালদা ?

আমি একটা দোকানের সাইনবোর্ডে এই জায়গার নাম দেখেছিলুম। তাই বলতে পারলুম : চিঙ্গলপুট।

তবে তো আমরা পৌঁছেই গেছি।

বাস থেকে আমি নামছিলুম। মামা বললেন : নামছ কেন ?

সবাই নামছে কেন তাই দেখছি।

খবর নিয়ে জানলুম যে যাত্রীরা এখানে কফি খাবে। খুব কাছেই ভাল কফির দোকান আছে। স্বাতি বলল : এস না, আমরাও কফি খাই।

বলে স্বাতিও নেমে পড়ল। কিন্তু মামা নামলেন না। মামী খাবেন না, তাই মামার জন্যে কফি আমরা পাঠিয়ে দিলুম।

৪

আবার বাস ছাড়ল। স্বাতি জিজ্ঞাসা করল ঃ রেলওয়ে স্টেশন এখান থেকে কত দূরে গোপালদা ?

বললুম ঃ শহর তো বড় নয়, কাজেই স্টেশন খুব কাছেই হবে।

তাহলে ট্রেনে এসেও আমরা এই বাস ধরতে পারতাম ?

না।

না কেন ?

এ বাসে আর জায়গা নেই।

মামা হাসলেন আমার উত্তর শুনে, আর স্বাতি রেগে গেল। তাই দেখে বললুম ঃ ট্রেনে এলে আমরা স্টেশনের বাইরে থেকে পক্ষীতীর্থের বাস ধরতুম। অকারণে এখানে হেঁটে আসতুম না।

পক্ষীতীর্থ দেখতে আসার এইটেই সাধারণ নিয়ম। আজ রবিবার বলেই সরকারী টুরিস্ট বাস আছে। অন্যদিনও বোধহয় বাস যাতায়াত করে, কিন্তু সে এক তরফা যাত্রা। যারা নিয়ে আসবে, ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাদের নয়। সাধারণ যাত্রীরা তাই ট্রেনেই আসে। চিঙ্গলপুট স্টেশনে মালপত্র জমা রেখে বাসে ওঠে। পক্ষীতীর্থ আর মহাবলীপুরম দেখে ফিরে যায় চিঙ্গলপুট স্টেশনেই। যারা পক্ষীতীর্থে সময় নষ্ট না করে মহাবলীপুরম তাড়াহুড়ো করে দেখে দুপুরের মধ্যেই চিঙ্গলপুট ফিরে আসে, তারা কাঞ্চীপুরমও দেখতে পারে অল্প সময়ের জন্য। দুপুর আড়াইটে তিনটেয় একখানা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে কাঞ্চী-পুরম গিয়ে সন্ধ্যার সময় ফিরতে পারলে রামেশ্বর এক্সপ্রেস ধরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাতে ভাল করে কিছুই দেখা হয় না, জায়গাগুলোর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয় শুধু। দুখানা ছবি তোলা যায় আর দেশে ফিরে গল্প করা যায় পাঁচ জনের কাছে। ভাল করে কিছু দেখতে হলে

সময়ের দরকার। অসম্পূর্ণ দেখা না দেখারই মতন। তবু আমাদের তাড়াতাড়ি দেখতে হয়। শুধু সময় সংক্ষেপের জন্য নয়, ব্যয় সঙ্কোচের জন্যেও ছুটতে হয় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। তার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না, কারও রুচির সমালোচনা করাও যায় না।

এখন আমরা সোজা পূব মুখো চলেছি সমুদ্রের দিকে। আঠারো মাইল দূরে সমুদ্র, আর পক্ষীতীর্থ ঠিক মাঝ পথে। পাহাড়ের উপরে পক্ষীতীর্থ। কত উঁচু পাহাড় তা জানা নেই। বাস যদি নিচে দাঁড়ায়, আর হেঁটে উঠতে হয় এই পাহাড়ে, তবে মামা আমাকে আস্ত রাখবেন না। মঙ্গলাগিরির কথা আমার মনে আছে, সে অন্য লোকের পরামর্শ ছিল। এবারে আমি তাঁকে এখানে এনেছি, তাঁর সমস্ত দুর্ভোগের জন্যে আমাকেই দায়ী হতে হবে। এই ভাবনাতেই মন আমার অস্থির হয়ে উঠল।

স্বাতি বোধহয় লক্ষ্য করেছিল আমাকে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: ছটফট করছ কেন গোপালদা?

আমি আশ্চর্য হলুম তার প্রশ্ন শুনে। কিন্তু উত্তর দিতে দেরি করলুম না। বললুম: একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে, খুব আপশোস করতে হবে একটু পরেই।

আমার উত্তর শুনে স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কী রকম?

বললুম: পক্ষীতীর্থ দেখতে তো নিশ্চিন্ত মনেই যাচ্ছি, কিন্তু পাহাড়ে যদি উঠতে হয়?

এবারে আমাদের দুজনেরই আশ্চর্য হবার পালা। মামা গম্ভীর ভাবে বললেন: পাহাড়ে তো উঠতেই হবে। আব সবাই যদি উঠতে পারে তো তোমরা এমন ভয় পাচ্ছ কেন!

সত্যিই তো: বলে স্বাতি হেসে উঠল: গোপালদা এমন ভীতু তা জানতাম না।

স্বাতির হাসিতে আমি একটুও লজ্জা পেলুম না। আমার মনের উপর থেকে যেন একখানা ভারি পাথর নেমে গেছে বলে মনে হল।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়লুম। ছোটখাট শহর একটি, নাম তিরুক্কলুকুন্রম। পথের ধারে উঁচু গোপুর দেখতে পেয়েছি। পাহাড়ের নিচেও যে মন্দির আছে, এ তারই পরিচয়। কিন্তু আমাদের বাস এই মন্দিরের সামনে দাঁড়াল না। একটা ছায়াচ্ছন্ন পথে খানিকটা অগ্রসর হয়ে রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়লেন। আমরাও নামলুম।

এই জায়গাটি ভারি শীতল। কিছু নির্জনও বটে। কিন্তু আরও দুতিনখানা বাস এসে দাঁড়িয়ে আছে। মোটর গাড়িও আছে দুতিনখানা। কিন্তু যাত্রী নেই একজনও। সামনেব দিকে তাকিয়ে কয়েকটি ছোট খাট দোকান দেখতে পেলুম। ছবির দোকানও আছে। ছবি বিক্রি হচ্ছে। একটি পাথরের উপবে দুটি শাদা পাখি একজন পুরোহিতের হাত থেকে খাচ্ছে। পুরোহিতের পরনে শাদা ধুতি, ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত। মাথার চুল চারিধারে কামানো, মাঝখানে একটা ঝুঁটি বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পুরোহিত একটা বাটি এগিয়ে দিয়ে ঝুঁকে আছেন, পাশে একটা ঘড়া। পাখি দুটি পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে অনেকখানি, কিন্তু বাটিতে তখনও মুখ দেয় নি। এই ছবিই পক্ষীতীর্থেব ছবি। এই দৃশ্য দেখবার জন্যেই আমরা এত দূরে এসেছি, আর পাঁচশো ফুট উঁচু পাহাড়ে উঠব সিঁড়ি বেয়ে।

স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ পক্ষীতীর্থের ছবি দেখতে পাচ্ছ?

সংক্ষেপে স্বাতি বলল ঃ পাচ্ছি।

আমি বললুম ঃ এই দৃশ্যটি দেখবার জন্যেই আমাদের পাহাড়ে উঠতে হবে।

স্বাতি বলল ঃ পাখি এখনও আসে কিনা সেইটেই দেখা দরকার।

মামা বললেন ঃ তোমার তো এমন ভয় ছিল না গোপাল!

আমি হেসে বললুম ঃ ভয় স্বাতির জন্যে। কষ্ট করে উপরে উঠে যদি কিছু দেখতে না পায় তো—

তাতে তোমার দোষ কী!

আমার মুখের দিকে চেয়ে স্বাতি কৌতুকের হাসি হাসল। আমি বললুম ঃ ছেলেমানুষ তো, সেকথা কি ও বুঝবে!

যাত্রীরা সবাই একটা সোজা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পাহাড়ের দিকে নয়, পাহাড় থেকে দূরে চলে যাচ্ছিলেন তাঁরা। স্থানীয় যাত্রীরাই ছিলেন পুরোভাগে, অন্য সবাই তাঁদের অনুসরণ করছিলেন। কোন প্রশ্ন না করে আমরাও তাঁদের পিছনে চলতে লাগলুম।

আমি এগিয়ে গিয়েছিলুম খানিকটা. পিছন থেকে স্বাতি আমাকে ডেকে বলল ঃ বাবা তোমাকে ডাকছেন গোপালদা।

আমি ফিরে এলুম। মামা বললেন ঃ কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

. সবাই যেখানে যাচ্ছে, সেইখানে।

তোমাদের তীর্থ তো পাহাড়ের ওপরে, আর সবাই যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। কথাটা কাউকে জিজ্ঞেস করবে, না এমনি করে হাঁটাবে সবাইকে ?

বুঝতে পারছিলুম যে হাঁটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। মামী নিঃশব্দে হাঁটছেন, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। দেখলেই বোঝা যায় যে হাঁটার অভ্যাস তাঁদের নেই। আমি তাই মেনে নিলুম তাঁর কথা, বললুম ঃ আপনারা একটুখানি অপেক্ষা করুন, ব্যাপারটা আমি জেনে আসছি।

আমি হনহন করে হাঁটতে শুরু করতেই স্বাতি এগিয়ে এল আমার সঙ্গে। একটুখানি এগিয়েই দেখতে পেলুম যে আমরা একটা মস্ত সরোবরের ধারে পৌঁছে গেছি, অন্যধারে মন্দিরের গোপুর দেখা যাচ্ছে আকাশ ছোঁয়া। স্থানীয় যাত্রীবা স্নানের জন্য জলে নেমে পড়েছেন, আর আমাদের মতো পক্ষীতীর্থের যাত্রীরা কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। যাঁরা ফিরে আসছিলেন, তাঁদের প্রশ্ন করে জানলুম যে তাঁরা এখন স্নান করে মন্দিরে যাবেন শিবের পূজো করতে। তারপরে পক্ষীতীর্থের পাহাড়ে উঠবেন। মাঝে মাঝেই তাঁরা আসেন, কাজেই পক্ষীতীর্থের পাখি দেখার কৌতূহল তাঁদের নেই। তাঁরা এসেছেন বেদগিরীশ্বরের পূজো করতে।

স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ এই পুকুরের নামই কি শঙ্খতীর্থ ?

আমি বললুম ঃ জানি নে।

ইসারায় স্বাতি আমাকে যাত্রীদের দেখিয়ে দিল। আমি বললুম ঃ লাভ নেই কিছু জিজ্ঞেস করে। ওদের দৌড় আমাদেরই মতো।

আমাদের ফিরতে দেখে মামা বললেন ঃ ঠিক বলেছি তো, শুধু শুধু হয়রানি হল।

আবার আমরা বাসের কাছে ফিরে এলুম। তারপরে যেদিক থেকে এসেছিলুম সেদিকেই এগিয়ে দেখলুম যে পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছি। এই পথে আসবার সময় এই জায়গাটি আমরা দেখতে পাই নি। খানিকটা উন্মুক্ত জায়গা, তারই এক ধারে টিকিট ঘর। টিকিট কেটে পাহাড়ে উঠতে হবে। মামা নিজেই এগিয়ে গেলেন টিকিট কাটতে। তিনি চারখানি টিকিট কাটলেন এবং অম্লান মুখে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

একটুখানি এগিয়েই ফিরে আসতে হল। স্বাতির ক্যামেরার জন্যে টিকিট কাটা হয় নি। যে বাধা দিয়েছিল, স্বাতি তাকেই বলল ঃ দরকার নেই আমার ক্যামেরার, এটা তোমরাই রাখ।

কিন্তু সে তার ক্যামেরা রাখতে রাজী নয়। অগত্যা ফিরে গিয়ে ক্যামেরার টিকিট কাটতে হল। স্বাতি বলল ঃ টিকিট যখন কেটেছি, তখন পাখির ছবি নিতেই হবে।

এখানেও বাঁধানো সিঁড়ি, মসৃণ সুন্দর। দুধারের পাহাড়ে নানা রকমের গাছপালা। রৌদ্র প্রখর হয়েছে, কিন্তু উত্তাপ অসহ্য হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে ছায়ায় দাঁড়িয়ে ক্লান্তি দূর করা যায়। এবারের ভ্রমণে আমরা আরও দুবার পাহাড়ে উঠেছি এমনি করে। সীমাচলমে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয় নি। নতুন সড়ক ধরে মোটর গাড়ি উঠেছে মন্দিরের দরজার কাছাকাছি। আমরা পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠেছি বিজয়ওয়াড়ায় আর মঙ্গলগিরিতে। বিজয়ওয়াড়ায় কষ্ট হয় নি, কষ্ট হয়েছে মঙ্গলগিরিতে। এখানে বোধহয় মঙ্গলগিরির চেয়েও কিছু বেশি সিঁড়ি। কে একজন বললেন যে এখানকার সিঁড়ির সংখ্যা হল পাঁচ শো সাঁইত্রিশ।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে মামা মামী অনেকখানি উঠে এসেছিলেন। এইবারে সিঁড়ির সংখ্যা শুনেই বসে পড়লেন। অস্ফুটস্বরে বললেন ঃ গোপাল দেখছি মানুষ খুন করতে পারে।

আমি কয়েক ধাপ উপরে ছিলুম। স্বাতি আমাকে ছাড়িয়ে উপরে চলে গেছে। জনকয়েক রাজস্থানী মেয়ে প্রবল কলরব করে উঠছিল। যে মেয়েটি একটু বেশি মোটা, সেই তাড়াতাড়ি উঠছে, আর অন্যরা হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। মামী বসলেন না, কিন্তু মামার পাশে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগলেন। মামার মন্তব্য আমি শুনতে পেয়েছিলুম, কিন্তু কোন উত্তর দিলুম না। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম তাঁদের জন্যে।

খানিকটা দম পেতেই মামা বললেনঃ কত সময় আছে আর?

উপর থেকে আমি বললুমঃ তাড়াতাড়ি কিছু নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে মামা বললেনঃ বেশ বলেছ। পাঁচশো সাঁইত্রিশটা সিঁড়ি ভাঙিয়ে বলবে, খেলা শেষ হয়ে গেছে, এবারে নামো।

বলে থপথপ করে আবার উঠতে লাগলেন।

ভারি মানুষ, তাই পরিশ্রম হয় বেশি। শখ আছে, মনের জোরও আছে, তাই কষ্ট করেও ওঠেন। মামী মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু বুঝতে পারি যে তাঁরও কষ্ট হয়। তিনি শখে ওঠেন না, ওঠেন ধর্মের টানে। অলৌকিক ঘটনাকে তিনি ধর্ম বলে মনে করেন।

স্বাতি অনেক উপরে পৌঁছে গিয়েছিল। এক সময় বলে উঠলঃ ওপরেও একটা মন্দির আছে গোপালদা। কিন্তু সবাই অন্য দিকে যাচ্ছে।

আমি বললুমঃ পাখি আসবার সময় হয়েছে বোধহয়।

নিচে থেকে মামা বললেনঃ তাই নাকি!

আমি আবার ঘড়ি দেখলুম। বেলা প্রায় এগারটা। বললুমঃ পাখি শুনেছি সাড়ে এগারটায় আসে। এখনও প্রায় আধ-ঘণ্টা বাকি।

হঠাৎ একজন লোককে হনহন করে উপরে উঠে যেতে দেখলুম। গায়ের রঙ কালো। পরণে সাদা ধুতি, কোনো জামা নেই গায়ে। মাথায় ঝুঁটি, তার চারিধারটি কামানো। নিচের দোকানে ছবিতে যেরকম লোক দেখেছিলুম পাখিকে খাওয়াচ্ছে, কতকটা সেই রকমেরই চেহারা। পরে জেনেছিলুম যে ইনি ব্রাহ্মণ নন, তবে এঁরাই পাখির ভোগ দিচ্ছেন পুরুষানুক্রমে।

ভোগের কথা আমি শুনেছিলুম—খিঁচুড়ি আর শরবৎ ভোগ। কিন্তু স্থানীয় লোকের কাছে জানলুম যে তা নয়, ভোগ হয় পায়সের, আর পানীয় ঘি। এই ভোগের সঙ্গে আফিং মেশাবার কথাও শুনেছি অবিশ্বাসীর কাছে। তারা বলে যে পাখিকে বশ করা হয়েছে আফিং খাইয়ে, নেশার জন্যেই আসে নির্দিষ্ট সময়ে। এই অবিশ্বাসের কথা আমি কাউকে বললুম না।

স্বাতি যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, সেখানে পৌঁছে দেখলুম যে আরও অনেকগুলি ধাপ উপরে উঠলে মন্দিরের দরজায় পৌঁছনো যাবে। কিন্তু সেদিকে খুব অল্প লোকেই যাচ্ছে। বেশি যাচ্ছে অন্য ধারে। তারা একটা বেড়ার ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে ঐখানে দাঁড়িয়ে পাখির ভোগ খাওযা দেখা যাবে। স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ কী করবে ?

বললুম ঃ মামীমাকে মন্দিরের ঠাকুর দেখাতে হবে।

স্বাতি বলল ঃ তুমি দেখাও, আমি আর রিস্ক নিতে রাজী নই।

মামা এসে পৌঁছতেই বলল ঃ এস বাবা, একটা ভাল জায়গা দেখে দাঁড়ানো যাক।

মামী আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম ঃ আগে শিবের দর্শন করবেন তো !

মামী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ঃ পাখি দেখতে তো উঠি নি !

যা দেখতে উঠেছ তাই দেখ।

বলে মামা স্বাতির সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। আমি মামীকে নিয়ে মন্দিরে উঠতে লাগলুম। মামী বললেন ঃ ধর্মজ্ঞান এদের একেবারে নেই।

মন্দিরের ব্রাহ্মণ মামীকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। আমি দূর থেকেই শিবকে প্রণাম করে পাখির আগমনের সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলুম। কিছু কিছু খবরও সংগ্রহ করতে পারলুম। ইন্দ্রের বজ্রের মন্দির প্রদক্ষিণের কথা কেউ বলতে পারল না, তবে শঙ্খতীর্থের কথা শুনলুম। শঙ্খ ওঠে শঙ্খতীর্থ থেকে। কার্তিক মাসের শেষ সোমবারে

এই ছোট মন্দিরে শিবের সব চেয়ে বড় উৎসব। এক হাজার আ শঙ্খের জলে শিবের অভিষেক স্নান হয়। শিবের নাম বেদগিরীশ্বর, আর দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী। মার্কণ্ডেয় মুনি এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও নন্দীর তপস্যার কথাও শুনলুম। কিন্তু আমার মন ছিল পাখির দিকে।

পাখির গল্পও জানা গেল। গত চার যুগ ধরে এই পাখি আসছে। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে তারা বদল হয়েছে। কলিযুগে যে পাখিরা আসছে তাদের নাম পুষা ও বিধাতা। কলির শেষে তাদের মুক্তি হবে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে কাহিনী মুখে মুখে চলে আসছে তাতে জানা যায় যে এই পাখিরা শাপভ্রষ্ট ঋষি। তাঁরা কাশীর গঙ্গায় স্নান করে পক্ষীতীর্থে আসেন খাবার জন্যে, তারপরে রামেশ্বরে পূজার্চনা করে চিদম্বরমে বিশ্রাম করেন।

ওলন্দাজদের কথাও শুনলুম। ওরুক্কল মণ্ডপম নামে একটি এক-পাথরের প্রাচীন মণ্ডপ আছে এখানে। এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু কোথায় সেটি তা এদের কথায় বুঝতে পারলুম না। এই মণ্ডপের দেওয়ালে নাকি অনেক ওলন্দাজের স্বাক্ষব ও তারিখ আছে—শাসনকর্তাদেরও স্বাক্ষর আছে। ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তারা এই পক্ষীতীর্থের অলৌকিক ঘটনা দেখবার জন্য আসত।

মামী তাঁর পূজা শেষ করে বেরিয়ে এসেই আমার মাথায় নির্মাল্য দিলেন, আর কিছু পয়সা চেয়ে নিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণের হাতে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় আমি থমকে দাঁড়ালুম। এখান থেকেই সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বিরাট একখানা ন্যাড়া পাথরের উপরে সেই পূজারী এসে বসেছেন। চারি দিকেই উঁচু পাহাড়। এধারে লোহার ফেন্‌সিং, তার উপরেও লোকে বসেছে। অন্য ধারে নিচু দেওয়াল দেওয়া আছে, তার গায়ে একটি ছোট দরজা। সেই দরজা দিয়ে এসে পূজারী বসেছেন পাথরের উপরে। পিতলের একটি বড় ঘড়া পাশে, আর সামনে একটি ছোট বাটি। পাখির অপেক্ষা করছেন তিনি।

আমি আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, কিছু দেখা যাচ্ছে না। কাছে কোথাও কোন পাখি উড়ছে না। হঠাৎ দেখলুম যে খানিকটা দূরে ঐ পাথরের উপরেই একটা মস্তবড় শাদা পাখি পাখা ঝটপট করে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। বুড়ো পাখি, উড়বার যেন ক্ষমতা নেই, কোনরকমে একটু একটু করে নিচে থেকে উপরের দিকে উঠছে।

সিঁড়ির ধাপের উপরেই আমরা স্থির হয়ে দাঁড়ালুম। দ্বিতীয় পাখিটি এল না। একটি পাখিকেই ভোগ দিয়ে পূজারী সেই পাথর থেকে নেমে এলেন একটা চালা ঘরের সামনে। হুড়মুড় করে সব যাত্রীরা সেই দিকে ছুটল প্রসাদের লোভে।

আমি লক্ষ্য রেখেছিলুম পাখির দিকে। পাখিকে উড়ে যেতে দেখলুম না। কোথায় গেল তাও দেখতে পেলুম না। বিমর্ষ মনে আমি নেমে এলুম।

৫

পাহাড় থেকে যখন আমরা নেমে এলুম, বেলা তখন বারোটা বেজে গেছে। মামী বললেন ঃ খাবার জায়গা থাকলে এইখানেই খেয়ে নাও।

মামা আমার দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল ঃ মহাবলীপুরম পৌঁছতে তো আধঘণ্টা সময় লাগবে। সেখানেও খাওয়া যেতে পারে।

আমি বললুম ঃ এখানকার ব্যবস্থা আগে দেখে নেওয়া দরকার।

একটুখানি এগিয়ে দেখলুম যে আশেপাশে একাধিক হোটেল আছে। সবই ব্রাহ্মণ হোটেল। তার মানে নিরামিষ আহার। যাত্রীদের অনেকেই ইতিমধ্যে মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসে গেছেন। হোটেলের চেহারা দেখে ভক্তি হয় না, বসবার ব্যবস্থা দেখে ভয় করে। কিন্তু খাবার দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সরু চালের গরম ভাত, খাঁটি ঘি, দুরকম তরকারি সম্বর রসম কলাপাতার উপরে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছে। নিজের চোখে ব্যবস্থা দেখে মামা খেতে বসলেন। বললেন ঃ যাই বল, এদের মধ্যে নোংরামি নেই।

খেয়ে দেয়ে আমরা বাসে এসে বসলুম। তখনও সবাই ফিরে আসে নি। মামা তাঁর পাইপ ধরিয়ে আমাকে একটা কঠিন প্রশ্ন করলেন, বললেন ঃ বুঝলে গোপাল, পক্ষীতীর্থের পাখি দেখে নানা জনে নানা কথা বলছে। কেউ বলছে, ওসব শেখানো পাখি, নেশা খাইয়ে বশ করে রেখেছে। এ কালের ব্যাপার হলে ভাবতুম খুবই বিশ্বাসযোগ্য কথা, কিন্তু কথাটা একালের নয়। যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে যে এ ব্যাপার বহুদিন থেকেই চলে আসছে, লোক ঠকানোর বুদ্ধি তখনও মানুষের হয় নি। তোমার কি মনে হয় এ সবই বুজরুকি ?

ঠিক এমন করে এ কথা ভাবি নি। তাই বললুম ঃ খুবই কঠিন প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নটি বোধহয় কেউ কাউকে করে নি।

মামা খুশী হলেন আমার কথা শুনে বললেন ঃ তোমার নিজের কী মনে হয় ?

বললুম ঃ অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। এ জায়গার নাম থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিরুক্কলু কুন্‌রম মানে পবিত্র চিলের ছোট পাহাড়। যে পাখি দেখলুম তা চিলের মতোই বড় পাখি, তবে রঙ সাদা। এই পাহাড়ে এই রকমের পাখি একসময় অনেক ছিল বলেই বোধহয় পাহাড়টারই এই নাম হয়েছিল। শিবের মন্দিরটিও পুরনো, আর বনের পশু পাখিকে পূজার প্রসাদ দেবার রীতিটিও প্রাচীন। কাজেই এই পাখিদের খাওয়াবার ব্যবস্থা বোধহয় পুরাকাল থেকেই চলে আসছে।

কিন্তু দুটি পাখি আসবে কেন ! পাখি আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে, যেমন ছাদে খাবার ছড়ালে পায়রা এসে জোটে !

যদি চেষ্টা করা যায়, তাহলে দুটিকেও খাওয়ানো সম্ভব। পূজারীরা যদি ঠিক করেন যে প্রতিদিন দুটি পাখিকে খাওয়াবেন, তাহলে পাখিরা তাই মেনে নেবে।

স্বাতি বলল ঃ আজ তো একটি পাখি এসেছিল !

বললুম ঃ কোনদিন হয়তো একটিও আসে না।

তাও কি হয় নাকি !

আজকের যাত্রীরা তো সে কথা জানে না, যারা জানে তারা বলবে না। আমরা একটি পাখি দেখেছি, না একটিও দেখি নি, কাল যে যাত্রীরা আসবে তারা সে খবর পাবে না।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন ঃ ঠিক বলেছ।

স্বাতি বলল ঃ মিথ্যা জেনেও তো সবাই আসছে !

বললুম ঃ আসবেই তো। আশ্চর্য হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই তারা উঠেছে, আর এই বিশ্বাসের অভাবেই আজ তারা ডুবছে।

বাস ছাড়বার সময় হয়েছিল। ড্রাইভার এসে হর্ন বাজাল। যাত্রীরা নিকটেই ছিলেন, হুড়মুড় করে এসে উঠে পড়লেন। বাসের কণ্ডাক্টর একবার দেখে নিল সবাইকে, তারপরে চলবার সঙ্কেত করল।

আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। এবারে খুব বেশি দূর নয়, মাত্র ন মাইল পথ। সোজা সরল রাস্তায় সমুদ্রের ধারে পৌঁছতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো আমরা পৌঁছে যাব।

স্বাতি আমার জ্ঞানের পরীক্ষা নেবার মতলবে বলল: বলতো গোপালদা, এই মহাবলীপুরমের প্রতিষ্ঠাতা কে?

বললুম: পল্লব বংশের কোন রাজা।

স্বাতি উৎফুল্ল হয়ে বলল: হল না। পুরাণের বলি রাজা জান? বামন অবতার? সেই বলিরাজার পুরী ছিল বলে নাম মহাবলীপুরম। তাই সেখানে দেখবে, বলি রাজার মাথায় পা দিয়ে বামন অবতার দাঁড়িয়ে আছেন, পাহাড়ের গায়ে ছবি খোদা আছে।

বললুম: এই যদি তোমার যুক্তি হয় তো আমি বলব, পাণ্ডবের রাজধানী ছিল এইখানে। পাহাড়ের গায়ে বামন ভিক্ষার মতো অর্জুনের তপস্যাও আছে। কোন্ সাতটি রথের জন্য এর সেভেন প্যাগোডাস নাম হয়েছিল তাতো জানি নে, তবে এক জায়গায় যে পাঁচটি রথ এখন আছে তাদের নাম ধর্মরাজ রথ ভীম রথ অর্জুন রথ দ্রৌপদী রথ ও নকুল-সহদেব রথ।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: পাণ্ডবের রাজধানী তো ইন্দ্রপ্রস্থে ছিল।

আমি বলছি যে কৌরবরা যখন তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন, তখন তাঁরা এইখানে এসে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তুমি এ কথা অস্বীকার করতে পার?

স্বাতি ফাঁপরে পড়ল। আর মামা জিজ্ঞাসা করলেন: পাণ্ডবরা কি সত্যিই এখানে এসেছিলেন?

বললুম: সে খবর তো জানি নে মামাবাবু, তবে এটুকু জানি যে পুরাণের বলিরাজার সঙ্গে মহাবলীপুরমের কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক নেই দক্ষিণ ভারতের মহাবলী বংশের সঙ্গেও, যাদের অভ্যুত্থান হয়েছিল নবম ও দশম শতাব্দীতে। তার অনেক আগে থেকে আমরা মহাবলীপুরমের সমৃদ্ধির পরিচয় পাই।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ বলি রাজারও আগে থেকে!

বলি রাজার নয়, মহাবলি বংশের আগে থেকে। কেরালার লোকেরা দাবী করে যে বলিরাজা ছিলেন তাদের দেশের রাজা। সেই প্রজাবৎসল অসুররাজ মহাবলি আজও দেশের ওনাম উৎসবের সময় প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখবার জন্যে আসেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে তাই তারা ঘর দোর সাজায়, নতুন কাপড় পরে, উৎসব করে নানারকম। তাদের প্রিয় রাজা বলি যেন তাদের সুখ সমৃদ্ধি দেখে খুশী হতে পারেন।

মামা বললেন ঃ সত্যি নাকি! কখন্ এই উৎসব হয়?

বললুম ঃ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হয় বলে শুনেছি। বাঙলার নবান্নের মতো এই উৎসব হয় প্রতি ঘরে ঘরে। কেরালায় ধান কাটা হয় এই সময়ে।

স্বাতি বলল ঃ তবে মহাবলীপুরম নাম হল কেন তাই বল।

মহাবলীপুরম নামটি পুরাকালের নয়! মামল্লদের নগর মামল্লপুর থেকে কালক্রমে নাম হয়েছে মহাবলীপুর। সপ্তম শতাব্দীর পল্লবরাজা প্রথম নরসিংহবর্মনের উপাধি ছিল মামল্ল। কিন্তু এই মহাবলীপুরম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এর অনেক যুগ আগে থেকে। পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রীয়ান সী-র নাম শুনেছ?

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল ঃ না।

বললুম ঃ প্রথম শতাব্দীর কোন গ্রীক নাবিক এই বইখানি লিখেছিলেন প্রথম শতাব্দীতে। তাতে এই বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাবেরী নদীর মোহনার উত্তরে পডুক মানে পণ্ডিচেরি আর মহাবলীপুরম। পরবর্তী শতাব্দীর গ্রীক ভৌগোলিক টোলেমিও এই বন্দরের উল্লেখ করেছেন মলঙ্গ বা ঐ ধরনের কোন নামে। মাঝে মাঝে এই অঞ্চলের মাটিতে প্রাচীন রোমান মুদ্রা খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোমের সঙ্গে এই বন্দরের যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল প্রায় দুহাজার বছর আগে, এ তারই প্রমাণ।

চীনা পরিব্রাজক হিউ এন চাঙ একটা সন্দেহের কথা বলেছেন। সপ্তম

শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে এসে তিনি কাঞ্চীকে বলেছেন পল্লব রাজাদের একটি সমৃদ্ধ বন্দর। কিন্তু কাঞ্চী কোন কালেই সমুদ্রের তীরে ছিল না, আজও নেই। পল্লব রাজাদের বন্দর ছিল মহাবলীপুরম আর হিউ এন চাঙ বোধ হয় এই বন্দরেরই উল্লেখ করেছেন।

যে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পাথরের মূর্তি দেখে তার বয়স বলতে পারেন, তাঁরা বলেন যে মহাবলীপুরমের স্থাপত্য কর্ম পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকালের। তার মানে এ সবের বয়স হয়েছে প্রায় তের শো বছর। তখন সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির জন্য এই বন্দরের নাম ভারতের বাহিরেও বিখ্যাত ছিল। এইখান থেকেই এদেশের লোক বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করেছে সমুদ্র পেরিয়ে, ভারতেব শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিস্তার করেছে দেশান্তরে। জাভা ও কাম্বোডিয়ার লোকেরা এইখান থেকে নিয়ে গেছে ভারতের সংস্কৃতির খবব আর শিল্পের নমুনা। আজকাল দ্রাবিড় স্থাপত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রধানত পল্লব রাজাদেরই কীর্তি। ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই পল্লব রাজারা নানা স্থানে মন্দিরাদি নির্মাণ করেছেন।

অনেকে অবশ্য মহাবলীপুরমের এই সব স্থাপত্য কর্ম আরও পুরনো বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা যে কল্যাণপুরেব চালুক্যরা এই সব নির্মাণ করেছিলেন প্রাচীন বৌদ্ধ মডেল অনুসরণ করে। এই মতের স্বপক্ষে আমি কোন যুক্তি শুনি নি। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন মতভেদ নেই—শত শত শতাব্দী আগে ভারত নিপুণ ছিল স্থাপত্য শিল্পে। ভারতের সেই স্বর্ণ যুগের সাক্ষী হয়ে আছে মহাবলীপুরম।

গম্ভীরভাবে মামা বললেন ঃ সবই বুঝলাম, কিন্তু মামল্ল থেকে মহাবলী এ কথা ঠিক মনের মতো হল না।

আমি বললুম ঃ আরও একটি নাম আমি শুনেছি। বৈষ্ণব মুনি তিরুমঙ্গাই আলবার বোধহয় নরসিংহ বর্মনের উত্তরাধিকারী নন্দীবর্মনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি এ জায়গার নাম বলেছেন কদলমাল্লাই। এখানকার বন্দর, নানা পণ্যে ভরা জাহাজ আর বড় বড় হাতির কথা পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।

দেখতে দেখতেই ন মাইল পথ আমরা পেরিয়ে এলুম। বাকিংহাম খাল আমাদের ´ডিঙোতে হল। পুরাকালে যাত্রীরা এইখানে নৌকো বেয়ে আসত মাদ্রাজ থেকে। তাতেই সময় সংক্ষেপ হত। মোটরে চেপে এখন লোকে দু ঘণ্টাতেই চলে আসছে।

বুঝতে পারছিলুম যে আমরা মহাবলীপুরমে পৌঁছে যাচ্ছি। কিন্তু কোন জনমানব বা ঘর বাড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম না। পথের দুধারে কতকগুলে. ড বড় পাথর দেখা গেল, আর একটা পাহাড়ের পাশ দয়ে আমাদের 'স এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল। ছোট খাট দোকান পাট হোটেল আর রেস্ত.রা আছে গোটাকয়েক, কয়েকখানা বাসও দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমরাও নেমে পড়লুম।

মাটিতে পা দিয়ে মামা বললেন ঃ এই তোমার মহাবলীপুরম!

এই কথাই প্রথমে মনে আসবে। পল্লব রাজাদের সময় যে জমজমাট বন্দর ছিল এখানে, তার কোন চিহ্ন নেই। শহর বলে ভাবতেও যেন কষ্ট হয়। গ্রাম বললেও ভুল হবে। এ যেন রাজপথের পাশে বাস দাঁড়াবার জায়গা—দূরের গ্রাম থেকে যাত্রীরা এসে এখানে ওঠা নামা করে, তাই তাদের প্রযোজনেই কিছু দোকান-পাট আছে। চারিদিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল ঃ কোথায় যাব এবারে?

মামা বললেন ঃ কোন গাড়ি ভাড়া কর। যা কিছু দেখবার আছে, সব দেখিযে আনবে।

কিন্তু গাড়ি কোথায়! ট্যাক্সি তো দূরের কথা, একটা রিক্সাও দেখতে পাচ্ছি না। ঘোড়ার গাড়িও নেই। যাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা এগোতে পারলুম না। একটা হোটেলে ঢুকে আমি খবর নিয়ে এলুম। এখানে কোন গাড়ি ঘোড়া নেই, ঝট্‌কা বাণ্ডি রিক্সা কিছুই পাওয়া যাবে না এখানে। পায়ে হেঁটেই সব কিছু দেখতে হবে। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির দূরত্ব সম্বন্ধেও আমি ধারণা করে নিলুম। সমুদ্রের ধারে শোর টেম্পল বেশি দূরে নয়, অর্জুনের তপস্যাও কাছে। বরাহ গুহা মহিষমর্দিনী গুহা বা লাইট হাউস দেখতে হলে পাহাড়ে উঠতে হবে। দূরে যেতে হবে পাঁচটি রথ দেখতে হলে। আধ মাইল তো বটে, বেশিও হতে

পারে। মধ্যাহ্নের সূর্য তখন প্রায় মাথার উপরে। এই রৌদ্রে এতখানি পথ হাঁটতে হলে মামা ও মামী দুজনেই বিপন্ন বোধ করবেন। আমি ভয় পেলুম খানিকটা, মামা হয়তো আমার উপরেই রেগে উঠবেন!

জিজ্ঞাসাবাদ করে পিছনে ফিরেই দেখলুম যে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে স্বাতি সব কথাই শুনেছে। বলল ঃ চলে এস গোপালদা, হেঁটেই আমরা সব কিছু দেখব।

স্বাতির কথায় আমি সাহস পেলুম না, বললুম ঃ মামাবাবুর খুব কষ্ট হবে।

কষ্ট মারও হবে।

তবে ?

ভয় পেলে তো চলবে না, উপায় একটা করতেই হবে!

অপরাধীর মতো আমি এগিয়ে গেলুম। মামা বোধ হয় আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন যে কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। বললেন ঃ কিছু পেলে না তো!

স্বাতি বলল ঃ সব কাছাকাছি, দরকার নেই কোন যানবাহনের।

তবে দেখাবে কে ?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

একথা আমি জেনে নিয়েছিলুম, বললুম ঃ গাইডেরও এখানে দরকার নেই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নক্সা দেওয়া আছে।

একটা লোক মামার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখিয়ে তিনি বললেন ঃ তবে এ লোকটা আমার পিছনে কেন ঘুর ঘুর করছে!

বলেই তাকে একটা তাড়া দিলেন। লোকটা পালিয়ে গেল।

একটুখানি এগিয়েই একটা চৌরাস্তা। তারই এক ধারে একখানা কালো বোর্ডের উপরে শহরের নক্সা। আমরা পশ্চিম দিক থেকে এসেছি। সোজা পূর্ব দিকে গেলেই সমুদ্র। তার ধারে শোর টেম্পল। সেই দিকে তাকিয়ে মামা বললেন ঃ কই, সমুদ্র তো দে ত পাচ্ছি না!

আমরাও সেদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলুম না। মনে হল যে খানিকটা এগোলেই হয় তো সমুদ্র দেখা যাবে। যে দিক থেকে এসেছি

সেই দিকেই পাহাড়, আর পাহাড়ের গায়ে অর্জুনের তপস্যা। স্বাতি বলল ঃ বাসে বসেই বোধ হয় দেখতে পেয়েছিলাম।

দক্ষিণের দিকে চেয়ে মামা বললেন ঃ তারপর ?

নক্সা দেখেই দূরত্বের অনুমান করা যাচ্ছে। মামী পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ অনেক দূর বুঝি ?

উত্তর মামা দিলেন, বললেন ঃ এই দুপুর রোদে এত পথ হাঁটা ভদ্র-লোকের কর্ম নয় !

মামী বললেন ঃ হাঁটতে যদি না পার তো বসে থাক না কোথাও।

মামীর পরামর্শেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। স্বাতি বলল ঃ সেই ভাল, যতটুকু পারি ততটুকুই আমরা দেখব।

সমুদ্রের দিকে কয়েক পা এগিয়েই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল। রাস্তার দক্ষিণে কয়েকটা ছোট দোকান, শাঁখ শামুক আর কড়ির মালা সাজিয়ে বসেছে। নানারকমের সামুদ্রিক জিনিস। মামী সেই দিকে এগিয়ে যাবেন কিনা ভাবছিলেন, এমন সময় খান কয়েক সাইকেল রিক্সা দেখতে পাওয়া গেল। সমুদ্রের ধার থেকেই আসছে, কিন্তু আরোহী আছে রিক্সায়, আর সবই বিদেশী পুরুষ ও মহিলা। মামা আমার উপরে চটে উঠলেন, বললেন ঃ কী রকম খবর আনলে তুমি !

বলে নিজে এগিয়ে গেলেন দোকানগুলির সামনে। দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে ওসব রিক্সা মহাবলীপুরমের নয়, বাইরে থেকে এসেছে !

ধারে কাছে কি শহর আছে নাকি ?

মামার প্রশ্ন কেউ বুঝল না। তাই দেখে মামী বললেন ঃ সবাই তো হেঁটেই যাচ্ছে, তুমি এমন ভয় পাচ্ছ কেন !

ভয়ের কথা কে বলছে !

বলে মামা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

আমি ভেবেছিলুম যে ফাঁড়া বোধ হয় কেটে গেল। কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে রক্ষা করবে ! সমুদ্রের ধারে পৌঁছবার আগেই এক-খানা ট্যাক্সি আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একেবারে শোর

টেম্পলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল দেখতে পেলুম। আর জন কয়েক মেয়ে পুরুষকে নামতে দেখেই মামা আমাকে আক্রমণ করলেন। বললেন ঃ এই রকম যে হবে তা আমি আগেই জানি।

মামী বললেন ঃ হয়েছে কী ?

বাসে আসবার কী দরকার ছিল !

উত্তর মামী দিলেন, বললেন ঃ এখানে আসবারই বা কী দরকার ছিল!

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। চোখের সামনে তখন দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি, আর শুনতে পাচ্ছি তার গম্ভীর গর্জন। মামার দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে দেখলুম। রাগের কথা তিনি নিমেষে ভুলে গেলেন।

৬

স্বাতি মন্দিরের দিকে গেল না, সে ছুটল সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের ধারেই মন্দির, মন্দিরে গেলে সমুদ্রও দেখা যাবে। কিন্তু স্বাতি সমুদ্র আর মন্দির দেখবে এক সঙ্গে। দূরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে দেখবে সমুদ্রের মন্দির বন্দনা। আমারও ইচ্ছা হয়েছিল তার সঙ্গে ছুটে যেতে, কিন্তু সঙ্কোচ হয়েছিল মামা মামীকে ছেড়ে যেতে। পরে সে সুযোগ পেয়ে গেলুম। মামী চেঁচিয়ে উঠেছিলেনঃ স্বাতি ওদিকে যাচ্ছে কেন?

সে তখন পথের উপর থেকে নিচের বালুবেলায় নেমে পড়েছিল। এগিয়ে যাচ্ছিল দুরন্ত সমুদ্রের দিকে, যেখানে ঢেউএর পর ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ছিল, কলকল করে জল আসছিল এগিয়ে, আর শাদা ফেনায় ঢেকে যাচ্ছিল ভিজে বালি। মামা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেনঃ তুমি এগিয়ে যাও গোপাল, ওকে জলে নামতে দিও না।

এক নিমেষে আমি স্বাতির কাছে পৌঁছে গেলুম। স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসিতে আমি লজ্জা পেলুম। মনে হল যেন আমাকে সে উপহাস করল। কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলে আরও বেশি হাস্যাস্পদ হব ভেবে আমি চুপ করে রইলুম।

স্বাতি ছবি তুলবে এই সৈকত মন্দিরের। এখানকার সমুদ্র নয় ওয়াল-টেয়ারের সমুদ্রের মতো। কোন পথ নেই সমুদ্রের ধারে ধারে, ঘর বাড়ি নেই, যানবাহন নেই কোনও। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ সমুদ্র এখানে কূলের উপরে এসে আছড়ে পড়ছে না। গর্জন করছে না দুরন্ত আক্রোশে। এখান-কার সমুদ্র একটি মন্দিরকে প্রণাম করবার জন্য বারে বারে আসছে মাথা নত করে। স্বাতি মন্দিরের দিকে মুখ করে তার ক্যামেরা খুলল।

একটি মন্দির ও তার গোপুর পাশাপাশি। প্রথম নজরে দুটি মন্দির বলে মনে হয়। নাম এর শোর টেম্পল। পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা

অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এই সৈকত মন্দির, সমুদ্র থেকে অনেকটা উঁচুতে। তাই সমুদ্রের জলের আঘাত মন্দিরের গায়ে লাগে না, লাগে পায়ে। একটার পর আর একটা ঢেউ আসে ফণা তুলে তুলে, তারপর মন্দিরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কঠিন পাথরে লেগে তোলপাড় হয় নীল জল, দুপুরের রোদে গলা রূপোর মতো ঝকঝক করে।

একখানা ছবি তুলে স্বাতি আমার দিকে ফিরতেই আমি বললুম তোমার ছবি খুব জীবন্ত মনে হবে না।

কেন

লম্বা জাল নিয়ে দুটো লোক আসছে মাছ ধরতে। ওরা তোমার ছবিকে প্রাণ দিতে পারবে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : সমুদ্রকে তোমার জীবন্ত মনে হচ্ছে না! আর ঐ যাত্রীর দল, যারা মন্দিরের পিছনে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে!

তোমার ছবিতে ওদের পুতুল বলে মনে হবে।

স্বাতি বোধহয় মেনে নিল আমাব মন্তব্য, তাই অপেক্ষা করতে লাগল ঐ লোক দুটির জন্য। ধীর পদক্ষেপে এসে তারা জাল খুলল জলের কাছে। লম্বা জাল, দু মাথায় দুজন দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জল ছেঁকে মাছ ধরবে। শাঁখ ঝিনুক কড়িও বোধহয় তুলবে। কিন্তু তা দেখবার জন্য আমরা অপেক্ষা করলুম না। সময় আমাদের কম। তাই স্বাতি আর একখানা ছবি তুলতেই আমরা মন্দিরের দিকে এগোলুম।

ক্যামেরা বন্ধ করে স্বাতি বলল : তোমার মতলব আমি বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

সমুদ্রের ধারে তোমার ভাল লাগছিল বলে আরও খানিকক্ষণ আমাকে আটকালে।

মনে মনে আমিও একখানা ছবি এঁকে নিলুম। সেখানে জেলে নেই, সমুদ্র নেই, মন্দিরও নেই।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : কী আছে বলতে হবে না।

হাসিমুখে আমি বললুম : পরম সুন্দরের ধ্যানে পৃথিবীর সব ছবি মুছে যায়।

মন্দির দেখে যাত্রীরা তখন বেরিয়ে আসছে। আমরা ছুটে গেলুম ভিতরটা দেখবার জন্য। দুটো মন্দির নয়, মন্দির একটাই, আর একটা তার গোপুর। একই রকমের শিখর বলে দুটিকেই মন্দির বলে মনে হয়। কিন্তু এই শিখরগুলি দক্ষিণ ভারতের কোন মন্দিরের মতো নয়। অজস্র মূর্তিতে তা কণ্টকিত নয়, জ্যামিতির নক্সার মতো তার কারুকার্য। বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের কথা সহসা মনে পড়ে। তারপরে চোখে পড়ে তার পার্থক্য। অনেক ছোট, হয়তো বা নিম্ন মানের স্থাপত্য। কিন্তু সমুদ্রের সান্নিধ্যে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মন্দিরের কক্ষগুলি আমরা তাড়াতাড়ি দেখে নিলুম। এ মন্দির বোধহয় শিবের মন্দির ছিল, ভগ্নপ্রায় শিবলিঙ্গেব চিহ্ন আছে। আরও অনেক দেব-দেবীর মূর্তি আছে দেওয়ালেব গাযে। পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মন্দির রক্ষার ব্যবস্থাও দেখলুম। অবিরাম তরঙ্গের আঘাতে মন্দিরটি যাতে ভেঙ্গে না পড়ে, তারই জন্য অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাঁধ দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের উপরে। যাত্রীরা এইখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের রূপ দেখে। মামা মামীও এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন: এইখানে নাকি এই রকমেব মন্দির ছিল সাতটি?

বললুম: এইখানে ছিল কিনা জানিনে, তবে সাতটি মন্দির যে কোথাও ছিল তাতে সন্দেহ নেই। না থাকলে সাহেবরা এ জায়গাকে সেভেন প্যাগোডাস বলত না।

মামা বললেন: অনেকে বলাবলি করছিল শুনলুম। বলছিল যে রাক্ষস সমুদ্র একে একে ছটি মন্দির গ্রাস করেছে। রক্ষার ব্যবস্থা জোরদার না করলে শেষ মন্দিরটিও সমুদ্র গ্রাস করে ফেলবে।

আমি শুনেছি যে স্থানীয় লোকেদের মুখে মুখেই এই কথা চলে আসছে। আর সত্যিও হতে পারে। কোনারকের সূর্য মন্দিরটি সমুদ্র থেকে কালো দেখতে বলে তারা তাকে ব্ল্যাক প্যাগোডা বলত। আর এখানেও নিশ্চয়ই তারা সমুদ্র থেকে সাতটি মন্দির দেখতে পেত।

মামা বললেনঃ তোমার পঞ্চ রথ আর এই ছুটো নিয়ে সাত নয় তো?

পঞ্চ রথ কি সমুদ্র থেকে দেখা যায়! বোধহয় যায় না।

সময় সম্বন্ধে আমরা খুব সচেতন ছিলুম। সমস্ত মহাবলীপুরম ঘুরে দেখবার জন্য তিন চার ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার দূরত্ব অনেক, কিন্তু পায়ে হেঁটেই সব দেখতে হবে। দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি এমনভাবে চারিদিকে ছড়ানো যে কম করেও মাইল কয়েক হাঁটতে হবে। তাই এক জায়গায় বেশি দেরি করলে আর এক জায়গা দেখা হবে না। আমরাও তাই আর দেরি করলুম না।

এখান থেকে দ্বিতীয় পথ নেই, একই পথ ধরে আমাদের ফিরতে হবে। মেয়েরা মাথার উপর শাড়ির আঁচল তুলে দিয়েছে, আর পুরুষরা হাঁটছে দ্রুত পায়ে। মধ্যাহ্নের উত্তাপ যে তীব্র হয়ে উঠেছে, সামনের যাত্রীদের দেখেই তা বুঝতে পারছি। চলতে চলতেই মামা বললেনঃ গোপাল যে এ রকমের শাস্তির ব্যবস্থা করবে তা বুঝতে পারি নি।

মামী বললেনঃ গোপালের দোষ দিচ্ছ কেন?

তবে কার দোষ দেব?...

দোষ দাও নিজের দেহের।

বলে তাঁর নিজের কোন কষ্ট হচ্ছে না এমনি ভাবে মামী হাঁটতে লাগলেন।

চৌরাস্তায় ফিরে এসে নক্সাটি আর একবার দেখবার জন্য আমি দাঁড়ালুম। প্রথমেই চোখে পড়ল যে শোর টেম্পলের কাছে মহিষাসুর রক নামে একটি দেখবার জিনিস ছিল, তা না দেখেই আমরা ফিরে এসেছি। বেশি দূরে নয়; খুব কাছেই ছিল এই জায়গাটি। দেখে আসতে হয়তো মিনিট কয়েক সময় বেশি লাগত। মনে খানিকটা দুঃখ হল। তাই আবার মনোযোগ দিয়ে দেখলুম নক্সাটা। দক্ষিণের পথ ধরে এগোলে আমরা ফাইভ মানোলিথ্‌সের কাছে পৌঁছব। কিন্তু পথের দূরত্ব দেখে মনে হল যে মামা মামী অতটা পথ হাঁটতে পারবেন না। আর একটা মোড় পাওয়া যাবে খানিকটা এগোলে। সেখান থেকে পাহাড়ে উঠলে

এক নম্বর বরাহ গুহা মহিষমর্দিনী গুহা ও ওলক্কনাথের মন্দির দেখে নেমে আসা যায় কৃষ্ণ মণ্ডপের সামনে। তারই পাশে অর্জুনের তপস্যা! যে পথ ধরে এসেছি, সে পথে সোজা এগোলেই কৃষ্ণ মণ্ডপ। দূরত্ব সামান্য।

স্বাতি আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল: কী দেখছ এমন মনোযোগ দিয়ে

পিছনে তাকিয়ে আমি দেখলুম যে মামা-মামী এখনও এসে পৌঁছন নি। তাই নির্ভয়ে বললুম: ফাইভ মনোলিথ্‌স্‌ দেখতে হলে ওঁদের কোথাও বসাতে হবে।

নক্সার দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল: সামনের মোড়টাতেও এমনি দোকান আছে কি

বললুম: কী করে জানব!

বোধহয় আছে।

বলে সে এগিয়ে চলল।

মামা কাছে এসে গিয়েছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন: স্বাতি কোথায় চলল?

বললুম: গুহা দেখতে গেল।

সে আবার কত দূর?

মামী বললেন: চলতে না পারলে বোসো একটা গাছতলায়।

মামা দাঁড়ালেন না, বললেন: দেখি কত দুর্ভোগ আছে।

পরের মোড়টায় পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। এখানেও অনেকগুলি দোকান, তারই সামনে গ্রামের লোক ডাব বিক্রি করতে বসেছে। পাহাড়ের শেষ হয়েছে এইখানে। ফেরার পথে গুহাগুলি দেখবে বলে যাত্রীরা দক্ষিণের দিকে এগিয়ে গেছে। তাদের পিছনেই স্বাতি এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলুম না। মামী আমাকে রক্ষা করলেন, বললেন: আমরা এই গাছের ছায়ায় একটুখানি বসছি, তোমরা দেখে এস।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে মামা এক ধমক দিলেন, বললেন: কথাটা বুঝতে পারলে না বুঝি!

আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করলুম না। আমিও ছুটলুম সবার পিছনে। স্বাতিকে ধরে ফেলতে আমার সময় লাগল না। তার পাশা-পাশি এসে পৌঁছতেই সে বলল ঃ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো ?

হেসে বললুম ঃ মানুষের ও দুর্লভ আশা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না বলেই মানুষ এগোতে পারছে।

স্বাতি বলে উঠল ঃ রক্ষে কর। তোমার তত্ত্বকথা খানিক ক্ষণের জন্যে তোলা থাক। যা দেখতে এসেছি তা দু চোখ ভরে দেখি।

আমি আর কথা বললুম না, নিঃশব্দে চলতে লাগলুম। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের বাঁধানো পথ দক্ষিণে চলেছে। সমুদ্র নেই, পাহাড় নেই, নেই কোন বড় গাছপালা! মাঝে মাঝে ক্যাজুরিনা গাছ দেখতে পাচ্ছি—ঝাউএর মতো গাছ। যাত্রীরা জটলা করে চলেছে। পরিচিত ও অপরিচিত যাত্রী চলেছে এক সঙ্গে। কেউ যাচ্ছে, কেউ ফিরে আসছে। কত আনন্দের কলধ্বনি। আমরা দুজনে চলেছি নিঃশব্দে।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতেই আমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেলুম। পথ নিশ্চয়ই এক মাইলেব কম। এই দুপুর রোদে এক মাইল হাঁটতে কষ্ট অনেক বেশি হত, আর এত মানুষ একসঙ্গে এমন অনায়াসে ঘুরে বেড়াত না। এখানেও অনেক যাত্রী। দলে দলে তারা সবকিছু দেখছে, দেখে যেন শখ মিটছে না কারও।

পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে একটুখানি নিচে নামতে হয়। বেলাভূমির মতো বালুকাময় এক খণ্ড জমির উপরে পাঁচটি রথ আছে কাছাকাছি। রথ নয়, চাকা নেই একটিরও। মন্দির বললেও ঠিক ধারণা হয় না, অথচ ছোট ছোট মন্দিরেরই মতো। ভিতরে দেবতা থাকলে আমরা অসঙ্কোচে মন্দির বলতুম।

পশ্চিমে এক সারি রোগা ঝাউগাছ একটুখানি উঁচুতে শক্ত জমির উপরে। দক্ষিণের জমিও উঁচু, সেদিকেও আছে ঝাঁকড়া ঝাউ। চারটি রথ পাশাপাশি, পশ্চিমে তাদের দরজা। উল্টোদিকে শুধু একটি রথ। এই দুয়ের মাঝে হাতি একটি, সিংহও একটি, ভিন্ন মুখে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ভাল করে সব গুনে দেখলুম। সাতটি নয়, পাঁচটি রথ এখানে অথচ বিদেশী নাবিকেরা এখানে সেভেন প্যাগোডাস আছে বলেছে। বৌদ্ধ মন্দিরকে বলে প্যাগোডা। এই রথগুলিকেই তারা প্যাগোডা বলত কিনা তা জানি নে। তাহলে আর-দুটো প্যাগোডা কোথায় গেল! কিন্তু এই রথগুলো কি সমুদ্রের ধারে ছিল! এখন তো এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, তবে সমুদ্রবেলার মতো বালুকাময় এই অঞ্চলটা। কে জানে, একদিন হয়তো এগুলোও ছিল সমুদ্রের ধারে, খেয়ালী সমুদ্র এখন দূরে সরে গেছে।

ছবি তোলবার জন্যে স্বাতি দক্ষিণের উঁচু জায়গাটিতে গিয়ে উঠে-ছিল। সূর্যকে পিছনে রেখে ছবি তুলতে হবে, তাই ওধারে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সবগুলো রথ এক সঙ্গে পাওয়া বোধহয় দুষ্কর। তাই তাকে ছুটোছুটি করতে হল খানিকটা।

ঘুরে ঘুরে আমি এই সব রথ দেখছিলুম। ছোটখাট পাহাড়ের মতো এক একটি পাথর থেকে এগুলি কুঁদে বার করা হয়েছে। তাই মনোলিথ বলে। মনো মানে এক, আর লিথোস মানে পাথর। এক পাথরের বিরাট হাতি আর সিংহটাও দেখলুম। বিক্ষিপ্ত পাথর আর অসমাপ্ত কাজ যখন দেখছিলুম, স্বাতি তখন ফিরে এল। বলল: এই সব রথের এক একটা নাম আছে, জান গোপালদা?

বললুম: জানি।

কী করে জানলে?

ছবি দেখেছিলুম একটা বইএ।

তারপরে দুজনে মিলে দেখলুম রথগুলি। সবচেয়ে দক্ষিণের রথটির নাম ধর্মরাজ রথ। তারপরে ভীম রথ, অর্জুন রথ ও দ্রৌপদী রথ। অন্য ধারে নকুল-সহদেব রথ। ধর্মরাজ রথ ও অর্জুন রথের গড়ন প্রায় এক রকম। নকুল-সহদেব রথটির সঙ্গেও কিছু মিল আছে। এগুলো ছোট ছোট মন্দিরের মতো দেখতে, শিখর আছে দোতলা তিনতলার মতো। ধর্মরাজ রথটিই সব চেয়ে বড়। দেওয়ালের গায়ে মূর্তি ও কারু-কার্য বেশি। তারপরে অর্জুন রথ, এর গায়েও আছে কারুকার্য। কোন

মূর্তি বা কারুকার্য নেই ভীম রথে, কিন্তু প্রকাণ্ড রথ এটি। ধর্মরাজ বা অর্জুন রথের মতো চতুষ্কোণ নয়, এটির এক দিক লম্বা বেশি, আর দেখতে দোতলার মতো। উপরের তলার ছাদ যেন একটি গরুর গাড়ির ছই। গোপুরমের শীর্ষের সঙ্গেও খানিকটা মিল আছে। নকুল-সহদেব রথের সঙ্গে এই মিলটা আবও বেশি। দ্রৌপদী রথটিই স্বাতির সব চেয়ে ভাল লাগল। বলল ঃ বাঙলার কুঁড়ে ঘরের মতো, তাই না গোপালদা ?

বললুম ঃ তোমার ছবিতে ঠিক খড়ের চালের মতো মনে হবে।

তার দরজার দুধারেব দেওয়ালে দুটি পুরুষ মূর্তি, অন্য ধারের দেওয়ালেও মূর্তি আছে। কিন্তু আশ মিটিযে সব কিছু দেখবার সময় নেই। স্বাতি বলল ঃ তাড়াতাড়ি চল গোপালদা, আবও অনেক জিনিস দেখা বাকি আছে।

পুরনো পথ ধরেই আমরা আবার সেই মোড়ের কাছে ফিরে এলুম। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে মামা মামী একটা দোকানের সামনে দুটো কাঠের বাক্সের উপরে বসে আছেন। বেশ ছায়াশীতল জায়গাটি, নিশ্চিন্ত আরামে তাঁরা বসে আছেন। স্বাতি সেই দিকে এগিয়ে যেতেই এক ডাব-ওয়ালা খচ্ করে একটা ডাব কেটে এগিয়ে দিল, আমাকেও দিল একটা। বুঝতে পারলুম যে তাঁরা নিজেরা এই ডাবের জল খেয়ে আমাদের জন্য বলে রেখেছিলেন। জল শীতল নয়, কিন্তু সুস্বাদু। রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরের গ্লানি দূর হল এই জল খেয়ে।

মামা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী দেখলে তোমরা ?

স্বাতি বলল ঃ সব তোমাকে দেখাব।

আশ্চর্য হয়ে মামা তার মুখের দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল ঃ সবগুলো রথের ছবি তুলে এনেছি।

মামা বললেন ঃ আর একটা রথ আছে অর্জুনের তপস্যার কাছে। সেটা দেখলেই আমাদের রথ দেখা হবে।

বুঝতে দেরি হল না যে মামা এখানে বসে বসেই এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর মামী কিনেছেন একটা শাঁখ আর মালা। দোকানদার

তাই খাতির করে তাঁদের বসতে দিয়েছে। এই সব বাক্সে ভরে ব
তাদের পণ্য আনে সকালবেলায়, আর সন্ধ্যেবেলায় দোকান বন্ধ করে
ফেরে।

মামা বললেনঃ বুঝলে গোপাল, ট্যাক্সিতে এলেও রক্ষা ছিল
তোমাদের গুহা দেখবার জন্যে পাহাড়ে উঠতেই হত।

তারপরেই প্রশ্ন করলেনঃ লাইট হাউস দেখেছ?

বললুমঃ না।

সে কি! সামনেই তো দুটো লাইট হাউস। একটা নতুন আ
একটা পুরনো। ঐ নিচুটা হল পুরনো, ওখানেই ওলক্কনাথের মন্দি
আর উঁচুটা নতুন। পুবাকালে নাকি শোর টেম্পলের শিখর f
সোনার পাতে মোড়া। সেই মন্দিরটাই লাইট হাউসের কাজ করত।

বলে তিনি পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলেন। আর আমবা অনুস
করলুম তাঁকে।

সুন্দর রাস্তা উঠেছে পাহাড়েব উপর। নিচু পাহাড়, তাই চ
মোটেই দুঃসাধ্য নয়। উঠতে কোন কষ্টই হয় না। এক সময় ম
বললেনঃ পাহাড়ের নিচের দিকেই এক নম্বরের বরাহ গুহা, আ
মহিষমর্দিনী গুহাটা দেখব। তোমরা পাহাড়ের অন্য প্রান্তে গিয়ে
নম্বরের বরাহ গুহা দেখে এস।

আমি জিজ্ঞাসা করলুমঃ এক নম্বর বরাহ গুহায় দেখবার কী আছে

মামা বললেনঃ এই গুহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূর্তি হল প
রাজাদের। একটি চিত্রে দুদিকে দুই দণ্ডায়মান রাণীকে নিয়ে বসে আছে
সিংহবিষ্ণু। অপরটিতে মহেন্দ্র বর্মন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এক পাশে
দুই রাণী।

দুতিন তলা বাড়ির সমান উঁচু পাহাড়। অনায়াসে আমরা মহি
মর্দিনী গুহায় পৌঁছে গেলুম। এই গুহাতেই মহিষমর্দিনীর সেই বিখ্যা
চিত্র, দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ। যুদ্ধের এমন জীবন্ত চিত্র আমি অ
কোথাও দেখি নি। পাথর যে কথা কইতে পারে এই প্রথম দেখছি
এক ধারের দেওয়ালে এই চিত্র, অন্য ধারে আর একটি সুন্দর চিত্র-

অনন্ত শয়নে বিষ্ণু। এ সব চিত্রে একটি ছুটি মূর্তি নয়, অনেক মূর্তি আছে। সেই সব মূর্তি দেখে চিনতে হলে সময়ের দরকার। কিন্তু কারও হাতেই সময় নেই বলে এক নজরে দেখেই ছুটতে হয়।

অনেকে পয়সা দিয়ে লাইট হাউসের উপরে ওঠে, চারি দিকের দৃশ্য দেখবে। কেউ যায় পুরনো লাইট হাউসে ওলক্কনাথ শিবের মন্দিরে। মামীর হয়তো সেখানে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু মামা কোন দিকে না চেয়ে নিচে নামার পথ ধরলেন। মহাবলীপুরমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অর্জুনের তপস্যা এখনও দেখা হয় নি, অথচ আকাশের সূর্য হেলেছে পশ্চিমের দিকে।

পাহাড় থেকে নেমে একটি ছায়াশীতল নির্জন পথ ধরে আমরা একটি মোড়ে এসে পৌঁছলুম। চারি দিকে চেয়েই বুঝতে পারলুম যে আমরা প্রায় চেনা জায়গায় এসে গেছি। এখান থেকে পূর্ব মুখে গেলে আমাদের পরিচিত চৌরাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে শোর টেম্পলে পৌঁছে যাব। আব সোজা গেলে পাব অর্জুনের তপস্যা।

পাহাড়ের গায়ে কৃষ্ণমণ্ডপ আব পঞ্চপাণ্ডব মণ্ডপ দেখে আমরা অর্জুনেব তপস্যার সামনে পৌঁছলুম। কৃষ্ণমণ্ডপের গার্হস্থ্য চিত্র দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু অর্জুনের তপস্যা দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে আমবা অভিভূত হযে গেলুম। কী বিরাট, কী চমৎকার, কী অভাবনীয় সৃষ্টি। পৃথিবীর আর কোথাও এমন শিল্পসৃষ্টি আছে বলে শুনি নি। এ আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। যে পাহাড় থেকে আমরা নেমে এসেছি, সেই পাহাড়েরই এক অংশে এই অর্জুনের তপস্যা। এ কোনও মূর্তি নয়, এ একখানা বিরাট চিত্র পাথরে খোদাই করা আছে। সমস্ত পাহাড় জুড়ে এই চিত্র। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কত মূর্তি কতভাবে চিত্রিত আছে, তার হিসাব নেই। বড় বড় হাতিগুলিই প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে দেব মূর্তি, ঋষি বসেছেন পূজায়। অনেকগুলি গন্ধর্ব ও নাগমূর্তি পশু পাখি আর ঊর্ধ্ববাহু এক তপস্বী এক পায়ে তপস্যারত। যাঁরা অনেকক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, উনি ঋষি নন, উনিই অর্জুন। এক পা তুলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে অর্জুন তপস্যা করছেন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্যে।

মামা বললেন : কোন বিশেষত্ব দেখছি নে তো অর্জুনের। অন্য সব মূর্তির সঙ্গে দিব্যি মিশে গেছে।

সূর্য তখন পিছনের পাহাড়ে আড়াল হয়ে গেছে। তাই ছবি তোলার আর অসুবিধা নেই। স্বাতি একখানা ছবি নেবার চেষ্টা করছিল, বলল : সকাল বেলায় এর ওপরে সূর্যের আলো পড়লে আরও অপরূপ দেখাবে সব কিছু, ছবিও অনেক সুন্দর হবে।

পথের উপর থেকে স্বাতি একখানা ছবি নিল, তারপর ধাপে ধাপে নিচে নেমে আর এক খানা ছবি নিতে চাইছিল। কিন্তু মামা তাকে বাধা দিলেন. বললেন : না না, নিচে নামতে হবে না।

এখান থেকে আমরা আর একটুখানি এগিয়ে গণেশ রথ দেখতে পেলুম। মামা বললেন : কেমন, তোমবা এইরকম রথই তো দেখতে গিয়েছিলে ?

স্বাতি বলল : সেখানে এক একটা রথ এক এক রকম। এ রথটা কতকটা নকুল-সহদেব রথের মতন, তাই না গোপালদা ?

বললুম : কিছু বড, আর কিছু অন্য রকম।

মামা বললেন : বুঝতে পেরেছি।

যাত্রীরা এই রথের পাশ দিয়েই দু নম্বর বরাহগুহা দেখতে যাচ্ছিল। তাই দেখে মামা বললেন : তোমবাও দেখে এস, আমরা বাসের দিকে এগোচ্ছি।

দেরি না করে আমরা পাহাড়ের পথ ধরে উপরে উঠে গেলুম। পশ্চিম-মুখো গুহা, সূর্যের আলো পড়েছে তার উপরে। স্বাতিকে বললুম : ভাল ছবি হবে এইখানে।

দুধারে দুটি সুন্দর চিত্র—একটি গজলক্ষ্মীর মূর্তি, অপরটি বরাহ অবতারের পৃথিবী উদ্ধার। কিন্তু স্বাতি সন্তুষ্ট হল না, বলল : ছায় পড়েছে, ছবি ভাল হবে না।

ফেরার পথে যাত্রীদের কাছেই শুনলুম যে দেখবার জায়গা এখানে আরও অনেক আছে। সে সব দূরে দূরে। কৃষ্ণের বাটার বল নামে একটি বিরাট পাথর আছে, মাখনের বলের মতো গোলাকার সেটি

দেখলেই মনে হয় যে তা গড়িয়ে পড়বে। বামন অবতারের ছবিও আমরা দেখতে পাই নি, আর দেখি নি ভীম অবতার নামে একটি চিত্র। এ সব দেখতে হলে বিকালের বাসে ফেরা সম্ভব নয়। রাতে থাকতে হয় এখানে। তার জন্যে ট্রাভলার্স বাঙলো আছে।

বাস স্ট্যাণ্ডে ফেরার পথে একটা জাদুঘরের কথাও শুনলুম। অর্জুনের তপস্যার সামনে একটা ঘেরা জায়গায় নাকি অনেক মূর্তি সংগ্রহ করা আছে, তার দরজা এখন বন্ধ। একজন বললেন যে এখানে একটা স্কুলও আছে, সেখানে স্থাপত্য বিদ্যা শেখানো হয়।

এই সব পুরনো জিনিসের মধ্যে আমরা একটি নূতন মন্দির দেখতে পেলুম। বিষ্ণুর মন্দির, নাম স্থলশয়ন পেরুমল। ধার্মিক যাত্রীরা নাকি সমুদ্রে স্নান করে এই মন্দিরে পূজার্চনা করেন। স্বাতি বলল: শুধু পূজার্চনা! পিকনিক করতে কেউ আসে না!

আমি বললুম: দেখলুম না তো কাউকে!

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: বাঙলা দেশে এমন একটা জায়গা নেই।

বাসের কাছে ফিরে এসে মামা মামীকে দেখতে পেলুম না। কোন চা কফির দোকানেও দেখলুম না তাঁদের। স্বাতি বলল ঃ পথ হারালেন নাকি!

বললুম ঃ এতটুকু জায়গায় পথ হারাবেন কী করে!

ঠিক এই সময়েই তাঁদের দেখতে পেলুম। তাঁরা স্থলশয়ন পেরুমল মন্দিরের দিক থেকে আসছিলেন। আমাদের দেখে তাঁরাও আশ্বস্ত হলেন। কাছে এসে মামা বললেন ঃ বাস কখন্ ছাড়বে জান তো?

বললুম ঃ জানি নে।

তবে?

চারটের আগে ছাড়বে বলে মনে হয় না। বাসের কোনও যাত্রী এখনও ফেরেন নি।

স্বাতি বলল ঃ চায়ের দোকানে দেখেছি অনেককে।

মামা বললেন ঃ তবে আমরাও এক এক ভাঁড় খেয়ে নিই, কী বল?

বলে মামীর দিকে তাকালেন।

মামী বললেন ঃ এখানে না খেলে গাড়িতে উঠে আর কী পাবে!

একটা পরিচ্ছন্ন দোকানে আমরা ঢুকলুম। বেশ ভিড় হয়েছে এই সব দোকানে। আমরা একটুখানি জায়গা খুঁজে নিয়ে বসলুম। মামা চায়ের অর্ডার দিলেন, আর মামী বললেন কিছু খাবারও চাই। খাবার মানে বড়া আর পকৌড়া। পকৌড়াকে এখানে কী বলে জানি নে।

চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার নানা কথা মনে এল। মহাবলীপুরমেরই কথা। একদিন পল্লবরাজাদের বড় বন্দর ছিল এই-খানে, অথচ আজ তার কোন চিহ্ন নেই। রাজপ্রাসাদ, সরকারী দপ্তর বণিকদের গৃহ বিপণি কিছুই এখানে নেই। মহাবলীপুরম আজ একটা নগণ্য গ্রাম। এই গ্রামের লোকেরা এখন ক্ষেত চাষ করে আর মাছ ধরে

কোন রকমে জীবিকা অর্জন করে। বন্দরের সব সমৃদ্ধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যা আছে তা এ দেশের অতুলনীয় শিল্প সম্পদ। শত শতাব্দীর ঝড় জলেও এ সব এতটুকু মলিন হয় নি। জগতের অনেক কিছু জানি নে বলে মনে আমার দুঃখ আছে, আজ এক নতুন দুঃখ দেখা দিল নতুন ভাবে। মনে হল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো পাশ না করে আর্ট স্কুলে পড়লে আজকের এই দেখা আমার সার্থক হত।

স্বাতিও বোধহয় এইরকমই কিছু ভাবছিল। বলল ঃ আর্ট সম্বন্ধে কিছু পড়েছ গোপালদা ?

বললুম ঃ সেই দুঃখই তো আজ হচ্ছে। অনেকদিন আগে অবন ঠাকুরের লেখা পড়েছিলুম একটা। তাতে সমভঙ্গ আভঙ্গ ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ মূর্তির কথা পড়েছি। দেখেছি মুখম্ বর্তুলাকারম্ কুক্কুটাণ্ডাকৃতি, ললাটম্ ধনুষাকারম্, ভ্রূযুগম্ নিম্বপত্রাকৃতিঃ ধনুষাকৃতির্বা। নানা রকমের চোখ দেখেছি—সফরীনয়ন খঞ্জননয়ন হরিণ নয়ন কমল নয়ন ও পদ্মপলাশ-লোচন। দেখেছি গ্রন্থলকারবৎ শ্রবণ, তিলপুষ্পাকৃতির্নাসাপুটম্ নিষ্পাপ-বীজবৎ, অধরম্ বিম্বফলম্, চিবুকম্ আম্রবীজম্, কণ্ঠম্ শঙ্খসমাযুতম্। দেখেছি গোমুখাকারম্ কাণ্ড, গজশুণ্ডাকৃতি স্কন্ধ, কর্কটাকৃতি জানু, মৎস্যাকৃতি জঙ্ঘা আর কদলীকাণ্ডের মতো উরু। শিম্বীফলের মতো অঙ্গুলি আর কর ও পদপল্লবমুদারম্। শিখেছি নরমূর্তির মাপ দশতাল, ক্রুরমূর্তি দ্বাদশ তাল, আসুর মূর্তি ষোড়শ তাল, বালা মূর্তি পঞ্চতাল আর কুমার মূর্তি ষট্‌তাল। এও জানি যে শিল্পীর নিজের তিন মুঠিতে হয় এক তাল। কিন্তু এখানে আমার সব তালমান তলিয়ে যাচ্ছে। মনে হয়েছে যে অবন ঠাকুরের গোটা ব্যাকরণের সমস্ত উদাহরণ লেখা আছে একটি পাহাড়ের গায়ে, সেই অর্জুনের তপস্যায়।

মামা বললেন ঃ গোপাল, আমাদের ঋষিরা যখন বেদগান করতেন, পাণিনির তখন জন্ম হয় নি। অনুষ্টুপ মন্দাক্রান্তা শার্দুলবিক্রীড়িত—ছন্দের এ সব নাম তো আমাদেরই দেওয়া। তোমার ব্যাকরণ ছেড়ে চোখ জুড়িয়ে সব দেখে নাও।

সত্যিই তাই। বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে হৃদয় দিয়ে দেখতে হয় সুন্দরকে।

আমাদের চা এসেছিল টেবিলে, খাবারও এসেছিল। খেতে খেতে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : রবীন্দ্রনাথ কি এখানে আসেন নি গোপালদা ?

বললুম : পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন জানি, কিন্তু মহাবলীপুরমের কথা বোধহয় পড়ি নি।

স্বাতি বলল : বাঙলার কোনও কবি বোধহয় এখানে আসেন নি।

এলে নিশ্চয়ই কিছু লিখতেন।

সার সি. ভি. রমণ কী বলেছেন জান ?

বললুম : জানি না।

এখানে এলে অত্যন্ত স্থূল মনের লোকেরাও কবি হয়ে ওঠে।

আমি হেসে বললুম : তিনি নিজেই তার প্রমাণ। যে শিল্পকলা এ যুগের বৈজ্ঞানিককে মুগ্ধ করতে পারে, সেই তো সত্যকার শিল্প।

মামা তাড়া দিয়ে বললেন : খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। বাস ছেড়ে গেলে বিপদে পড়তে হবে।

আমরা আর দেরি করলুম না। চা শেষ করে উঠে পড়লুম।

যথাসময়ে আমাদের বাস ছাড়ল। এবারে আর চিঙ্গলপুট হয়ে ফেরা নয়। এবারে আমরা সোজা উত্তরে যাব নুতন পথে। সমুদ্রের ধারে ধারে এই পথ, কিন্তু সমুদ্র দেখা যায় না। এই পথে মাদ্রাজ মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল।

দিনের আলো তখন নিবে এসেছে, অথচ অন্ধকার নামে নি। পরম তৃপ্তিতে সবার মন প্রসন্ন। মামাকেও বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : একটা কথা আমার কাছে ধাঁধার মতো রয়ে গেল। আজ যা কিছু দেখলুম, এ সব কেন তৈরি হয়েছিল বলতে পার ?

কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। কিন্তু স্বাতি পিছন ফিরে বলল : আমি জানি।

আশ্চর্য হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

সহাস্যে স্বাতি বলল : পুরাকালে আর্কিটেক্চার শেখাবার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এইখানে। তাই নয় গোপালদা ?

তার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। এমন অদ্ভুত কথা এর আগে আমি শুনি নি। ভারতীয় স্থাপত্যকলার একখানা ইংরেজী বইএ আমি পল্লব যুগের মহেন্দ্র মামল্ল ও রাজসিংহ স্টাইলের কথা পড়েছিলুম। প্রথম মহেন্দ্র বর্মন জৈন ছিলেন। ত্রিচিনপল্লী জেলার সিত্তন্নভাসল গুহা-মন্দিরে তাঁর শ্রেষ্ঠ রঙের কাজের নমুনা আছে। পরবর্তী জীবনে অপ্পার মুনিব কাছে শৈব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিনি অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাঁর রাজ্যের চিঙ্গলপুট আর উত্তর আর্কট জেলায়। ত্রিচিনপল্লীর পর্বত-মন্দিরটিও তাঁরই কীর্তি ঘোষণা করছে। গঙ্গা ধারা নামে একটি পাথরের চিত্র আজও যাত্রীদের মুগ্ধ করে। মহেন্দ্র বর্মন শুধু রাজা ছিলেন না, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে অনুরাগও তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, ছিলেন কবি ও নাট্যকার। একখানা শিলালিপিতে তাঁকে ক্ষ্যাপা রাজা বলা হয়েছে। তার কারণ ইট কাঠ চুন সুরকির প্রচলিত পদ্ধতি ছেড়ে তিনি মন্দির নির্মাণ করেছেন এক একটা জীবন্ত পাহাড় চেঁচে কুঁদে।

প্রথম নরসিংহ বর্মন তাঁর পুত্র। মামল্ল বা বীর উপাধি নিয়েছিলেন ইনি। এঁরই নামে মামল্লপুর। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়ে রাজ্যের অনেকটা অংশ হারিয়েছিলেন এঁর পিতা। আর ইনি সেই দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে চালুক্যদের রাজধানী লুণ্ঠন করেন। তাঁকে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন সিংহলের পলাতক রাজা মান বর্মন। মান বর্মনকেও তিনি তাঁর হৃত রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। এই মামল্লপুরের বন্দর থেকেই তাঁর বিশাল নৌবহর সিংহলের দিকে যাত্রা করেছিল। ইতিহাসে এই নরসিংহ বর্মন ভারতের তিনজন শ্রেষ্ঠ রাজার অন্যতম। হর্ষবর্ধন দ্বিতীয় পুলকেশী ও প্রথম নর-সিংহ বর্মন। একই সময়ে এই তিনজন রাজা রাজত্ব করেছেন ভারতবর্ষে, সপ্তম শতাব্দীর গৌরব ছিলেন তাঁরা।

দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মনের নাম ছিল রাজসিংহ। রঙ্গপতাকা তাঁর মহিষী। কাঞ্চীর কৈলাস নাথ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এঁরাই। সেখানকার বৈকুণ্ঠ পেরুমল ও অন্যান্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাঁর পরবর্তী রাজা

নন্দী বর্মন,। এঁর পরে পল্লবদের রাজত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। নবম শতাব্দীতে চোলরা প্রবল হয়ে পল্লব রাজ্য অধিকার করেছিল অক্লেশে।

কিন্তু এ ইতিহাসের কথা। স্থাপত্যের কথা নয়। স্থাপত্যের কথা আমার সামান্যই মনে আছে। শুধু এইটুকু মনে আছে যে মহেন্দ্র শৈলীর স্তম্ভগুলি অত্যন্ত স্থূল ও ভারী। মামল্ল শৈলীতে তা সরু ও কারুকার্যময় হয়েছে। প্রথমে সবল ছিল, পরে দেখা দিল সিংহের মূর্তি, থাবা পেতে বসে আছে। আরও অলঙ্কৃত হল রাজসিংহ শৈলীতে, সিংহ থাবা উঁচু করে দাঁড়াল। শুধু স্তম্ভে নয়, সর্বত্র এই বিবর্তন হয়েছে।

রাজসিংহের সময় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল ইট পাথর দিয়ে মন্দির তৈরির আরম্ভ। পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের রীতি একরকম উঠেই গেল।

স্বাতি আমাকে নীরব থাকতে দেখে বলে উঠল ঃ গোপালদা যে উত্তর দিলে না? মানলে না বুঝি আমার কথা?

স্বাতির কথা আমার মনে পড়ে গেল। তার ধারণা যে স্থাপত্যবিদ্যা শেখাবার বিদ্যালয় ছিল মহাবলীপুরমে। এ কথা মেনে নেওয়া মুস্কিল, আবার প্রতিবাদ করবার মতো যুক্তিও নেই আমার কাছে। বললুম ঃ অসম্ভব নয়।

স্বাতি আমাকে অব্যাহতি দিলে না। বলল ঃ আর কী সম্ভব হতে পারে? যে রথ ও গুহাগুলি দেখলাম, সে সব তো মন্দির নয়, কারও বাসস্থানও নয়। মন্দির ছিল শোর টেম্পল। কিন্তু রথগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় নি। অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দিরে শুনেছি চৈত্য ও বিহার ছিল। ভিক্ষুরা বাস করত সেখানে, আর উপাসনা করত। কিন্তু এখানকার ছোট ছোট রথ আর গুহায় তো তা সম্ভব নয়!

স্বাতির উৎসাহ দেখে আমি হাসলুম, বললুম ঃ পল্লব রাজাদের খেয়াল খুশিতেও হতে পারে, স্থাপত্য নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে শিল্পীরা।

অসম্ভব।

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম ঃ তাহলে কোন স্কুলই ছিল। মন্দির

নির্মাণের প্রবল শখ ছিল তো পল্লব রাজাদের! এইখানে ট্রেনিং দিয়ে নতুন নতুন স্থপতি পাঠাত চারি দিকে।

ঠাট্টা করছ!

ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাকে।

কেন?

ভ্রমণে বেরিয়ে শুধু তো চোখ দিয়ে দেখা নয়, দেখতে হয় মন দিয়েও। মনের এই কৌতূহলই ভ্রমণকে সার্থক করে, ভ্রমণেব আনন্দ হয় তাৎপর্যময়।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন ঃ ভাববার মতো কথা।

৮

সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হবার পরে আমরা মাদ্রাজে পৌঁছলুম। পথে একটা জায়গায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য বাস দাঁড়িয়েছিল। জন কয়েক যাত্রী নেমে পড়েছিল বাস থেকে। তারা ফিরে আসবার পরে বাস ছেড়েছিল।

বাসে বসেই আমরা মন্দির আর তার গোপুর দেখতে পেয়েছিলুম। যাত্রীদের কাছে জানলুম যে এ জায়গার নাম তিরুপোয়ারুর, শিবের মন্দিব আছে এখানে। উত্তর ভারতে যেমন নগরকে বলে পুর, এদেশে তেমনি ছোট শহরকে বলে ভুর। শেষের দিকে উর থাকলেই বুঝতে হবে যে তাতে ছোট শহর বোঝাচ্ছে।

রাতে আমরা এগমোর স্টেশনের সামনেই একটা হোটেলে খেয়েছিলুম। ভাল খাবাব, খেয়ে তৃপ্তি হয়েছিল খুব। তারপরে নিশ্চিন্ত আরামে আমরা ঘুমিয়েছিলুম।

অন্ধকার থাকতেই আমার ঘুম ভাঙল। বিছানায় এ পাশ ও পাশ করে বাকি সময়টুকু কাটাতে ইচ্ছা হল না। খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। তারপরে ভেজিয়ে দিলুম দরজা। আমার পদক্ষেপে মামার ঘুম ভাঙল না।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে খোলা ছাদে এসে দেখলুম যে আকাশে তখন রঙ লেগেছে, জ্যোতির্ময়ের উদয় ঘোষণা হয়েছে পূর্বাকাশে। রাতে বোধহয় এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, জল জমে আছে দুএকজায়গায়। কী ভদ্র এদিকের বৃষ্টি! কখন মেঘ করেছে, আর বৃষ্টি হয়েছে কখন, তা জানতেই পারি নি। এই পরিবেশটি আমার ভারি ভাল লাগল। অন্ধকার নেই, রোদও নেই, অথচ আলো আছে। এই আলো কৃত্রিম নয় রাতের

আলোর মতো, আবার দিনের আলোর মতো তীব্রও নয়। এই আলোর মন প্রসন্ন হয়, হাতছানি দেয় এগিয়ে যাবার জন্যে। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নিচে নেমে পড়লুম।

আজ আমাদের ট্রেন ধরতে হবে না, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বাস ধরবারও দরকার নেই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি বাঁ দিকের পথ ধরলুম। এই পথ গেছে কয়ুম নদীর ধারে। বাঁয়ে রেলের পুল, রেল লাইনের উপর দিয়ে পথ। আর ডাইনে নদীর পুল, নিচ দিয়ে সরু নদী এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে। সর্পিল গতিতে এই কয়ুম নদী পশ্চিম থেকে পূর্বে মাদ্রাজ শহরটাকে বিভক্ত করেছে। সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছাকাছি এসে দুভাগে ভাগ হয়েছে। আবার তারা মিলিত হয়েছে সমুদ্রে পড়বার আগে আয়রন ব্রিজের পূর্বে। এই নদীর উপরে গোটা দশেক পুল আছে। তাছাড়া বাকিংহাম খালেব উপরেও আছে অসংখ্য পুল। শহরের ভিতর দিয়ে এই খালও প্রবাহিত হয়েছে নদীর মতো এঁকে বেঁকে। উত্তরে বিজয়ওয়াডায় কৃষ্ণা নদী থেকে বেরিয়েছে এই খাল, দক্ষিণে কত দূর গেছে জানি নে। মাদ্রাজ শহরের একটা মানচিত্রে দেখেছি যে এই খাল সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে কয়ুমের শাখার সঙ্গে মিলেছে। তারপর আয়রন ব্রিজের কাছ থেকে বেরিয়ে সাউথ বীচ রোডের পাশে পাশে সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে মায়লাপুরের ভিতর দিয়ে গিয়ে অ্যাডিয়ার নদীতে পড়েছে। সেখান থেকে আবার বেরিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। শৈশবে ভূগোলের বইএ এই বাকিংহাম খালের কথা পড়েছিলুম। আড়াইশো মাইল লম্বা এই খাল একটা ছোট নদীর মতো। দক্ষিণে এর দানের শেষ নেই।

পুলের উপরে দাঁড়িয়ে আমি নদীর স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করছিলুম। চমকে উঠলুম স্বাতির হাসির শব্দ শুনে। আমার চমকানি দেখে স্বাতি বলল ঃ ভয় পেয়েছ তো ?

সামলে নিয়ে বললুম ঃ পেয়েছি।

কেন ?

মনে হয়েছিল কোন পেত্নী পেছু নিয়েছে।

স্বাতি কটমট করে তাকাল আমার মুখের দিকে। তাই দেখে হেসে বললুম ঃ তোমাকে দেখে ভয় গেল।

স্বাতিও হাসল, বলল ঃ আজ ভোর বেলাতেই ঘুম ভেঙে গেল। মা তখনও ঘুমচ্ছিলেন। কলকাতায় হলে আমি শুয়ে থাকতাম, কিন্তু এখানে উঠে পড়তে ইচ্ছে হল। অন্ধকারে পা টিপে দরজা খুলে ছাদে এসে দেখি যে তুমি রাস্তা দিয়ে চলেছ চটি ফটর ফটর করে। ভাবলাম, পেছু নিয়ে তোমাকে খুব চমকে দেব।

ভাল লাগল তার এই ছেলেমানুষিটুকু, বললুম ঃ সত্যিই চমকে দিয়েছ।

স্বাতি খুশী হল আমার উত্তর শুনে। কিন্তু আমার ভাবনা হল পরিণামের। ঘুম ভাঙলে মামা মামী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যস্ত হবেন। বললুম ঃ আমি চমকালে তো ক্ষতি নেই, কিন্তু মামীমা চমকালেই মুস্কিল।

স্বাতি বলল ঃ মা তাঁর মেয়েকে ভাল চেনেন। ভাববেন যে ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে শহর দেখতে বেরিয়েছে।

আর মামাবাবু কী ভাববেন ?

বাবা !

পরম তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাল স্বাতি, বলল ঃ আমি না ডাকলে বাবার ঘুমই ভাঙবে না।

নদীর জলে সকালের আলো সহসা ঝিকমিক করে উঠল। তাই দেখে আমি বললুম ঃ এবারে ফেরা যাক।

স্বাতি বলল ঃ ফেরার তাড়া কিসের !

তাড়া তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে।

কেন ?

আমি তোমার অপরাধের ভাগী হতে চাই নে।

ভয় !

ভয় নয়, সৌজন্য।

স্বাতি হেসে উঠল, বলল ঃ আরও বড় কি যে বল নি, এই আমার ভাগ্য।

তারপরেই সান্ত্বনা দিল আমাকে, বলল ঃ বেশি ভয় করলে তুমি আগে ফিরো। বোলো, জানি না তো স্বাতি কোথায় গেছে! আর যদি মিথ্যে কথা বলতে মুখে বাধে তো তুমিই পরে ফিরো। আমি বলব, গোপালদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম, একসঙ্গে ফিরতে ভয় পেয়েছে।

বলে হাসতে লাগল।

আমি বললুম ঃ তোমার কি কোনও ভয় নেই?

ভয়! খুব ভয় আছে। ভূতের ভয়, বাঘের ভয়—

মানুষের ভয়?

তাও আছে। ডাকাতের ভয়, গুণ্ডার ভয়—

ভদ্রলোকের?

আছে বৈকি। ন্যাকার ভয়, নায়কের ভয়—

বললুম ঃ বুঝেছি। আমাকে তোমার ভয় নেই জেনে খুশী হলাম। ন্যাকা ও নায়কের কোনও পার্টই আমি করব না।

স্বাতিকে সহসা বড় অন্যমনস্ক দেখাল। মনে হল যে সে এখন অন্য কোন কথা ভাবছে গভীর ভাবে। খানিক ক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে আমি বললুম ঃ কী ভাবছ বল তো?

আমি!

বলে স্বাতি মুখ তুলে তাকাল। বলল ঃ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

আমার কথা!

আমি আশ্চর্য হলুম অপরিমিত।

অন্যমনস্ক ভাবে স্বাতি বলল ঃ কাল রাতে তোমার কথা বার বার মনে হচ্ছিল। এক কথায় তুমি আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলে, কাউকে খবর দিলে না, চিঠিও লিখলে না কাউকে। দেশে কি তোমার কেউ নেই? কেউ কি তোমার জন্যে ভাবছে না?

কেন জানি না, আমার রোমাঞ্চ হল তার এই ভাবনার কথা জেনে। প্রসন্ন মনে বললুম ঃ দিনে দিনে মানুষ এমন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে যে সবাইকে ভাবাতে আমার ভাল লাগে। সেই জন্যেই কাউকে খবর দিই নি। কিন্তু তুমি এ কথা জানলে কী করে?

স্বাতি বলল ঃ তোমাকে চিঠি লিখতে তো দেখি নি।

বললুম ঃ এইবারে লিখব।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল না কাকে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে আমি এ
প্রশ্ন দেখলুম। বললুম ঃ হারানিধির সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আত্মীয়ের পর্যা
উঠেছে। তাকেই একটা খবর দিতে হবে।

হারানিধি কে ?

সে আমার হোটেলের মালিক, আমি তার বাঁধা খদ্দের। আগে ৎ
পয়সার সম্বন্ধ ছিল, এখন আমার সব চেয়ে নিকট আত্মীয়। সেই আম
জন্যে সত্যিকার ভাবনা ভাবছে। ভাবছে, লোকটা গেল কোথা
উত্তরপাড়া থেকে তারকেশ্বর যেতে হলে যে লোক কয়েক হপ্তা পরা
করে চায়ের পেয়ালা হাতে, সে লোক এমন নিঃশব্দে কোথায় কেটে পড়
কোন দুর্বল মুহূর্তে দুর্ভাবনাও হয়তো ভেবেছে। কলকাতা শহরে গা
চাপা পড়ে নি তো লোকটা ! যা হয়েছে দেশ কাল !

স্বাতির বিস্ময় দেখে আমি বললুম ঃ হারানিধির চেয়েও বেশি ভা
আর একজন।

কে ?

আমার বাড়িওয়ালা। ভারি কঞ্জুষ বুড়ো। পয়লা তারিখ রা
তার বাড়ি ভাড়া চাই। ঐ কটা টাকা না পেলে যেন তার পরিবার
উপোস করতে হবে। অথচ একটি পয়সাও খরচ করবে না, সকাল দশট
জমা দিয়ে আসবে পোস্ট অফিসে। আমি জানি, সে বুড়ো রোজ যা
হারানিধির দোকানে খোঁজ নিতে, পুজোর আগেই পালিয়েছে ব
আপশোষ করছে তার কাছে। কী বলে আমাকে জানো ?

না।

বলে যে ঘর সংসার নেই বলেই আমি নাকি বে-আক্কেলে। হ
হারানিধি এই কথা শুনলে তাকে বিনি পয়সায় চা খাওয়ায়। ব
তোমার বাড়ি ভাড়া মারতে পারে, এমন লোকও তাহলে উতোরপা
আছে !

কিন্তু স্বাতি আমার কথায় কৌতুক বোধ করল না, নিঃশব্দে তা

রইল আমার মুখের দিকে। আমি খানিকটা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললুম ঃ সত্যিকার ভাবনা যে ভাবছে, তার কথা তোমাকে বলি নি।

স্বাতি হয়তো ভাবল যে মায়ের নাম করব, কিম্বা পিসির। কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের ধরে রাখবার দায়িত্ব তো আমার উপরে ছিল না। তাই নিজের ইচ্ছায় তাঁরা যখন চলে গেলেন, তখন আমাকে কেউ দায়ী করে নি। বললুম ঃ আমাদের লাইব্রেরিয়ান আমাকে সত্যিই ভালবাসেন, বোধহয় নিজের ছায়াও দেখেন আমার ওপরে। ভদ্রলোক সারাক্ষণ ভাবেন, বই দেবার সময়েও ভাবেন। শ্রীঅরবিন্দের লেখা 'মা' দিতে মায়ের 'পুরনো লেখা' দেন। নিখিলকে বই দিয়ে পরিতোষের নামে লিখে রাখেন। তবু লাইব্রেরি চলে। কেননা, সকলেই বই ফেরৎ দিয়ে বই নেয়। একদিন অফিস ফেরৎ বেলুড়ে নেমেছিলুম মঠের একটা উৎসবে বক্তৃতা শুনতে। পরদিন ভদ্রলোককে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল আগের দিনের অনুপস্থিতিব জন্যে। সেদিন তাঁকে তাড়া দিয়ে কাউকে লাইব্রেরি থেকে বার করতে হয় নি।

বলে আমি হেসে উঠলুম।

স্বাতিও হাসল আমার সঙ্গে সুব মিলিয়ে। কিন্তু বড় বিষণ্ণ সেই হাসি। মনে হল, এই হাসি দিয়ে সে তাব কান্না লুকোবার চেষ্টা করল। বলল ঃ ফিরবে না?

বললুম ঃ ফিরব বৈকি।

ফেরার সময় স্বাতি একটা গলির ভিতরে ঢুকে পড়ল। বলল ঃ বেনারসের গলি দেখেছ গোপালদা?

বললুম ঃ না।

স্বাতি বলল ঃ এ গলি ঠিক সে গলির মতো নয়। বেনারসের গলি একেবারে গোলকধাঁধা। সেখানে আমার রোজ পথ ভুল হত।

সদর রাস্তায় পথ ভুল হলেও মেয়েদের দোষ হয় না।

কিন্তু স্বাতি এ কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেল না। তার মনোযোগ তখন অন্য খানে স্থির হয়েছিল। একখানা একতলা বাড়ির গিন্নী তাঁর বাইরের দরজার সামনে আলপনা দিচ্ছিলেন। জায়গা জলে মুছে চালের

গুঁড়োর উপরে বোধহয় হলুদ সিঁদুর দিয়ে আলপনা। স্বাতি বলল: বোধহয় কোন অনুষ্ঠান আছে বাড়িতে।

বললুম: তাই হবে।

পরে শুনেছিলুম যে এ অনুষ্ঠান তাদের নিত্যকার! অতিথির মঙ্গল কামনায় তারা প্রত্যহ এমনি আলপনা দেয়। বড়লোকের গিন্নীরা না দিলে বউ ঝিয়েরা দেয়। পৌষ মাসে নাকি ছোট বড় সবাই এমনি আলপনা দেয়।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটবার পরে আমরা বড় রাস্তায় এসে পৌঁছলুম। বাঁ হাতেই এগমোর স্টেশন। কলরবে স্টেশন তখন জেগে উঠেছে। বোধহয় কোন ভাল ট্রেন এসেছে। ঘুমন্ত ট্যাক্সিগুলো এখন যাত্রীদেব নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

আমরা উপরে উঠে গেলুম।

মামার নাক তখনও ডাকছে, আর মামী গেছেন স্নানের ঘরে।

৯

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই মামী স্বাতির অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ তলব করলেন। স্বাতি বলল: আজকের সকালটি কী সুন্দর দেখ নি তো! শীতের মনসুন নেমেছে এ দেশে। বৃষ্টি নেই, রোদও নেই। বেশ ভাল লাগবে বেড়াতে।

দক্ষিণ ভারতে দুবার বর্ষা হয়। বর্ষার বর্ষণ শেষ হয়ে শীতের বর্ষণ শুরু হয়েছে দিনকতক থেকে। খবরের কাগজে এই কথা পড়েছি। মামা তখন একখানা আরাম চৌকিতে বসে পাইপ ধরিয়েছিলেন। বললেন: বাঙলার মতো বেয়াড়া বর্ষা না হলেই বাঁচি।

এই সময় আমাদের চা এল। সেই চা তৈরি করতে বসে স্বাতি বলল: আজ সকাল সকাল আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। শুনেছি খুব বড় শহর এই মাদ্রাজ।

আমি বললুম: তোমার গাইড বইখানায় দেখেছ তো, পঞ্চাশ বর্গ মাইল এর আয়তন।

মামা সোজা হয়ে বসলেন, বললেন: বল কি গোপাল, এক দিনে তাহলে কী দেখা হবে!

মামী বললেন: এক দিনে দেখবার দরকার কী!

মামা বললেন: কেন, রামেশ্বর কন্যাকুমারী দেখবে না নাকি!

মামী বললেন: তোমরা কি আর রামেশ্বর দর্শনে বেরিয়েছ!

বুঝতে কষ্ট হল না যে এ তাঁর ক্ষোভের কথা। কলকাতা থেকে তিনি রামেশ্বরের নাম করেই বেরিয়েছেন। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে নানা স্থানে গিয়ে, কিন্তু রামেশ্বরের দিকে আমরা এগোতে পারছি না। মামাও বুঝেছিলেন মামীর দুঃখ, বললেন: আজ রাতের ট্রেনেই আমরা রামেশ্বর যাত্রা করব।

স্বাতি করুণভাবে তাকাল আমার দিকে, আর আমি বললুম ঃ সেই ভাল। আজ রাতের গাড়িতেই আমরা বার্থ রিজার্ভ করে বেড়াতে বেরোব।

স্বাতি বলল ঃ এক দিনেই সব দেখা হয়ে যাবে ভাবছ !

আমি বললুম ঃ হতেই হবে।

মামা খুশী হলেন কিনা জানি না, মামী খুশী হয়েছেন দেখতে পেলুম। বললেন ঃ চা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। কত আর সময় লাগবে !

গোটা শহরটা দেখতে কত সময় লাগবে জানি নে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একজন বিদেশীর একটা কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন যে মাদ্রাজ এমন একটি শহর যে এক দিকে ছমাইল যাওয়া যায় লাঞ্চের জন্যে, আর চায়ের জন্যে উল্টো দিকে সাত মাইল যাওয়া যায়। কিন্তু আমি এ কথা বললুম না।

এক পেয়ালা চা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বাতি বলল ঃ রামায়ণ মহাভারতে মাদ্রাজের নাম নেই গোপালদা ?

আমি জানি, এ স্বাতির পরিহাস। তবু উত্তর দিলুম সহজ ভাবে। বললুম ঃ রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যার নাম আছে, কিন্তু মহাভারতে আছে মদ্র বা মদ্রদেশের কথা। মদ্রদেশের রাজকন্যা মাদ্রী ছিলেন পাণ্ডুর ছোট রাণী, নকুল ও সহদেবের মা।

মামা বললেন ঃ এই মাদ্রাজই মহাভারতের মদ্রদেশ নাকি !

বললুম ঃ অনেক পণ্ডিতের তো তাই মত। মদ্ররাজ থেকে মাদ্রাজ।

প্রমাণ ?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম ঃ এ সবই অনুমানের কথা। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা মদ্রদেশের অবস্থান সম্বন্ধে চারটি মত পোষণ করেন। কেউ উত্তরে বলেন, কেউ দক্ষিণে। কিন্তু প্রমাণ কেউই দিতে পারেন না।

মামা বললেন ঃ আমি কী শুনেছিলুম জান ? কোন এক সাহেবের নামে এই নাম হয়েছে।

আমিও শুনেছি এই কথা। মাড্রা নামে এক পর্তুগীজ সাহেবের নামে এ জায়গার নাম হয়েছিল ম্যাড্রাস পত্তন। আবার এক সময় নাকি এই শহরের বেলা পত্তন নাম ছিল। নায়ক রাজা চেন্নাপ্পা এই শহর পত্তন করেছিলেন।

সে কবেকার কথা বলতে পার?

চেন্নাপ্পার কথা জানি নে, ইতিহাসে এ নাম পাই নি।

তবে কি সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা?

বললুমঃ নায়ক রাজারা মাদ্রাজের ইতিহাসের মতো পুরনো নয়। খ্রীষ্টের জন্মের দুহাজার বছর আগে এদেশে যখন আর্যরা এসেছিল বসবাসের জন্য, তখন এই অঞ্চল চোল রাজাদের অধীন ছিল। নাম ছিল চোলামণ্ডল। কাবেরী নদীর তীরে তাদের রাজধানী ছিল উরেয়ুরে।

স্বাতি বললঃ এখন এ সব জায়গা নেই?

এখন এই উপকূলের নাম করমণ্ডল, আর উরেয়ুর নামে কোন শহর কাবেরীর কূলে নেই। তার কাছে নতুন শহর হয়েছে তিরুচিরপল্লী। আজকের মাদ্রাজ শহর পুরাকালের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রামের সমষ্টি। মায়লাপুর ট্রিপ্লিকেন তিরুভাত্তিয়ুর—এসব খুব প্রাচীন জায়গা। কুরল নাম শুনেছ?

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলঃ না।

বললুমঃ তামিল ভাষায় লেখা তত্ত্বজ্ঞান সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাঙ্গলা হিন্দী ও ইউরোপের ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। কুরল লিখেছেন তিরুবাল্লুবর, মায়লাপুরে তাঁর জন্ম। তিরুজ্ঞান সম্বন্দর ও পেইয়ালবারের নামের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে।

মামা বললেনঃ এঁরা আবার কে?

বললুমঃ তামিলনাড়ুর মহাপুরুষ বলে এঁরা পরিচিত। আর একজন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন মাদ্রাজের নিকটে। তিনি সারা ভারতে পরিচিত, নাম তাঁর রামানুজ।

মামা বললেনঃ শুনেছি এই নাম। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

সেই রামানুজের জন্ম হয়েছে মাদ্রাজ থেকে মাইল তিরিশেক দূরে শ্রীপেরাবুদুর শহরে। কাঞ্চীর পথে এই শহর। ট্রিপ্লিকেনের পুরনো নাম নাকি তিরু অল্লিকেনি, মানে স্বর্গীয় পদ্মের জলাশয়। সেখানে আছে পার্থসারথির মন্দির। শ্রীমৎ আমুরি সর্বক্রতু কেশব দীক্ষিত নামে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সেখানে পুত্র কামনায় যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞের এক বছর পরে রামানুজের জন্ম হয়েছিল।

মামা বললেন ঃ তারপর ?

বললুম ঃ মাদ্রাজের স্যান টোম নামে গির্জাটিও প্রায় দুহাজার বছরের পুরনো। শোনা যায় যে সেন্ট টমাস নামে যীশু খ্রীষ্টের এক শিষ্য ভারত-বর্ষে এসেছিলেন প্রথম শতাব্দীতে প্রভুর মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য। মায়লাপুরে তিনি একটি ছোট গির্জা তৈরি করে সকলকে আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাতেন আর ধর্ম প্রচার করতেন। মাদ্রাজের বিমান ঘাঁটি মীনাম্বকমের নিকট সেন্ট টমাস মাউন্টে দুর্বৃত্তরা তাঁকে হত্যা করে। প্রথমে তাঁকে তাঁর স্যান টোম গির্জাতেই কবর দেওয়া হয়েছিল। এখন তাঁর সমাধি সেন্ট টমাস মাউন্টে।

এর পরের ইতিহাস আধুনিক যুগের। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে এই গির্জাটি অধিকার করে তার সংস্কার করে। তখন এই শহরের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। তৎপর ভাবে তারা তাদের দলের ম্যাড্রার নামে এই জায়গার নাম দিয়েছিল ম্যাড্রাস পত্তন। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ এল এ দেশে। খানিকটা উত্তরে বেলা পত্তনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ঘাঁটি হল এক বছর পরে সেন্ট জর্জ ডেতে। এই জমিটুকু ফ্রান্সিস ডে পেয়েছিলেন চন্দ্রগিরির শেষ রায় রাজার কাছে। তাঁদের সেন্ট জর্জ দুর্গ চোদ্দ বছর ধরে তৈরি হয়ে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হল। এর পরে এই শহর বেড়েছে ইংরেজের দুর্গের দুধারে—কয়ুম নদীর উত্তর ও দক্ষিণ ব্ল্যাক টাউন ও হোয়াইট টাউন নামে চিহ্নিত হয়েছে।

মাদ্রাজের উপরে আধিপত্য নিয়ে এই সময়ে যে লড়াই হয়েছে তার ইতিহাসও ছোট নয়। ওলন্দাজ এসেছিল বাণিজ্য করতে। তাদের নজর ছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপরে। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন

তারা দেখে নি। সে স্বপ্ন দেখতেন ফরাসী অধিনায়ক ডুপ্লে। ফরাসীরাই সকলের পরে এসেছিল, কিন্তু অল্প দিনেই টেক্কা দিল সকলের উপরে। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে এসে বছর কয়েকের মধ্যেই একটা দুর্গ তৈরি করে নিয়েছিল। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা হয়ে এলেন। ডুপ্লে ছিলেন ভীষণ দর্পী। অল্প দিনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন কঠিন কাজ হবে না। ভারতে কোন রাজবংশ স্থায়ী হয় না। উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল লেগেই থাকে। নিজেদের পদ্ধতিতে অল্প কিছু সৈন্য তৈরি করে নিতে পারলেই এ দেশের একটা বড় সৈন্যদলকেও নিতান্ত সহজে ঘায়েল করা যেতে পাবে। সিংহাসনের দাবীদারদের কোন একজনের পক্ষ নিলেই হল। এর দুবছর পরে ইংরেজ আর ফবাসীতে যুদ্ধ বাধল ইয়োরোপে, ভারতেও তাদের বিবাদ শুরু হয়ে গেল। ফবাসী নৌসেনাপতি লা বুর্দনেস এলেন ডুপ্লের সাহায্যে, সমুদ্রে থেকে মাদ্রাজের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করলেন। মাদ্রাজ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল এই শর্তে যে প্রতিশ্রুত অর্থ পেলেই এই শহরের অধিকার ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ডুপ্লে এ যুক্তি মানলেন না। কর্ণাটের নবাব তখন আনওযার উদদীন। নবাব নিজে মাদ্রাজের অধিকার চাইলেন। আর দশ হাজার সৈন্য পাঠালেন মাদ্রাজ দখলের জন্য। ডুপ্লের যুদ্ধনীতির এই প্রথম পরীক্ষা হল। মাত্র পাঁচশো শিক্ষিত সৈন্য নিয়েই তিনি নবাবকে পরাস্ত করলেন। এর পরে মাদ্রাজের একশো মাইল দক্ষিণে ইংরেজের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ করে ডুপ্লে ব্যর্থ হলেন। সুযোগ পেয়ে ইংরেজের রণতরী পণ্ডিচেরী অবরোধ করল। বাতাসে তখন ঝড় উঠেছে, আকাশে বর্ষার আস্ফালন। পঞ্চাশ দিন অবরোধের পর ইংরেজকে ফিরে যেতে হল। ফরাসীর হল জয়জয়কার। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর সন্ধি হয়ে গেল। লুই দুর্গের পরিবর্তে ইংরেজ মাদ্রাজ আবার ফিরে পেল।

আমি নিঃশব্দে রুটি কামড়াচ্ছিলুম দেখে স্বাতি বলল: গোপালদার ইতিহাস কি ফুরিয়ে গেল?

আমি বললুম: ইতিহাসের চেয়ে প্রাতরাশটা ভাল লাগছে।

মামা বললেন ঃ তাড়াতাড়ি শেষ করাও দরকার। স্নান করে বেরোতে হবে। রিজার্ভেশন অফিসেও কাজ আছে, তার পরে শহর দেখা।

বলে তিনি উঠে পড়লেন। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে আমিও উঠে পড়লুম।

পাশের ঘরে যাবার জন্যে বারান্দায় বেরোতেই স্বাতিও বেরিয়ে এল। চুপিচুপি বলল ঃ আজ রাতেই রামেশ্বর রওনা হবে নাকি!

বললুম ঃ তাই তো হুকুম।

তাহলে উপায় কী হবে! কাঞ্চী তাঞ্জোর ত্রিচি মাদুরা—

বাধা দিয়ে বললুম ঃ একটাও বাদ দেওয়া যায় না।

তবে?

দেখি কী করতে পারি!

স্বাতি বলল ঃ আমি বলব কিছু, না তুমি একাই পারবে?

হেসে বললুম ঃ না পারলে সাহায্য কোরো।

বেশ।

বলে স্বাতি ফিরে গেল।

আমার আশা ছিল যে আজ রাতের গাড়িতে হয়তো জায়গা পাওয়া যাবে না। তাহলেই একটা ব্যবস্থা সম্ভব। কাল সকালের গাড়িতে রওনা হয়ে কাঞ্চী শহরটা দেখে নেওয়া যাবে। তারপরে রাতের গাড়িতে জায়গা পাওয়া গেলে ভোর বেলায় তাঞ্জোর বা ত্রিচি।

ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন ছিল। তাই যা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই হল। আজ রাতে একখানি বার্থ খালি আছে, কাল দুখানা। এ খবর পেয়ে মামা জলে পড়ে গেলেন। বললেন ঃ তবে আমাদের উপায় কী হবে গোপাল?

মনের আনন্দ কোন রকমে চেপে আমি বললুম ঃ আমি একটা ব্যবস্থা করব?

মামা রেগে গিয়েছিলেন, বললেন ঃ যা ইচ্ছে কর।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তাকে বললুম ঃ কালকের জন্যেই দুখানা বার্থ নিই, আর তোমার নাম থাক ওয়েটিং লিস্টে।

তারপর?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

বললুম ঃ আপাতত ত্রিচি পর্যন্ত টিকিট কাটি, স্বাতির জায়গা পেলে বাড়িয়ে নেব।

স্বাতি বলে উঠল ঃ সেই ভাল গোপালদা। বিপদ দেখলে ত্রিচিতেই আমরা নেমে পড়ব।

কোন কথা না বলে মামা তাঁর ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দিলেন। আর আমরা সেই ব্যবস্থাই করলুম।

১০

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মামা বললেন : তারপর ?

স্বাতি তৎপর ভাবে বলল : এইবারে একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।

মামা আমার দিকে তাকালেন। তাই দেখে আমি বললুম : আমি একটা পরামর্শ দেব ?

তোমার ওপরেই তো সব ভার দিয়েছি।

তবে এক কাজ করা যাক। ছোট লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চলে এই স্টেশনের ওপর দিয়ে। উত্তরে বীচ স্টেশন মাইল তিনেক দূরে, আর দক্ষিণে ষোল মাইল দূরে টাম্বরম। ট্রামের মতো ট্রেন তো, দশ মিনিট পরে পরেই পাওয়া যায়।

স্বাতি বলল : বীচ স্টেশনে যাবে বুঝি ?

মামা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : চল।

লোকাল ট্রেনের বুকিং কাউন্টার স্টেশনের আর এক প্রান্তে। সেখানে চারখানা টিকিট কেটে ওভারব্রিজের উপর দিয়ে আমরা ট্রেন ধরতে এলুম। উত্তর দক্ষিণ যাত্রীদের কাছেই জেনে নিয়ে বীচ স্টেশনের ট্রেনে চেপে বসলুম।

এই তিন মাইল পথে আরও দুটি স্টেশন আছে। পার্ক আর ফোর্ট। স্বাতি প্রফুল্ল হয়ে উঠল, বলল : আমাদের ট্রামেরই মতো। আকারে বড়, আর চলে অনেক জোরে।

মামা দুধারের পথ ঘাট আর ঘর বাড়ি দেখে মন্তব্য করলেন : কলকাতা হলে কুড়িটা রাস্তার মোড়ে দুহাজার মোটর আটকে যেত।

দেখতে না দেখতেই আমরা বীচ স্টেশনে পৌঁছে গেলুম। গেটে টিকিট দিয়ে বাইরে এসেই একটা সমস্যার সম্মুখীন হওয়া গেল। ডাইনে হারবার, আর বামে শহর। এখন হারবার দেখা হবে, না শহর !

মামা বললেন ঃ হারবারে কী দেখবার আছে ?

আমি যেন মাদ্রাজের পেশাদার গাইড ! মনে মনে ভেঙ্কটাইয়ারকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম ঃ কোম্পানির আমলের এই কৃত্রিম বন্দরটি হয়েছে ফ্রান্সিস ডের চেষ্টায় তৈরি। দু শো একর জলে বিস্তৃত এই বন্দরটিতে এখন আটখানা জাহাজ একসঙ্গে নোঙর করতে পারে। সিংহল অস্ট্রেলিয়া ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে এর বাণিজ্য।

মামা বললেন ঃ ঢুকতে দেবে কি আমাদের ?

বললুম ঃ পোর্ট ট্রাস্টের কাছে অনুমতি নিতে হবে। তবে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলতে পারি নে।

স্বাতি বলল ঃ তার চেয়ে মেরিনায় গিয়ে সমুদ্র দেখা যাক। একটা বইএ দেখলুম যে এখানকার মেরিনা নাকি এশিয়ায় প্রথম আর পৃথিবীতে দ্বিতীয়।

আমার দিকে চেয়ে বলল ঃ কোন্‌টা প্রথম বলতে পার ?

বললুম ঃ মুশকিলে ফেললে। ভারতবর্ষটাই ভাল করে দেখতে পাই নি, আমি বলব পৃথিবীর খবর ! তবে শুনেছি যে ক্যালিফোর্নিয়ায় নাকি এক অতুলনীয় মেরিনা আছে।

আমরা দক্ষিণের পথ ধরেছিলুম। মামা একটা ট্যাক্সি ডাকলেন। মোটা মানুষ, হাঁটতে যে কষ্ট হচ্ছিল তা বুঝতে পেরেছি। বললেন ঃ এমনি করে হাঁটলেই মাদ্রাজ দেখা হবে।

আমি ড্রাইভারের সঙ্গে বসলুম। প্যারিজ কর্নার দেখিয়ে ফোর্টে যাবার নির্দেশ দিলুম।

পিছনে ফিরে স্বাতিকে বললুম ঃ প্যারির চকোলেট টফি এখনও খাও তো, এই সেই বিখ্যাত প্যারির দোকান। মাদ্রাজের মেয়েরা প্যারির চকোলেট খেতে এত ভালবাসে যে এই সুন্দর জায়গাটির নাম দিয়েছে "প্যারিজ কর্নার"।

তারপরে আঙুল দিয়ে হাই কোর্ট দেখালুম। তার বারান্দায় সারি সারি খিলান আর ছাদে ছোট ছোট গম্বুজ। স্বাতি চটে উঠল, বলল ঃ আমি কি বাঙাল যে আমাকে হাই কোর্ট দেখাচ্ছ !

বললুম ঃ দেখবার জিনিস হলে দেখতে হবে বইকি ! ইণ্ডোসেরাসেনিক স্টাইলে তৈরি এই বাড়িখানা কি খারাপ ?

ততক্ষণে ট্যাক্সির ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে যে আমরা শহর দেখতে এসেছি বাইরে থেকে। তাই লাইট হাউসের মাথায় চড়ব কিনা জিজ্ঞাসা করল। এক শো ষাট ফুট উঁচু এই লাইট হাউসে চড়ার নাম শুনে মামার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। বললেন ঃ না না, অত সময় নেই আমাদের।

স্বাতি দুঃখ করে বলল ঃ ওপর থেকে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখা যেত শহর।

আমি বললুম ঃ এ দিকে সবই সুন্দর স্বাতি, দুঃখ থাকবে না কিছু।

ড্রাইভার ল কলেজের বাড়িটা বাতলে হাই কোর্টের দক্ষিণে নিয়ে এল দুর্গের ভিতরে। ড্রাইভার আমাদের সেণ্ট মেরি গির্জার কাছে নিয়ে এল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সেই দিকে এগোলুম। দুর্গ আজ আর দুর্গ নেই, মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারিয়েট আর আইন-সভা বসে সেখানে। মাউণ্ট রোড আর পুলোমালি হাই রোড থেকে ভিতরে আসা যায়, মেরিনার দিকেও একটা গেট আছে যাতায়াতের জন্য।

স্বাতি বলল ঃ এই কি তোমার স্যান টোম গির্জা ?

বললুম ঃ না। ইংরেজরা এই গির্জা তৈরি করেছে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র এশিয়ায় এই প্রথম প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চ। এডওয়ার্ড ফাউল নামে এক সাহেব এর ডিজাইন করেছিলেন, আর মোটা টাকা দান করেছিলেন এলিহু ইয়েল, যাঁর নামে আমেরিকায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়। একটি অপূর্ব জিনিস আছে ভেতরে। কম্যুনিয়ান-টেবিলের ওপর টাঙানো আছে একখানা র‍্যাফেলের ছবি—লাস্ট সাপার ! অনেক লোকের বিশ্বাস যে সেই অদ্বিতীয় শিল্পীর তুলির স্পর্শ আছে এই ছবিতে। নিজের স্টুডিওতে বসে র‍্যাফেল এই ছবির কতক কতক জায়গা নিজে এঁকে-ছিলেন। বাকিটা আঁকে তাঁর এক শিষ্য।

খানিকটা এগিয়ে মামী দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। বললেন ঃ এইখান থেকেই যথেষ্ট দেখা হয়েছে, আর কিছু দেখবার থাকে তো সেই দিকে চলো।

গির্জা আর মামীর সংস্কারে আছে দ্বন্দ্ব। সে কথা বুঝতে পেরে বললুম ঃ তা হলে চলুন ফোর্টের মিউজিয়মে। সেখানেও আছে কোম্পানির আমলের নানান জিনিস। সে যুগের বন্দুক বারুদ জামা কাপড় মুদ্রা আর মেডেল।

স্বাতির দিকে ফিরে বললুম ঃ তোমার ভাল লাগত এই সেণ্ট মেরি গির্জার একখানা খাতা। তাতে বিয়ের কথা আছে এলিহু ইয়েল আর রবার্ট ক্লাইভের। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ মার্গারেট ম্যাস্কেলিনকে বিয়ে করেন। আঠারো বছরের এই যুবক কোম্পানির সামান্য কেরানী হয়ে মাদ্রাজে আসেন। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সৈনিক হবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আর প্রথম যুদ্ধ করেছিলেন একটি ছোট সেনাদলের নায়ক হয়ে। এই রবার্ট ক্লাইভ সেদিন এক ফোঁটা লাল রঙ ফেলেছিলেন ভারতের মানচিত্রে. একদিন সমস্ত দেশটা ছেয়ে গিয়েছিল সেই লাল রঙে। আজ স্বাধীন হয়েও আমরা সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয়ে ডরাই।

সব দেখে শুনে আমরা নেপিয়ার ব্রিজ পেরিয়ে মেরিনায় এলুম। সমুদ্রের ধারে ধারে এই প্রশস্ত পথের বিস্তৃতি চার মাইল। পথের এক দিকে আপন আপন বৈচিত্র্যে ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল বাড়িগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য দিকে ঘোড়ার খুরের রাস্তা ও মানুষের চলার পথের পাশের সঙ্কীর্ণ ফুল-পাতার বাগান পেরিয়ে বিস্তীর্ণ বালির মরুভূমি। দূরে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে, শুভ্র ফেনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিচ্ছন্ন বেলাভূমি।

কার ভাল লাগল না জানি না, স্বাতি চঞ্চল হয়ে উঠল সমুদ্রের কাছে যাবার জন্যে। বললুম ঃ নামবার জায়গা হচ্ছে ট্রিপ্লিকেন।

ড্রাইভারকে বললুম সেখানে থামতে। সে লোকটা বাড়িগুলি আমাদের চিনিয়ে দিচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির ঘড়ি দেখাল, দেখাল খিলান আর গম্বুজওয়ালা ইণ্ডো-সেরাসেনিক স্টাইলে তৈরি সিনেট হাউস। তারপর দেখলুম চীপক প্যালেস, মুয়োরিশ পদ্ধতিতে তৈরি। তার অসংখ্য খিলান আর সরু সরু মিনার। এক সময় কর্ণাটের নবাবদের

ছিল, এখন অধিকার করেছে বোর্ড অব রেভিনিউ আর পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট। এমন সুন্দর আর একখানি বাড়ি দেখি নি সারা শহরে। এই প্রাসাদের পিছনেই বিখ্যাত চীপক গ্রাউণ্ডস, যেখানে ক্রিকেটের টেস্টম্যাচে বিদেশীদের হারাবার ধারা এক সময় অব্যাহত ছিল। এই বাড়ির লাগোয়া দেখলুম পুরনো প্রেসিডেন্সি কলেজ—ষোড়শ শতকের ইটালিয়ান রেনেসাঁ স্টাইলে তৈরি। মাঝখানের গম্বুজটি যোগ হয়েছে অল্প দিন। কলেজের সামনে মেরিনা সুইমিং পুল দেখে স্বাতির স্নানের শখ হল। বললুম: আট গণ্ডা পয়সা দিলে সকলকেই নাইতে দেয় বটে কিন্তু তা শনি রবি আর সোমবার।

এই সব বাড়ির ফাঁকেই নাকি আইস হাউস নামে একটি অদ্ভুত বাড়ি আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের জন্য জাহাজে বরফ আসত উত্তর আমেরিকা থেকে। সেই বরফ জমিয়ে রাখবার ব্যবস্থা ছিল সেখানে।

আমরা ট্রিপ্লিকেনের সমুদ্রবেলায় নামলুম। নীল আকাশ এখন কালো মেঘে আচ্ছন্ন, বাতাস স্তব্ধ হয়ে আছে। আজ লোকের মেলা বসে নি এই সময়। শুনেছি সন্ধ্যেবেলায় রঙে রঙে মাতাল হয়ে যায় এই জায়গাটা। কত দেশের কত রকমের লোক! কত গল্প, কত গোলমাল! ছেলেদের খেলবার জায়গাগুলো ফাঁকা। ফুল আর ফলের ফেরিওয়ালারা প্রলুব্ধ করছে না ছোট বড় ছেলেমেয়েদের। মল্লিয়মের মালা-পরা চুলের গন্ধে বাতাস এখনও ভারী হয়ে ওঠে নি। গানও বুঝি ও-বেলায় শুরু হবে।

বালিতে ভরে যাচ্ছে পা দুখানা। কিন্তু স্বাতির স্ফুর্তির অন্ত নেই। তার ভাল লেগেছে এই উদার স্বাধীনতা। মামী অনুযোগ করে বললেন: দক্ষিণে এত মন্দির, কিন্তু কোন মন্দির দেখালে না গোপাল! বেলা যে অনেক হল!

বেলার কথায় খেয়াল হল যে আকাশে সূর্যদেব থাকলে এতক্ষণ তিনি মাথার উপরেই উঠতেন।

মামা বললেন: মন্দির এখানে কোথায়?

আমি হেসে বললুম : এদেশের লোক কী বলে জানেন ? বলে যে মন্দির নেই, এমন শহর নেই দক্ষিণ ভারতে।

ড্রাইভারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল যে ট্রিপ্লিকেনের পার্থসারথি মন্দির দেখে স্যান টোমের সামনে দিয়ে যাব মায়লাপুর। সেখানে আমরা কপালীশ্বর শিব দর্শন করব। এতে আমাদের ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

১১

পার্থসারথি মন্দিরটি বড় প্রাচীন। শোনা যায় যে অষ্টম শতকের এক পল্লব রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিজয়নগরের এক রাজা এর সংস্কার করেন ষোড়শ শতকে। মন্দিরের সংলগ্ন একটি সরোবর আছে। কিন্তু সেদিকে আমরা গেলুম না। শহর দেখার তাড়াতেই বেরিয়ে এলুম মন্দির থেকে।

মেরিনার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে রোমান ক্যাথলিকদের সেই স্যান টোম গির্জা। তার উন্নত চূড়া দেখে স্বাতি বলল ঃ সাড়ে চার শো বছর আগে ওলন্দাজরা এর সংস্কার করে, তাই বলছিলে না গোপালদা? কিন্তু এমন নতুনের মতো দেখাচ্চে কেন!

বললুম ঃ ঠিক ধরেছ। গত শতাব্দীতে পুরনো গির্জাটা ভেঙে এই নতুন গির্জা তৈরি হয়েছে আধুনিক গথিক স্টাইলে। নতুন দেখাবে বই কি!

এই খানেই শেষ হয়েছে মেরিনা, কিন্তু বেলাভূমি শেষ হয় নি। দক্ষিণে অ্যাডিয়ার পর্যন্ত আরও আট মাইল বিস্তৃত সমুদ্রের ধারে মেরিনার মতো রাজপথ আর নেই। আমরা ডান দিকে মায়লাপুরের দিকে অগ্রসর হলুম।

মায়লাপুরের মন্দির এখান থেকে দূরে নয়। একটা উঁচু গোপুরের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল ড্রাইভার। তোরণকে এরা গোপুরম্ বলে। কিন্তু আমাদের দেশের নহবতখানার মত সাদাসাপটা ইটের তৈরি ফটক নয়। অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি-ক্ষোদিত কয়েকতলার সমান উঁচু পাথরের চতুষ্কোণ তোরণ। বৈদ্যনাথের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে তার উচ্চতার। শীর্ষদেশ কোন বিন্দুতে মেলে না, নীচের চেয়ে লম্বায় কিছু কম, পুরু প্যারাপেটের মতো দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নেই। তার

মানে সামনের দিকে উচ্চতার অনুপাতে পাশে কমে নি, আর দু পাশে উচ্চতার সঙ্গে পাশেও কমেছে এমন ভাবে যে আর হাত কয়েক উঁচু করলেই শীর্ষদেশ একটা সরল রেখায় শেষ হত। দ্রাবিড় স্থাপত্যের একটি খাঁটি নিদর্শন এই গোপুরম।

স্বাতি বড আশ্চর্য হয়ে দেখছিল এই গোপুরটি। একজন ব্রাহ্মণ তার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প শুরু করল ভাঙা ইংরিজীতে। পরনে ধুতি, একখানা চাদর ফেলেছে তার অনাবৃত কাঁধে, কপালে ফোঁটা-তিলক। মামীও শুনতে পান এমনি স্বরে বলল: গোপুরমের এই সমস্ত মূর্তি দিয়ে রামায়ণ আব পুবাণের গল্প বলা হয়েছে।

একটা ধার দেখিয়ে বলল: এই দেখুন, সমুদ্রমন্থনের দৃশ্য।

স্বাতি তার ক্যামেবা বার করে বলল: একটা ছবি নেওয়া যাক, কী বল মা?

স্বাতি ছবি তুলেছে সমুদ্রেব। আলো ছিল না ভাল, তার জন্যে আপসোস করেছে বার বার, কিন্তু ছবি নিতে কার্পণ্য করে নি।

ব্রাহ্মণ বলল: এখান থেকে তো ভাল ভিউ পাবেন না, এদিকে আসতে হবে।

বলে ঘুরিয়ে একটা গলির ভিতরে নিযে গেল। বলল: এইখান থেকে এই নারকেলগাছটা পাশে রেখে ছবি নিন।

স্বাতি আশ্চর্য হল, বলল: সত্যিই তো, এ জায়গাটা যেন ছবি নেবার জন্যেই তৈরি হয়েছে।

ব্রাহ্মণ একগাল হেসে আমাকে বলল: আজ সকালেই একজন আমেরিকান সাহেব ছবি নিলেন এইখান থেকে। সামনে থেকে পুরো ভিউটা পাওয়া যায় না।

আমরা গাড়িতেই জুতো খুলে নেমেছিলুম। সোজা ভিতরে চলে গেলুম। মামা মামী অনেকটা দূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মন্দিরকে মন্দির বলে মনে হল না। গোল গোল থামওয়ালা একটা চারকোণা অন্ধকার ঘর। একতলা বাড়ির মতো তার সমতল ছাদ। চেয়ে থাকবার মতো কারুকার্য দেখলুম না কোনখানে। দক্ষিণের এও একটা

রীতি। মূল মন্দিরের চেয়ে গোপুরই হয় বেশি উঁচু, আর স্থাপত্যের যত কিছু উৎকর্ষ, তা মূল মন্দিরের বাহিরে। যাত্রীরা সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখে চোখ জুড়োবে। দেবতা অন্ধকার ঘরে থাকেন, নিতান্ত সাদাসিধে পরিবেশের ভিতর। যাত্রীদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। দূর থেকে দেখতে হয় দেবতাকে। এ কেমন পরিহাস তা বুঝি নে।

মায়লাপুর মানে ময়ূরের বাসস্থান। আজ এই বিংশ শতকে ময়ূরের চিহ্নও দেখা যায় না মায়লাপুরের ধারে কাছে। তবে ব্রাহ্মণ বলল যে পার্বতী নাকি ময়ূরের রূপ ধারণ করে মুক্তির জন্যে শিবের তপস্যা করেছিলেন। স্থপতিরা এই গল্প নিখুঁত ভাবে উৎকীর্ণ করে রেখেছে মন্দিরের ভিতর। শিব এখানে কপালীশ্বর নামে পূজিত হচ্ছেন।

আর একটু এগিয়ে মন্দিরের পিছনে দেখা গেল বিরাট পুকুর। তার চারিধারে বাঁধানো সিঁড়ি। যাত্রীরা জলে দাঁড়িয়ে কেউ হাত পা ধুচ্ছে, কেউ স্নান করছে। যাত্রী বেশি নেই, এমন সময় নাকি মন্দিরে কেউ আসে না। ব্রাহ্মণ বলল যে প্রতি বৎসর এই পুকুরে ফ্লোটিং ফেস্টিভাল হয়। তার তামিল প্রতিশব্দটি মনে রাখতে পারি নি, বাংলায় কী প্রতিশব্দ ব্যবহার করব জানি না। সন্ধ্যার সময় একটা বড় চারকোণা নৌকোর উপর দেবতার মূর্তি স্থাপন করে নানা বর্ণের আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। তারপর অসংখ্য যাত্রীর আনন্দধ্বনির মাঝে দেবতা শতবার এই পুকুর প্রদক্ষিণ করেন। এ দিন বড় উৎসবের দিন, ছোটখাটো একটা মেলা বসে মন্দিরের প্রাঙ্গণে।

দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সকল মন্দিরে আরও দুটো উৎসব হয়—রথযাত্রা আর পাল্কীযাত্রা। প্রতি বছর কোন এক বিশেষ দিনে নানা দেশ থেকে অসংখ্য যাত্রীসমাগম হয়। সে দিন মন্দিরের রথ বার করা হয় চালার নিচে থেকে। তাকে ঝেড়ে মুছে ফুল আর আলোয় সাজিয়ে দেবতার উৎসবমূর্তিকে স্থাপন করা হয় রথে। যাত্রীরা ছোট বড় ধনী দরিদ্র হাজারে হাজারে সেই রথ টেনে মন্দির প্রদক্ষিণ করে। রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে আর যাত্রীদের আনন্দধ্বনিতে সমস্ত আকাশ-বাতাস উদ্বেল হয়ে ওঠে।

পাল্কী উৎসবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আয়নার টুকরোয় সাজানো কয়েকটি বিরাট পাল্কী থাকে মন্দিরে। সেগুলো ফুলে ফুলে মনের মতো করে সাজিয়ে মন্দিরের দেবতাদের বসানো হয় পাল্কীর ভিতরে। তারপর ব্রাহ্মণেরা সেই পাল্কী কাঁধে শোভাযাত্রা করে আশেপাশের কয়েকখানা গ্রাম ঘুরিয়ে আনেন।

মামী শিবের মাথায় একটু ফুল-বেলপাতা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মামাও ছিলেন সঙ্গে। খালি পায়ে মেয়ে-পুরুষেরা আসছে আর যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে কেউ জটলা করছে না, পাণ্ডা ধরছে না, মন্দিরের ভিতর ভিড়ও করছে না। নিঃশব্দে শিবের দর্শন করে আর চারিদিকের ছোট ছোট মন্দিরে অন্যান্য দেবতাদের প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হল যে তারা রোজই আসে। দেবতাকে ভালবাসে, তাই দেবদর্শন না হলে দিনের কাজে তাদের মন বসে না। এক দক্ষিণদেশীয় বন্ধুর মুখে শুনেছিলুম যে তারা সিনেমা থিয়েটার না দেখে থাকতে পারে, ক্লাবের প্রয়োজন তারা স্বীকার করে না। যা তাদের রক্তমজ্জার সঙ্গে জড়ানো, সে হচ্ছে মন্দির। সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহমনের মালিন্য দূর করার জন্যে কোন দেবমন্দির তাদের চাই। দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে তাই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের লোক দলে দলে এসে মিলিত হবে সেই মন্দিরে, দেবতার নামগানে মুখর করে তুলবে মন্দির-প্রাঙ্গণ।

দেবতায় কী অসীম বিশ্বাস এদের তাই ভেবে আশ্চর্য হই। গাড়িতে ভেঙ্কটাইয়ার বলছিলেন ভদ্রাচলের শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরের কথা। সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বন থেকে নানা দেশ ঘুরে ভদ্রাচলে আসেন। তারপর গোদাবরী পেরিয়ে যান দক্ষিণ দেশে। রামদাস নামে নিজামের এক কর্মচারী তহবিল তসরুফ করে ভদ্রাচলের মন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং পরে এই অপরাধের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শোনা যায় যে এক ব্রাহ্মণ রামদাসের ভৃত্য বলে পরিচয় দিয়ে নিজামকে সেই অর্থ ফেরত দিয়ে আসেন। দক্ষিণের সমস্ত লোক এই ঘটনাটিকে ভগবানের লীলা বলে পরম নিষ্ঠা ভরে সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে। ভেঙ্কটাইয়ার এ যুগের শিক্ষিত লোক। খবরের কাগজে পুরোপুরি যাচাই করা খবর

ছাপেন। তবুও এ গল্পটি বলবার সময় তাঁর হৃদয়ের আকুলতা গোপন করতে পারেন নি। দক্ষিণের লোক সযত্নে এই বিশ্বাসকে লালন করে আসছে। দারিদ্র্যকে তারা ভয় পায় না, সে তো সৌরভ বিতরণের জন্যে ধূপকে পোড়ানো। তারা ভয় পায় এ যুগের কলের সভ্যতাকে, যা তাদের অনেক দিনের বিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছে দিনে দিনে, যে বিশ্বাস তাদের বর্ষার দিনে বন্ধুর রথ এনেছে বুকের দরজায়।

পূজো শেষ করে মামা মামী যখন বেরিয়ে এলেন, তখন খাবার কথাই প্রথমে মনে পড়ল। সেই ব্রাহ্মণ এসে গাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। মামার কাছে একটা টাকা দক্ষিণা পেতেই আশীর্বাদ করল প্রাণ ভরে।

১২

কাছেই একটা হোটেলে আমরা খেয়ে নিলুম। খাঁটি দক্ষিণী খাবার। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান ধারে কাউণ্টার। খাবারের দাম দিয়ে পিতলের চাকতি পাওয়া যায় একখানা, অতিরিক্ত কয়েক আনায় আর একখানা টিনের চাকতি। কোথাও বা টিকিটের ব্যবস্থা। প্রত্যেকে তুখানা করে চাকতি নিয়ে টেবিলে বসলুম। সরু পাথরের টেবিল, ছোট ছোট চেয়ার সামনে। একজন কলাপাতা বিছিয়ে চাকতিগুলো নিয়ে গেল। তারপর ব্রাহ্মণ এল ডাল-তরকারি নিয়ে। একটা পিতলের হাতলে ঝোলানো চারটে পরিবেশনের বাটি বাঁ হাতে, ডান হাতে হাতা—তাতে নারকেলের কুচি মেশানো লাউয়ের তরকারি, টক আর ঝাল মেলানো বাঁধাকপি, টোকো দইএ কুচনো সব্জি মেশানো রায়তা, লেবুর আচার। গরম ভাত দিল একজন, আর একজন সেই ভাতের উপরে ঘি দিয়ে গেল। একজন সম্বর দিল, আর একজন দিল রসম। একটা চিনেমাটির ভাঁড়ে দই পাওয়া গিয়েছিল, চিনি নিতে হল চেয়ে। অনেকে এই দইটা পেল না। জানা গেল যে সেই টিনের চাকতিওয়ালাদের জন্য এটা বিশেষ পদ। মধুরেণ সমাপয়েতের রীতি এ দেশে নেই। মিষ্টি খেয়ে মুখের টোকো আস্বাদটুকু খোয়াতে এরা রাজী নয়। মামার মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু পাওয়া গেল না। বলল, মিষ্টির চল নেই একেবারে, তাই অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে দিতে হবে। আমাদেরও সময় নেই অপেক্ষা করার।

পাশের একটা ঘরে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা মাটিতে কলাপাতা বিছিয়ে খাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখে স্বাতির হাসি পাচ্ছিল। তাঁদের মাথার চারপাশটুকু কামানো, মাঝখানের চুলগুলো টেনে ঝুঁটি বেঁধেছেন মেয়েদের মতো। কপালে ফোঁটা-তিলক। স্বাতি বলল: ঠিক পক্ষীতীর্থের পূজারীর মতো, তাই না গোপালদা?

বুঝতে পারছিলুম যে ভদ্রলোকেরা গোঁড়া ব্রাহ্মণ, কিন্তু কোন্ সম্প্রদায়ের তা জানি নে।

মামী ফিসফিস করে বললেনঃ শুনেছিলুম এরা নাকি নোংরা হয় বড়, কিন্তু নোংরামি তো কিছু দেখছি নে?

মামা বললেনঃ বেরবার সময় সবাই ভয় দেখিয়েছিল যে এ দেশে খেতে না পেয়ে ভুঁড়ি চুপসে যাবে। এখন মনে হচ্ছে যে এ দেশের খাবার তারা কখনও খায় নি।

স্বাতি বলল ঃ তাই বলে রোজ এ খাবার মুখে রুচবে না। দুবেলাও খাওয়া যাবে না এসব।

বেরবার সময় সেই কাউণ্টারে দেখি একটা থালায় পান সাজিয়ে রেখেছে। বেশ একটু নতুন ধরনের পান। টর্চের ব্যাটারির মতো গোল করে পাকানো, উপরে রঙিন নারকেলের কুচি আর ছোট ছোট লজেন্সের গুলি। এই পান কিনে সবাই মুখে পুরলেন। আমি এক প্যাকেট সুপুরি মুখে ফেললুম।

গাড়িতে ওঠবার আগেই সে পান থু-থু করে ফেলল স্বাতি। বলল ঃ একেবারে ঘাস, কোনও আস্বাদ নেই পানের।

মামা-মামীও ফেললেন পরে, তবে খানিকটা এগোবার পর মোটর থামিয়ে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা গভর্মেণ্ট মিউজিয়াম আর আর্ট গ্যালারি দেখব কি না! মামা আমার দিকে তাকালেন উত্তরের জন্য। আমি বললুম ঃ মিউজিয়মে দেখবার জিনিস নেই এ কথা বলি কী করে? এক শো বছরের পুরনো এই মিউজিয়ম। আর যা দেখবার জিনিস তা যেন অন্য যুগের। অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বৌদ্ধযুগের নানা নিদর্শন। প্রাচীন দ্রাবিড় যুগের, চোল পাণ্ড্য আর পল্লব রাজাদের সময়কারও অনেক কিছু রক্ষা করা হয়েছে এই মিউজিয়মে। এদের সাজাবার ধরনটিও ভারি সুন্দর। তবে আর্ট গ্যালারি এই সেদিনের। বছর কয়েক আগে পণ্ডিত নেহরু এর উদ্বোধন

করেছিলেন। কিছু প্রাচীন ছবি আর ব্রোঞ্জ আছে দেখবার মতো। তবে এ সব তো ফেরার পথে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আমি সোজা অ্যাডিয়ার যাবার নির্দেশ দিলুম। থিওসফিকাল সোসাইটি দেখব।

স্বাতি বলল: পণ্ডিত জওহরলালের আত্মজীবনীতে পড়েছি যে তিনি তেরো বছর বয়সে থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেম্বার হয়েছিলেন এবং তাঁর বাবা মতিলালও থিওসফিস্ট ছিলেন। যত দূর মনে পড়ছে, থিওসফি তাঁর ভাল লাগে নি।

তারপর বলল: থিওসফি সম্বন্ধে এর বেশি খবর আমি রাখি নে। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করেও বেশি কিছু জানতে পারি নি।

থিওসফির জন্মকথা আমার অজ্ঞাত নয়। হেলেনা পেট্রোভনা ব্ল্যাভাট্স্কি রাশিয়ার মেয়ে, জীবনদর্শনে তাঁর অগাধ জ্ঞান। শোনা যায় যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি সমাহিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে হিমালযের সাধু সংঘ তাঁকে ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা ও প্রসারের জন্যে একটি সমিতি গঠন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করবেন আমেরিকার ধীমান্ কর্নেল হেনরি অলকট। অলকট তখন মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। উনিশ বছর বয়সে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেইশ বছর বয়সে স্থাপন করেছেন কৃষি-বিদ্যালয়, আর প্রাপ্ত-বয়সে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদের মোহ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি নিজের সংকল্প থেকে। এই বছরই সতরই নভেম্বর এই দুই মহাত্মা নিউ ইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। এঁরা ভারতবর্ষে আসেন বছর চারেক পরে। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে এই থিওসফিক্যাল সোসাইটির মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয় মাদ্রাজের এই অ্যাডিয়ারে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। পৃথিবীতে আছে এত দেশ যেখানে এই সোসাইটির মূল কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারত, কিন্তু বিশ্বের দুই গোলার্ধের দুটি মানুষ, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী, এক মত হয়ে ভারতকে এই মর্যাদা দিলেন। এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে না কি! এক খানিকটা উত্তর পাওয়া যায় ডক্টর অ্যানি বেসান্তের জীবনালোচনায়। ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কি

তাঁর 'সিক্রেট ডক্‌ট্রিনে' সকল ধর্মের সূক্ষ্মতম দর্শন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আর এই বই পড়েই বেসান্তের ধারণা হয় যে ভারতবর্ষই সত্যিকার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দেশ, আর এই ভারতের আকাশেই হবে নতুন যুগের সূর্যোদয়। সত্যিই এ কথা তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই ভারতে এসে ভারতকে ভালবাসলেন ভারতীয়ের মতো। যে ভারত তার ঐতিহ্য ভুলে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে অন্ধ হতে চলেছিল, সেই ভারতকে শোনালেন তার ঐশ্বর্যের কথা। তিন শো তিরিশখানা বই লিখেছেন তিনি। হিন্দুর ধর্ম মন্ত্রতন্ত্র মূর্তিপূজা সাকার-নিরাকারবাদ কর্ম ও জন্মান্তরবাদ সহজ ভাষায় শোনালেন সাধারণ লোককে। বিদেশীর কাছে যা ছিল রহস্যের মতো নিরর্থক, থিওসফির রঞ্জনরশ্মিপাতে তা স্বচ্ছ মনোরম হয়ে উঠল। আজ রাশিয়ার মাদাম ও আমেরিকার কর্নেল গত হয়েছেন। এ দুটো দেশের দূরত্বও বেড়ে গেছে অকস্মাৎ অভাবনীয় রূপে। সংঘাত বেধেছে তাদের আদর্শে। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য ম্লান হয় নি, সারা বিশ্ব আজ ভারতের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে।

আমাদের গাড়ি চলেছিল স্যানটোম হাই রোড ধরে। মামা জিজ্ঞেস করলেন: থিওসফি সম্বন্ধে কিছু পড় নি?

বললুম: পড়াশুনো করি নি, তবে আলাপ আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলুম। আমার এক মহারাষ্ট্রী বন্ধু ও তাঁর স্ত্রী এই সোসাইটির মেম্বার ছিলেন।

স্বাতি বলল: থিওসফি কি একটা স্বতন্ত্র ধর্ম?

আমি বললুম: থিওসফিস্টের কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। সকল দেশের সকল জাতের সকল ধর্ম ও বর্ণের স্ত্রীপুরুষ এক সর্বজনীন উদার মনোভাব নিয়ে সকল ধর্মের আলোচনা করেন।

দেশ কাল পাত্র ও ধর্ম এখানে বড় নয়, বড় হল তাঁদের পক্ষপাতশূন্য ভ্রাতৃত্ববোধ। নিষ্ঠার সঙ্গে সকল দেশের ধর্ম ও দর্শনের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আপন আপন ঐতিহ্যের প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই বাড়ে না, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর আস্থাও আসে। ব্রহ্মজ্ঞান বড় কথা, কিন্তু

আমরা সকলেই অনুভব করি যে আমাদের প্রতিদিনের জ্ঞানের বাহিরে আরও কিছু জানবার জিনিস আছে, যা জানতে পারলে জীবনমৃত্যুর রহস্য সরল হয়ে যেত, একটা পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের উপলব্ধি হত। এই তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা নানা দেশে নানা রকম। কেউ বলে রহস্যবাদ, কেউ বলে সুফিবাদ, আবার কেউ বলি ডিভাইন উইসডম। থিওসফিতে এই সনাতন জ্ঞানেরই অন্বেষণ, যে কোন ধর্মের মাধ্যমে যে কোন দর্শনের ভিত্তিতে যে কোন বিজ্ঞানের সাহায্যে এই পরম সত্যের সন্ধান। জি. এস. অরুণডেল একে সংক্ষেপে বলেছেন, God's knowledge of himself। মানবাত্মার সেই শাশ্বত প্রার্থনা—

অসতো মা সদ গময
তমসো মা জ্যোতির্গময
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

—অসত্য থেকে আমায় সত্যে নিয়ে যাও, আঁধার থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মূর্তি, তারই দ্বারা আমায় সর্বদা রক্ষা কর।

অ্যাডিয়ার নদীর উপর এলফিনস্টোন ব্রিজ পার হয়ে আমরা অ্যাডিয়ারে প্রবেশ করলুম। খানিকটা এগিয়েই সোসাইটির ফটক। অনেকখানি জমির উপর ছড়ানো এই সমিতির বাড়িগুলো। ফটক পেরিয়ে দু ধারের বাগান দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলুম। এদিকে ক্ষুদ্র নদীটি মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে, ওধারে দিগন্তবিস্তৃত সাগরের অবিশ্রাম কলোচ্ছ্বাস। ভিতরে গাছে ও ছায়ায় মেঘে ও মায়ায় জাদু ঘনিয়ে আছে। এমন যেন আর কোথাও আমরা দেখি নি।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমরা সব দেখতে লাগলুম। একজন ভদ্রলোক ইংরেজীতে আমাদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ভারতে

স্বাধীনতার জন্যে প্রথম লড়াইয়ের যুগে ডক্টর অ্যানি বেসান্তের চেষ্টায় এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। ভারত তখন বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণ করে নিজের ঐতিহ্য ভুলতে শুরু করেছে। সে সব দেশ মাটি চায়, সোনা চায়, প্রভুত্ব চায। এমন ভীষণ লোলুপ ভাবে চায় যে সত্য আলোক ও অমৃতের জন্যে মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তা ক্রমেই প্রচ্ছন্ন হয়ে তাদের উদ্দাম করে তুলছে। এরই নাম মৃত্যু। এই প্রলোভনের দিনে এই ক্ষমতার মোহের দিনে যাঁরা অন্ধত্বকে 'বিনিপাত' বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁরাই এই থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সত্যকে আমরা সকলেব বড় ধর্ম বলে মানি, আর বিশ্বাস করি বিশ্বমানবতায়। Theosophy is the Order of Life, the Law of Life, the Purpose of Life, and Theosophy is the Science of Freedom, the Science of Friendship.

ভদ্রলোক বললেন: আমরা সকল দেশের সকল ধর্মের লোক এসে এই সোসাইটিব প৽তাকাতলে জড়ো হয়েছি। আমাদের মতান্তর আছে, কিন্তু মনান্তর নেই।

আমরা তাদের মেডিটেশন হল দেখলুম। দেখলুম যে সকল ধর্মের সিম্‌বল উৎকীর্ণ করা আছে দেওয়ালের গায়ে। তাদেব লাইব্রেরি দেখলুম পাশেই। দেখলুম কত হাজার বছরের পুরনো বই আর তালপাতার পুঁথির অমূল্য সংগ্রহ। তালপাতা আর ভূর্জপাতার পুঁথিই শুনলুম আঠোরো হাজার। দেখলুম তাদের গার্ডেন অব রিমেম্‌ব্রান্স, আর তার মধ্যে ডক্টর অ্যানি বেসান্ত ও কর্ণেল অলকটের সমাধি। বেসান্ত স্কুল, অতিথিশালা আর দু শো বছরের প্রাচীন বটগাছও দেখলুম। ভদ্রলোক বললেন: চল্লিশ হাজার ফুট ছায়া বিস্তার করে আছে এই বটগাছ, ভারতের তিনটি বিরাট বৃক্ষের এটি অন্যতম।

কী অনাবিল প্রশান্তি তার নিচে, মূক প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার কী অপরিসীম আশ্বাস। এই গাছের নিচে বসে অনেকে বিশ্রাম করছেন, বই পড়ছেন নিবিষ্ট মনে। আমরাও বসলুম খানিকক্ষণ। ভদ্রলোক বললেন যে পৃথিবীর ছাপ্পান্নটি দেশে এই সোসাইটির শাখা আছে, আর

এর সদস্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। জন্মাবধি এই থিওসফিকাল সোসাইটি ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে আর তার সাংস্কৃতিক জীবনে কী প্রেরণা এনেছিল, আজ এই সোসাইটি কী উপায়ে সেই আলোটুকু প্রজ্বলিত রেখেছে, কী পড়ানো হয়, আর উৎসব হয় কোন্ কোন্ দিনে, তার একটা বিরাট তালিকা দিলেন আমাদের।

আমি ভাবছিলুম ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কির সিক্রেট ডক্‌ট্রিনের কথা। ভারতের সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। তিনি কি জাতিস্মর? আমাদের নিত্যকালের ধ্যানের বীজ ছিল কি তাঁর ভাবনার ধারায়?

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

'বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করছেন, তেমনই তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করছেন—তাঁর প্রেরিত এই জগৎ দিয়ে সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি, তাঁর প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়ে সেই চেতনাস্বরূপকে ধ্যান করি।'

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১৩

থিওসফিক্যাল সোসাইটি থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এলুম, বেলা তখন পড়ে আসছে। মামা ও মামী দুজনকেই বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললুম : ঘুরে ঘুরে বোধ হয় ক্লান্তি এসেছে আপনাদের, এবারে ফেরা যাক।

মামী বললেন : দুপুরে ওঁর একটু গড়ানো অভ্যেস কিনা, তাই এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

মুখের পাইপটা সরিয়ে মামা বললেন : তোমার তো দুপুরে ক্ষেত চষার অভ্যেস!

মামী বললেন : আমরা মেয়ের জাত, সব কিছুই আমাদের মেনে নিতে হয়।

আমি হেসে বললুম : কলাক্ষেত্র দেখে তা হলে কাজ নেই।

স্বাতি বলল : কলাক্ষেত্র কি আর্ট গ্যালারির নাম?

বললুম : আর্ট গ্যালারি কেন হবে। মাদাম পাভ্‌লোভার ছাত্রী রুক্মিণী অরুণডেলের নাম শোন নি? সঙ্গীত আর নৃত্যের জন্যে যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন! কলাক্ষেত্র তাঁরই স্কুল। কর্ণাটিক মিউজিক ভরতনাট্যম্ আর কথাকলি নাচ শিক্ষা দেওয়া হয়, বোনাও শেখানো হয় এই স্কুলে। এদের অতি প্রাচীন নকশার শাড়ির একটা বিশিষ্ট কদর আছে এদিকে।

স্বাতি যেন লাফিয়ে উঠল, বলল : দক্ষিণী নাচ শেখায় এখানে। আমার অনেক দিনের সাধ এদের নাচ দেখবার।

মামার দিকে ফিরে বলল : তোমার বেশি কষ্ট হবে না তো বাবা?

মামা বললেন : গাড়িতে বসে থাকতে আর কষ্ট কি!

মামীকে স্বাতি বলল : তুমি আর আপত্তি কোরো না মা।

কাজেই সোসাইটির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কলাক্ষেত্রের দরজায় আসা গেল। মামা বললেন: তোমরা দেখে এস, আমি চোখ বুজে তামাকটা একটু উপভোগ করি।

বলে গাড়ির ভিতরেই পা একটু ছড়িয়ে বসলেন।

মামী বললেন: নাচ-গানের মর্ম আমিই বা কী বুঝি! বরং তোমাকে একটু পাহারা দিই।

সেই ভাল।

বলে স্বাতি এগিয়ে গেল। আমি গেলুম তার পিছনে। তারপর থেমে বলল: কী করে আলাপ জমানো যায় বলতো!

বললুম: বলবে, একবার রামগোপালের নাচ দেখেছিলুন কলকাতায়, কী অপূর্ব! সেই থেকে দক্ষিণের নাচ দেখার জন্যে প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে। কিন্তু সাবধান! ভুলেও যেন বালা সরস্বতীর নাম কোরো না। মেয়েদের ব্যাপার, অন্য মেযেব প্রশংসায় হয়তো অফেন্স নিযে ফেলবেন।

স্বাতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে এগিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গেই দেখা হল প্রথমে। বলল: বেশ তো, আজ ভরতনাটামের ক্লাস। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দেব।

আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম কতকগুলো বাদ্য-যন্ত্র। এদের বীণা দেখলুম আমাদের বীণের চাইতে আকারে বড়। সাতটি তার আর চব্বিশটি ঘাট। মনে হল যে এটি অধিক শক্তিধর। অনেক বীণার নাম শুনেছি— বিচিত্রবীণা, রুদ্রবীণা, ব্রহ্মবীণা, ভরতবীণা কচ্ছপী বীণা, শুধু বীণাও আছে, কিন্তু নিজের চক্ষে এ সব দেখি নি। তাই এ দেশেব বীণা কোন্ পর্যায়ে পড়ে জানি না। সাপের ফণার মতো একটি শিঙে দেখলুম আর লম্ব। সানাইএর মতো নাগস্বরম্। বীণার জাতের আর একটি যন্ত্র ছিল পাশে। বেতার জগতে তার নাম দেখেছি গোট্টুবাদ্যম্। এখানকার সেন্ট্রাল কলেজ অব কর্ণাটিক মিউজিকের অন্যতম অধ্যাপক প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ বুদালুর কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রী রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠানে এই গোট্টুবাদ্যম্-বাদন বেতারস্থ করেছেন।

সেই শিক্ষার্থিনী মেয়েটি ভিতর থেকে একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্কা

মহিলাকে নিয়ে আবার বাইরে এল। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর স্বাতির সঙ্গে ইংরেজীতে আলোচনা শুরু করলেন। মহিলা বললেন: কর্ণাটিক মিউজিক আপনার কেমন লাগে?

স্বাতি অকপটে স্বীকার করল যে ভাল লাগে না। বলল: রাগ-সঙ্গীতে আমার অনুরাগ নেই। সঙ্গীতকে যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশের বাহন বলে স্বীকার করি, তবে অত শক্ত বাঁধা-ধরা বিধি-নিষেধ মানতে ইচ্ছে করে না।

মহিলা বললেন: আমি এই রকম উত্তরের আশাই করেছিলুম।

স্বাতি লজ্জিত হয়ে বলল: কেন বলুন তো?

মহিলা বললেন: উত্তর ভারতে খেয়াল গানের বেপরোয়া প্রচলনই ধ্রুবপদী সঙ্গীতের দাম কমিয়েছে, এই আমার বিশ্বাস।

এই মন্তব্যটি আমি নূতন শুনলুম, তাঁর যুক্তি শোনবার আগ্রহ হল।

তিনি বললেন: ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে ধ্রুপদের আদর যখন কমে এল, তখন যন্ত্রসঙ্গীত প্রাধান্য পেল তার প্রাপ্যের বেশি। তাই যন্ত্রের অনুকরণ শুরু হল কণ্ঠে। উত্তর ভারতের খেয়ালে এই যন্ত্রসঙ্গীত অনুকরণের নিষ্ঠা আজও অপ্রতিহত আছে। যন্ত্রেরও আদর আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো মানুষের কণ্ঠে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনতে ভালবাসে না। তাই সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গীতে রাগরূপটাই সর্বস্ব নয়, রাগরূপের অতীত আরও একটি স্তর আছে। সেটি আয়ত্ত হলে সব সঙ্গীতেরই মাধুর্য ধরা পড়ে। দক্ষিণ ভারতে ঘরানার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আমরা বিবাদ করি নে, প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতই আমরা সত্যিকার নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করে থাকি। এ কথা বললে গর্ব করা হবে না যে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের আমরাই এখন প্রকৃত উত্তরাধিকারী। রাগ সঙ্গীতের জন্যেও মধুর কণ্ঠ চাই, তানের ব্যবহার হওয়া উচিত পরিমিত। শ্রোতারা গান শুনতে এসেছে, গলাসাধা শুনতে আসে নি—গায়কের একথা মনে রাখা দরকার। আপনাদের রবীন্দ্রনাথ শুনেছি অনেক ধ্রুপদ খেয়াল ও খেয়ালাঙ্গ গান লিখেছেন বাংলায়। রাগ সঙ্গীতের প্রচণ্ড বিদ্বেষীরাও সে গান শুনছেন প্রচুর আগ্রহ নিয়ে। তার

কারণ আর কিছুই নয়—সে রাগ সঙ্গীতে মধুর কণ্ঠ আছে, আর আছে পরিমাণ জ্ঞান। অর্থহীন যন্ত্রসঙ্গীতের মতো তার তাল ইনিয়ে-বিনিয়ে সাধারণ শ্রোতাকে ক্লান্ত করে না।

স্বাতি নাচের কথা শুনতে এসেছে। বলল : দক্ষিণ-ভারতের নাচের তুলনা আমি দেখি নে। আমার সেই সম্বন্ধেই জানবার আগ্রহ বেশি।

মহিলাটি হাসলেন। বললেন : কথাকলি মালাবারের নিজস্ব সম্পত্তি। আপনি যদি সেদিকে যান, তবে সেদিকেই সে নাচ দেখবেন। আমি আপনাকে ভরতনাট্যম্ সম্বন্ধে কিছু বলি। আজ আমাদের ভরতনাট্যমের চর্চা। ইনিও এই নাচ শিখছেন।

বলে পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে দিলেন।

তারপর বললেন : দক্ষিণী নৃত্যের ওপর প্রাচীন বই আছে। একটি ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও দ্বিতীয়টি নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ। তাঞ্জোরের শিবমন্দিরে দেবদাসীরা যে নৃত্যপদ্ধতি অনুসরণ করেছে, তা ভরতের নাট্যশাস্ত্রানুগ। দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে তখন দেবদাসীদের নৃত্য হত, কিন্তু অনাচার ও যথেচ্ছাচারের জন্যে এক সময় এই নৃত্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ধ্রুবপদী নৃত্যের আদর বেড়েছে অল্পদিন। গুরু মীনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাই কবি ভাল্লাঠোল প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পী এবং কয়েকজন নর্তকী এই ধ্রুবপদী নৃত্যকে আবার তার ন্যায্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বালা সরস্বতীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, ইনিও এক দেবদাসী-পরিবারসম্ভূত, তাঁর ঠাকুরমার কাছে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন।

ভরতনাট্যমে মুদ্রার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও রসানুযায়ী নানা মুদ্রা আছে। হাতের শাখামুদ্রাগুলি প্রধানত সংযুক্ত ও অসংযুক্ত। সংযুক্ত মুদ্রায় দুটি হাত মিলিত ভাবে একটি ভাব প্রকাশ করে। পতাকা মুদ্রা আট রকমের, এতে হাতের পাতা খুলে মুদ্রার বিকাশ। মুষ্টি মুদ্রাও আট রকম, এতে হাত মুষ্টিবদ্ধ। হাতের পাতা অঞ্জলির মতো করে পদ্মকোষ মুদ্রা, তাতে আঠারোটি ভঙ্গি। এ ছাড়াও স্বতন্ত্র মুদ্রা আছে তেইশ রকম। মুদ্রা

নিয়ে ভরত ও নন্দিকেশ্বরে মতভেদ আছে, ভরতনাট্যম্ ও কথাকলিতে পার্থক্যও আছে কিছু কিছু। আবার এই সব মুদ্রার জটিলতা না শিখেও নাচ শেখা ও বোঝা দুইই চলে। এইবার আপনাকে ভরতনাট্যমের একটা উদাহরণ দিই।

বলে শিক্ষার্থিনী মেয়েটিকে তাঁর নিজের ভাষায় কিছু নির্দেশ দিলেন। মেয়েটি সামনে উঠে এসে পা দুটি জুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাত দুটি কটিদেশে নাভির সামনে, মুখ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে।

মহিলা বললেন: আমরা আলাবিপ্পু দিয়ে ভরতনাট্যমের সূচনা করি। বোল—থাই জাগ্ থাই হি থাই দিদি থাই ইত্যাদি।

মেয়েটি নাচ শুরু করেছে। পা মুড়ে নিচু হযে হাত দুটো আনল বুকের কাছে। গ্রীবা বৈকল পাশ থেকে পিছনে ও হাত দুখানা প্রসারিত করল শরীরের দু ধারে। তারপর নমস্কারের ভঙ্গিতে দু হাত যুক্ত করল চিবুকের নিচে। তারপরেই দুটো হাত নিজের দক্ষিণে একত্র প্রসারিত করে দিল অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে। আবার নমস্কার। তারপর 'একটু সবুর সবুর' ভঙ্গি। তারপর ব-এর আকৃতি দুখানা পায়ের একখানা উঠল শূন্যে। হাতের একখানা সবুর, আর একখানা সাঁতারের ভঙ্গি। তারপর সাঁতারের হাতখানা সবুর আর সবুরের হাতখানা দুমড়ে বুকের কাছে এনে পাঁচটা আঙুল মেলে চেয়ে দেখল। তখন দুটো পা আবার ব-এর মতো। এর পরে ডান পায়ে লাথি ছুঁড়ল আর বাঁ হাত নিচে থেকে তুলে আনল মাথার উপর। ডান হাতে সবুর ভঙ্গি, আর মাথা তুলে দেখল নিজের বাঁ হাতের মুদ্রা। এর পর দুটো পা মাটিতে তুলে একটু ডান দিকে ঝুঁকে যেন প্রশ্ন করার ভঙ্গি—কেমন দেখলে নাচ? বাঁ হাত নিজের বুকের কাছে আর ডান হাত দর্শকের দিকে।

মেয়েটি থামল।

মহিলা বললেন: এর মানে কি হল বুঝলেন?

স্বাতি ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে বুঝতে পারে নি।

মহিলা বললেন: ফুলের পাপড়ি যেমন একটি একটি করে খোলে, সুরের আলোক স্নানে তেমনি করে ফুটে ওঠে আমাদের দেহ।

মেয়েটিকে আর একবার নির্দেশ দিয়ে বললেনঃ এইবারে এই আলারিপ্‌পু নাচ শেষ হচ্ছে দেখুন।

মেয়েটি পা ছুটো ব-এর মতো করে হাত ছুটো ছু ধারে বিস্তার করে নাচ শুরু করল। শেষ করল পা জুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছু হাত ছু দিকে ছড়িয়ে। ভাবখানা—কেমন দেখালুম নাচ?

স্বাতির দিকে তাকিয়ে মহিলা হাসলেন এবার। বললেনঃ এর পর জাতিস্মরম্‌ নৃত্য। সঙ্গে রাগ শঙ্করাভরণ চক্রভাগম্‌ বসন্ত টোরী বা ভৈরবী। তার পরের নৃত্য শব্দমে বৈষ্ণব রস পরিবেশন। চতুর্থ নৃত্য বর্ণম্‌ হচ্ছে বৃহৎ এবং জনপ্রিয়। গায়ক টোরীকল্যাণী বা রাগমল্লিকায় বিষ্ণুর কোন উপাখ্যান গাইবেন, আর নর্তকী তাঁর নাচের মাধ্যমে সেই গল্পটি দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন। নাচ সম্পূর্ণ হবে তিল্লানায়। এসব নাচে ত্যাগরাজের গানই আমরা ব্যবহার করি।

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। আমার দিকে ফিরে স্বাতি বলল: ওঁরা বোধ হয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বললুমঃ ব্যস্ত হবারই কথা।

ব্যাপারটা শুনে মহিলা যেন লজ্জায় মরে গেলেন। বললেনঃ আমার অবহেলার জন্যেই এমন হল। চলুন, তাঁদের ঘরে এনে বসাই।

আমি বললুমঃ আপনি লজ্জিত হবেন না। সারা দিন ঘুরে ওঁরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাইতেই ওঁরা নামেন নি।

মহিলা বললেনঃ আমরা এখানে তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতাম।

স্বাতি বললঃ আজ আমরা উঠি. যদি সময় পাই কাল আবার বিরক্ত করতে আসব।

আমি অজস্র ধন্যবাদ জানালুম। মহিলা আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে বার বার নিজের অপরাধের কথা বলে সকলকেই লজ্জা দিলেন।

পথে অন্ধকার নামতে আর দেরি নেই। বড় শান্ত স্তব্ধ মনে হল এই অঞ্চলটা। কতকটা পাড়াগাঁয়ের মতো। স্টেশনে ফেরার পথে নাচের গল্পই শুরু হল। মামী বললেনঃ কী দেখলি ভেতরে?

স্বাতির ঘোর তখনও বোধ হয় খানিকটা ছিল। সংক্ষেপে বলল নাচ।

তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বলল : একটা জিনিস লক্ষ্য করে গোপালদা ? আমাদের নাচের মতো এদের ভঙ্গি তেমন লীলায়িত নয় ঢেউএর মতো সহজ দোলা নেই এদের দেহে। কেমন যেন কাঠ কাঠ ভাব জ্যামিতির ফিগারের মতো কঠিন আর তীক্ষ্ণ।

মামা বললেন : এ যুগের নাচ দেখতে আমার কষ্ট হয়। মানুষ প্রথ নেচেছিল মনের উল্লাসে, নিজের আনন্দের ভাগ অপরকে দেবার জন্যে এই নাচের তাল ছিল না, শাস্ত্র ছিল না। তারা ভরতের নাম শো নি কোন দিন। এ নাচ আজও আছে আমাদের চোখের আড়ালে ফসল-কাটা বা নবান্নের আনন্দে নাচে সাঁওতাল কোল ভীল। না বৃষ্টির আশায়, নাচে দেবতার কৃপার জন্যে। সেও নাচ আর কত্থক নাচ। তবলার তালের সঙ্গে পা ঠুকে ঠুকে মরে মেয়েগুলো। নাচ কখন পরাধীন হয় ?

আমি হেসে বললুম : আপনার জনপদ নৃত্য ভাল লাগবে—গুজরাতে গরবা উত্তর ভারতের কাজরী বা মণিপুরের রাসলীলা।

স্বাতি রুখে উঠল, বলল : মণিপুরের রাসলীলাকে তুমি উচ্চাঙ্গ নৃত বলে স্বীকার কর না ?

বললুম : জনপদ নৃত্যের মধ্যে রাসলীলাতেই শিক্ষা ও সাধনা প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি, এর আঙ্গিকও উন্নত ধরনের। তার জন্যেই যদি একে উচ্চাঙ্গ নৃত্য বল, তাতে আমি আপত্তি করব কেন ! তবে এই সম নৃত্যের মূলে ধর্মপ্রেরণা, তাই সুমার্জিত, আঙ্গিকও ভাল। শু পুনরাবৃত্তিবহুল বলে ক্লান্তিকর। মামাবাবু যে স্বতঃস্ফূর্ত নাচের ক বলছিলেন, প্রাণ প্রাচুর্যের জোরেই সেই নাচ আজও সমান আনন্দ জোগাচ্ছে।

স্বাতি বলল : মালাবারে কৈকট্টকলি বলে এক ধরনের জনপদ নৃত্যে নাম শুনেছিলুম। সেই কৈকট্টকলিই কি কথাকলি ?

বললুম : কৈকট্টকলির কথা শুনি নি। তবে কথাকলি উচ্চাঙ্গ নৃত

বলে প্রচলিত হলেও জনপদ নৃত্যের অনেক সাধারণ গুণ আছে এতে। একে নৃত্য না বলে নৃত্যনাট্য বললে হয়তো ভাল হত। কেন না অভিনয়ের প্রাধান্যই এতে বেশি।

রামায়ণ ও কথাকলিতে শুনেছি মহাভারতের উপাখ্যানের অভিনয় হয়। পেছন থেকে দুজন গায়ক গান গায়, আর তবলা বা মন্দিরার তালে তালে নটনটীরা নাচে। তাদের প্রসাধনেরও একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। চার বছর ধরে তা শিখতে হয় ও চার ঘণ্টার দরকার হয় সেই প্রসাধন সমাপ্ত করতে। মুখোশ একটা অপরিহার্য জিনিস। অভিনয়ের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক চরিত্রানুযায়ী মুখোশ ও প্রসাধনের পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। এতে শাখামুদ্রার সংখ্যা বেশি, রেচক ও ভ্রূবিলাসেরও নানা ভঙ্গি। সব মিলে এমন একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যে অনেক সাধনা করে এ নাচ শিখতে হয়। মেয়েরা ন-দশ বছর থেকে এ নাচ শিখতে শুরু করে, তারপর অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে অনেক বয়সে একে আয়ত্ত করে বলে শুনেছি। ভরতনাট্যমের মতো মালাবারের মোহিনী-নাট্যম্ নাকি এক কালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এখন আব এ নৃত্যের আদর তেমন নেই।

স্বাতি বলল ঃ ওদিকে গেলে আমবা কথাকলি দেখবার চেষ্টা করব।

১৪

আমাদের ট্যাক্সি তখন মাউন্ট রোড ধরে ফিরছিল। রাস্তায় তখন আলো জ্বলেছে। উজ্জ্বল আলোয় দোকানপাট কাফে আর হোটেল সব ঝলমল করছে। সেদিকে লক্ষ্য করে মামার চায়ের কথা মনে পড়ল বললেন ঃ মোগলের হাতে পড়ে আজ আর চা জুটল না!

মামী বললেন ঃ খেয়ে নাও না কোনও দোকানে।

পরামর্শটা সকলেরই পছন্দ হল। আমরা দাঁড়ালুম একটা কাফের সামনে।

চা খেতে বসে স্বাতি বলল ঃ আর কী দেখবার রইল গোপালদা?

মামা বললেন ঃ সবই তো দেখা হয়ে গেল।

স্বাতি একটু ভেবে বলল ঃ না মাছের অ্যাকোয়েরিয়াম এখনও দেখি নি

বললুম ঃ কোনও অ্যাকোয়েরিয়ামের কথা তো শুনি নি।

স্বাতি হেসে বলল ঃ তবেই দেখ, তোমার চেয়ে আমি খবর রাখি বেশি।

মামীর দিকে ফিরে বলল ঃ সেই বইটায় পড়েছি না মা?

এইবারে আমি হাসলুম। বললুম ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বই পড়লে তো আর বিংশ শতাব্দীর খবর পাওয়া যায় না! মাদ্রাজের সব মাছ যে বোম্বায়ে চালান হয়ে গেছে তা জান? ১৯৫০এ বোম্বায়ের মেরিন ড্রাইভে খোলা হয়েছে তারাপোরওয়ালা অ্যাকোয়েরিয়াম। চিড়িয়াখানার ভেতর নতুন একটা খুলেছে কি?

চিন্তিত ভাবে স্বাতি বলল ঃ তবে কাল আমরা সারা দিন কী দেখব! চিড়িয়াখানা আর জাদুঘর! ছো!

মামী বললেন ঃ মাদ্রাজ থেকে যারা ফেরে, তারা কত জিনিস নিয়ে ফেরে—পেতল আর চন্দনকাঠের জিনিস, শাড়ি—

বাধা দিয়ে মামা বললেন : যাবার সময় জঞ্জাল আর বাড়িও না। ফেরার পথে প্রাণ ভরে কেনা-কাটা কোরো।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কাঞ্চীপুরমের অপরূপ পল্লব স্থাপত্যের কথা। কিন্তু সরাসরি সে কথা প্রস্তাব করলুম না। বললুম : আমি একটা সাজেশন দিতে পারি।

স্বাতি বলল : সমুদ্রে স্নানের কথা বলবে তো!

বললুম : না।

মামা বললেন : কাঞ্চীর কথা তো তুমি বলবে না—

বললুম : আপনার শখ থাকলে আমি বাধা দেব কেন!

মামা বললেন : তোমার শখের কথাটা আগে শুনি।

বললুম : সকাল সাড়ে সাতটার পরে একটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেন ধরলে কাল সন্ধ্যা বেলায় তাঞ্জোর কিংবা ত্রিচি দেখে নেওয়া যায়। সেখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে ধরা যায় রামেশ্বরের গাড়ি। তাহলে রিজারভেশনেরও আর দরকার হয় না।

মামা চট করে কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু স্বাতি বলে উঠল : অসম্ভব।

অসম্ভব কেন?

কাঞ্চী না দেখে আমরা তাঞ্জোর দেখব! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে গোপালদা!

মামা বললেন : ঠিকই তো, একটা দিন যদি পাওয়া যায় তো আমরা কাঞ্চীই দেখতে পারি।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না, বললুম : একটা জায়গা দেখতে হলে আর একটা জায়গা দেখা হয় না কিনা, তাই বলছিলুম—

মামা বললেন : কেন হবে না! দেখবার জায়গা সবই দেখতে হবে। বলে মামীর দিকে তাকালেন সগৌরবে। আমার দিকে চেয়ে স্বাতি খুশিতে উপচে উঠল। আমি খুশী হলুম অপরিমিত।

চা খেয়ে বোঝা গেল যে আমরা সত্যিই বেশ ক্লান্ত হয়েছিলুম।

স্যাম্‌সনের চুল গজানোর মতো ধীরে ধীরে আমাদের শক্তি ফিরে এল। মামী বললেনঃ বাজার দেখতে তো আর দোষ নেই, জিনিস না হয় নাই কিনলে!

মামার মন তখন প্রসন্ন হয়ে উঠেছে, বললেনঃ তোমার বাজার দেখা মানেই তো বাজারটা বাড়ি নিয়ে যাওয়া!

মামী বললেনঃ বাজারটা বাড়ি নিয়ে আসে কে?

মামা বললেনঃ ঠিকই তো। যার জন্যে চুরি করি, সে-ই তো চোর বলবে!

আমার দিকে ফিরে বললেনঃ পেছনে লেজুড় না থাকলে, বুঝলে গোপাল, আমি এত দিনে শাস্ত্র মতে বানপ্রস্থ নিয়ে হিমালয়ে যেতে পারতুম। বয়স তো পঞ্চাশ হল, বনের বদলে হিমালয়ে গেলে আর কিছু না হোক, এই গরমে এমন ভেপ্‌সে মরতে হত না।

সত্যিই গরমটা যেন এখানে অন্য রকমেব। রাতে বৃষ্টি হযেছিল, মেঘ করে বইল সারাদিন। সূর্যদেব কখন উঠলেন আর কখন ডুবলেন, তা টের পাই নি।

মাদ্রাজের জলবায়ু এখন ভালর দিকে চলেছে। অক্টোবর মাসের শেষ থেকে মার্চের গোড়ার দিক পর্যন্ত এখানকার আবহাওয়া ভাল চলবে। উত্তাপ তখন সাতষট্টি আর আটাশি ডিগ্রীর মধ্যে ওঠানামা করে। বাতাসের আর্দ্রতাও কম। দিনের বেলায় মন্দ গরম, আর রাতগুলো বেশ ঠাণ্ডা। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত বড় বিশ্রী গরম। উত্তর ভারতের মতো গরমের তেজ নেই, এক শো ডিগ্রীর উপরে বড় একটা ওঠে না, কিন্তু জ্বালা আছে। বাতাসের আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশি বলে ঘেমে ভেপ্‌সে ওঠে গা। এমন অস্বস্তিকর গরম আর নেই। এখানে বর্ষা হয় বছরে দুবার। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু জুন-জুলাইয়ের গরমের সময় কয়েকবার বর্ষণ করে যায়, আসল বর্ষা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর কাছে।

মামী হাসছিলেন। শেষটায় বলেই ফেললেনঃ ডুলিতে চেপে না হয় হিমালয়ে উঠলে, তারপর? ওই শরীর তো আর তপস্যা করে হয় নি, না তপস্যা করতে পারবে ঐ শরীর নিয়ে!

হাসলাম আমরাও। কিন্তু মামা চটলেন না। মোটা মানুষের মেজাজ বোধহয় বেশি প্রসন্ন হয়। পাইপে আগুন ধরিয়ে বললেন : তোমার কাছে যে হার মানি, সেই তো মোর জয়।

মামী একটু ভর্ৎসনার সুরে বললেন : বয়েস কি তোমার বাড়বে না?

চায়ের পালা চুকিয়ে আবার আমরা যাত্রা করলুম।

গাড়িতে বসে মামা বললেন : চল গোপাল, বাজারটাই এখন দেখা যাক। তোমার মামীর আপসোস রেখে আর লাভ কী!

বাজারের নামে ট্যাক্সি ড্রাইভার খুশী হল। আজ আর তাকে অন্য যাত্রী ধরতে হবে না। ভাঙা হিন্দী আর ইংরেজী মিলিয়ে বলল : মাদ্রাজের বাজার না দেখলে মাদ্রাজ দেখাই সম্পূর্ণ হয় না। পুরো শহরটাই তো বাজার।

আমি বললুম : পুরো শহরটা দেখাবার দরকার নেই, দু-একটা ভাল দোকানে নিয়ে চল।

ড্রাইভার দুঃখিত ভাবে বলল : বিদেশীরা যেখানে কাড়াকাড়ি করে জিনিস কেনেন, মাউন্ট রোডের সেই ভাল দোকান দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে।

জানা গেল, সে দুটির নাম ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট আর সেণ্ট্রাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম। সেখানে মহিসুরের চন্দন-কাঠের জিনিস, ত্রিবাঙ্কুরের হাতির দাঁতের জিনিস, তাঞ্জোরের নক্‌শা-করা ধাতুর জিনিস, রূপোর কাজ-করা তামার প্লেট, এম্‌বস-করা রূপোর বাক্স, সরীসৃপের চামড়ায় তৈরি মেয়েদের ব্যাগ, সুন্দর নরম মাদুর, বেত আর তালপাতার জিনিস, আরও অনেক শৌখিন জিনিস পাওয়া যায়। তবে এরা অফিসের মতো দোকান খোলে ও বন্ধ করে। সকাল নটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত, মাঝে খাবার ছুটি। ট্রাভলার্স চেকও নেয় এরা।

একটু গলা নামিয়ে আমাকে বলল : আপনাদের জন্যেই এ সব দোকান, আমাদের দেশের লোক বড় একটা যায় না।

রাউণ্ড টানা ঘুরিয়ে দুবার কয়ুম নদী পেরিয়ে সে আমাদের চীনা-

বাজারে নিয়ে এল। নেতাজীকে এরা শ্রদ্ধা করে। তাই চীনাবাজার রোডের নাম দিয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড।

মামী একখানা শাড়ি কিনলেন, কাঞ্চীপুরমের শাড়ি। সাদা সিল্কের উপর জরির পাড় আর আঁচল। বললেন ঃ অগ্রহায়ণে তো স্বাতির বিয়ে, এই শাড়ি পরে জামাই বরণ করব।

সত্যিই এ শাড়ির তুলনা নেই ভারতবর্ষে। আমাদের বেনারসের ব্রোকেডে আছে দামের বিজ্ঞাপন, টিশুতে ফ্যাশনের জৌলুস। সিল্কের বাজারে মুর্শিদাবাদও খানিকটা স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু রেশমি কাপড় যে এখন মজবুত ও মোলায়েম হতে পারে, তা এই প্রথম দেখলুম। দুনিয়ার সমস্ত রঙ একত্র করেছে শাড়ির বাজারে, জরির ভারী আঁচলায় বেঁধে রেখেছে এক অতীত দিনের ঐতিহ্যকে। মনে হয়, যে অনেক যুগ আগে এমনি শাড়ির আঁচল দুলিয়ে মন্দিরে মন্দিরে নাচত দেবদাসী, তাই এত জরির জাঁক আর রঙের ছড়াছড়ি।

স্বাতির একখানা শাড়িও পছন্দ হল না। বলল ঃ অমন গাঢ় রঙ আর ফাঁপা-ফোলা শাড়ি কলকাতায় অচল।

তারপর কটাক্ষে একজন মহিলা খদ্দেরকে দেখিয়ে বলল ঃ ওদেরই মানায়।

মামীর চেয়ে কম বয়েস নয় মহিলার। মোটা কালো দেহের উপর চড়িয়েছে টিয়েপাখীর রঙের সবুজ শাড়ি। নাকের ফুটোতে হীরের নাকছাবি, কানে হীরের ফুল আর খোঁপায় জুঁইয়ের মালা।

স্বাতির কোনও কাপড় পছন্দ হল না বলে দোকানদার বড় আশ্চর্য হল। বলল ঃ আমার দোকান থেকে 'পছন্দ হল না' বলে কেউ ফিরে যায় নি। বিদেশী মহিলাও কিনেছেন কাঞ্চীর শাড়ি। বলেছেন, দেশে গিয়ে ভারতীয় মেয়েদের কায়দায় পরতে না পারলে কেটে ঈভনিং ড্রেস করে নেবেন।

স্বাতি বলল : আমাদের কলকাতায় এর চেয়ে ভাল শাড়ি পাওয়া যায়।

ম্যাট বাজারে মামীর একখানা মাদুর কিনবার শখ হয়েছিল। বেশ

মোটা শক্ত ঘাসের তৈরি মাতুর। ঘরে কার্পেটের মতো এর ব্যবহার চলে। এমন মিহি আর নরম যে রেশমের উপর বসেছি বলে ভ্রম হবে অন্য-মনস্কদের। দোকানদার বলল যে এ মাতুর আসে তিকনেলভেল্লি থেকে।

রতনবাজারে মামী একটা গয়নার দোকানে ঢুকলেন। কোমরের একখানা ভারী বিছে দেখে মা-মেয়ে দুজনেই হাসলেন কিছুক্ষণ। তার চেয়েও আশ্চর্য হলেন মাথার একটা গয়না দেখে। ভারী ভারী রূপোর গয়নাও ছিল, আঙুলের চুটকি আর মল থেকে খোঁপার ফুল পর্যন্ত। মেয়ে বলল: এমন ভারী গয়নাও পরতে পারে এরা।

মা বললেন: কেন পারবে না, আমরাই পরেছি ছেলেবেলায়।

পাঁচ প্রদীপের রূপোর পিলসুজ আর ব্রোঞ্জের নটরাজমূর্তি দেখিয়ে স্বাতি বলল: ড্রয়িং রুমে রাখবার মতো জিনিস।

আর এক জায়গায় বাতাস আকুল হয়ে আছে ফুলের গন্ধে। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বলল: ফ্লাওয়ার বাজার।

মামা বললেন: ফুল দেখে পাগল হবার বয়েস গেছে। ও তোমরাই দেখ।

গাড়ি থেকে নামবার সময় মামী বললেন: ফুল দেবতাদের জিনিস, রাক্ষসেরা ভালবাসতেন বলে শুনি নি।

কথাটি ভাল লাগল। হজরত মহম্মদ বলতেন যে খাদ্য যেমন দেহের ক্ষুধা মেটায়, ফুলের দরকার তেমনি মনের ক্ষুধা মেটাতে। তাই—

"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি।
যদি দুটি জোটে তবে একটিতে
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।"

ইন্দ্রের নন্দনকাননে ফোটে পারিজাত। রাবণের অশোকবনে সীতার অশ্রুতে কোন্ পারিজাত ফুটেছে, তার বর্ণনা করতে ভুলে গেছেন কবি বাল্মীকি।

স্বাতি বলল: এমন অদ্ভুত বাজার দেখি নি কলকাতায়।

ভাল করে দেখে আমিও স্বীকার করলুম যে এমন ফুলের বাজার কল-

কাতায় নেই। সেখানে এখন অ্যাস্টর ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা ওঠে নি, শক্ত ডাঁটার রজনীগন্ধায় আর গ্লাডিওলাসে ভরে আছে নিউ মার্কেটের শো কেসগুলো। লোকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছে ফুলদানির জন্যে। কিন্তু এখানে টেবিলের উপর সাজিয়ে বসেছে মল্লিয়ম্—মানে বেল জুঁই মল্লিকা, আর গোলাপের মালা। ফুলদানি সাজাবার কাট ফ্লাওয়ার নেই কারও কাছে। এক দিকে দোকানীরা বসেছে টুলের উপব, মেয়ে পুরুষ দু দলই, তাদের সামনে ছোট ছোট চৌকো টেবিল। অন্য ধারে খদ্দের সব মেয়েরাই। জুঁই আর বেল ফুলের মালা কিনছে খোঁপার জন্যে। এ দেশের মেয়েরা ফুল এত ভালবাসে! খোঁপায় মল্লিয়মের মালা নেই এমন মেয়ে বোধহয় দেখিনি।

আমাদের দেশে বেল-জুঁইযের দিন ফুবিয়েছে, কুন্দ ফোটে নি। এদেরও তো একদিন ফুবোবে। মেযেবা তখন কী পরবে তাদের খোঁপায়।

ফলের বাজারে মামী কিনলেন অসময়ের আম, কমলালেবু আর লাল কলা। আঙুরের সের বলল চাব আনা। স্বাতি তো স্বপ্ন দেখছে ভাবল। চার আনা সের আঙুরের! আমাদের দেশে যে চার আনার আঙুব চাইতে লজ্জা করে!

আধ সের আঙুর চাইলে ফলওয়ালা আশ্চর্য হল। তারপর ওজন করে দিল আধ সের। গোটা কয়েক মাত্র আঙুর উঠল। স্বাতি বলল: এই তোমার আধ সের!

এই তো আধ সের! ষোল টাকার ওজন যদি এক সের হয়, তবে আট তোলায় আর কত উঠবে!

হেসে আকুল হল স্বাতি।

এস্‌প্লানেড ব্রডওয়ে ঘুরে আমরা ফিরলুম। সেণ্ট্রাল স্টেশনের পর বাকিংহাম খাল পেরিয়ে ড্রাইভার দাঁড়াল। বলল: মুওর মার্কেট একবার দেখে নিন। শ তিনেক দোকানে না পাবেন এমন জিনিস নেই।

একটা চারকোণা জায়গায় অসংখ্য দোকান। তবে স্বাতি বলল: আমাদের নিউ মার্কেটের কাছে লাগে না।

কর্পোরেশনের রিপন বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভার বলল ঃ এর পেছনে আছে পিপল্স পার্ক, কর্পোরেশন স্টেডিয়াম আর জু।

এগমোর স্টেশনে নেমে মামা ট্যাক্সির পয়সা মেটালেন। তারপরে বললেন ঃ এ দেশের লোক দেখছি অনেক ভদ্র। মিটারে যা উঠেছে, তার চেয়ে কম পয়সা নিলে লোকটা। নিজে থেকেই বললে কম দিতে। সারা দিন ঘুরেছি তো, পুরো ওয়েটিং চার্জ না দিলেও চলবে।

মামীও আশ্চর্য হলেন এই কথা শুনে।

সামনের হোটেলের দিকে চেয়ে স্বাতি বলল ঃ খাওয়াটা আজ রুচবে ভাল। সারা দিন যা ঘোরা ঘুরিয়েছে গোপালদা।

বললুম ঃ এখানে সরকারী গাইড পাওয়া যায় টুরিস্ট অফিসে। পাঁচ টাকায় আধ বেলা ঘোরায়। তাদের একজনকে সঙ্গে নিলে আরও ভাল করে সব দেখাত।

মামী বললেন ঃ আমাদের বিনি পয়সায় গাইড যা ঘুরিয়েছে, তার ধাক্কা সামলাতে কদিন লাগে দেখ।

আমি বললুম না যে কাল রাতে স্বাতির গাইড বইগুলো সব পড়ে ফেলেছিলুম। তাইতেই আজ গাইডের কাজ করতে আমার অসুবিধা হয় নি।

রাতে শুতে যাবার আগে মামা বললেন ঃ কাল তোমার ট্রেন কটায় ছাড়বে ?

সময়টা জেনে নিয়েছিলুম। বললুম ঃ সকাল সাতটা চল্লিশে।

স্বাতিকে ধমক দিলেন মামা। বললেন ঃ এখনও শোও নি তোমরা ? শুনতে পাচ্ছ তো কাল কত সকালে বেরতে হবে !

মামী হাসি চেপে বললেন ঃ তোমরা নিজেরা শোও তো গিয়ে।

১৫

আমি আবার থার্ড ক্লাসেই উঠলুম। মামা অনেক জোর করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আসবার জন্যে। অনেক কষ্টে তাঁর অনুরোধ এড়িয়েছি। শুধু তো দেখতে বেরোই নি, দেশটাকেও জানতে চাই। দূর থেকে দেশ দেখা যায়, কাছে না এলে জানা যায় না। আমি দেশের লোকের সঙ্গে পাশা-পাশি বসে দেশ দেখাব লোভটুকু ত্যাগ করতে পারলুম না। মামা বেশ একটু অসন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল।

সাতটা চল্লিশে ছাড়লো শেনকোট্টা প্যাসেঞ্জার। কাল রাতেই আমরা রিজারভেশন অফিসে বলে রেখেছিলুম যে চিঙ্গলপুট স্টেশনে আমরা ইণ্ডো-সিলোন এক্সপ্রেস ধরব। তারা লিখে নিয়েছিল এই কথা।

গাড়ি আমাদের কয়ুম নদী পেরিয়ে দক্ষিণমুখো হল। কোডম্বকম্ মাম্বলম্ সৈদাপেট ডিঙিয়ে অ্যাডিযার নদী, তারপর গুইণ্ডির রেসকোর্স। আরও এগিয়ে সেণ্ট টমাস মাউণ্ট আর মিনাম্বকমের এয়ারোড্রোম।

যাত্রীদের দেখছিলুম এতক্ষণ, কিন্তু আলাপ শুরু করবার মতো সঙ্গী পাই নি। এক ভদ্রলোক ধুতির লুঙ্গির উপর শার্ট পরেছেন আমেরিকান কফের, পায়ে চটিজুতো। একটা কোণে বসে নোটবুকে কী সব লিখেছিলেন একাগ্র ভাবে। মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে দেখছিলেন। মনে হল, হয় কবিতা লিখছেন, নয় হিসেব লিখছেন ভেবে ভেবে। চেহারাটা হিসেব লেখারই মতো। গাড়ির অন্য যাত্রীরা নানা রকম গল্পগুজব করছে নিজেদের ভাষায়। মনে হল না যে এরা কেউ অন্যের ভাষাতেও কথা কইতে পারে।

মাদ্রাজের বই-এর স্টলে দক্ষিণ ভারত নিয়ে লেখা কোন বই পাই নি। তারা বললে যে এরকম বই কেউ লেখেন নি। একখানা টাইম-টেবল সংগ্রহ করেছিলুম, তাতেই মনোনিবেশ করলুম। চিঙ্গলপুট পৌঁছবে পৌনে নটায়। কাজেই আরও দেড় ঘণ্টা একা কাটাতে হবে।

টাম্বরমে গাড়ি দাঁড়াল। ভাবলুম, স্বাতির কাছ থেকে একখানা বই চেয়ে আনি। মামার গাড়ির কাছ অবধি গিয়ে ফিরে এলুম। মামা কথা বলেন জোরে জোরে। মামীকে উপদেশ দিচ্ছিলেন শুনতে পেলুম, আদর-যত্ন কর ক্ষতি নেই, তাই বলে মাখামাখিটা কোরো না।

কার সম্বন্ধে এ মন্তব্য করলেন তা বুঝতে পারি। কিন্তু কেন এই উপদেশের দরকার হল তা জানিনে।

গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। আমি ফিরে এলুম নিজের কামরায়। আমার সহযাত্রী ভদ্রলোক তাঁর হিসেব লেখা শেষ করেছেন, বোধহয় একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন গল্প করবার জন্যে। আমি ফিরে আসতেই বললেন: তবু ভাল যে আপনি ফিরে এলেন। আমি ভাবলুম, বুঝি বা নেমেই পড়লেন এখানে।

বললুম: বেশিদূর যাব না।

ভদ্রলোক বললেন: আমার চেয়ে কম নয় নিশ্চয়ই। আমি তাঞ্জোরে যাচ্ছি।

আমি হেসে বললুম: আমরা চিঙ্গলপুটে নামব, যাচ্ছি কাঞ্চীপুরম।

ভদ্রলোক সোৎসাহে বললেন: আপনি বুঝি টুরিস্ট! কোথা থেকে আসছেন?

বললুম: বাঙলা থেকে।

এতক্ষণ ইংরেজীতেই কথা হচ্ছিল, এবারে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ভদ্রলোক তাকালেন আমার দিকে। বললেন: বাঙলা আপনার দেশ! আপনি গর্ব করতে পারেন আপনার দেশ নিয়ে।

মনে মনে ভাবলুম, সে বাঙলা কি আজ আর আছে! বাঙলার গৌরব তত দিন ছিল, যত দিন তার আত্মপ্রত্যয় ছিল। আজ অতীতের গৌরব আঁকড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে নতুন জন্ম নেওয়া ভাল। কিন্তু চাটুবাদ ভাল লাগে। বললুম: আপনারা আজ আমাদের ধরে ফেলেছেন, কতক ক্ষেত্রে এগিয়েও গেছেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: কাঞ্চীতে কতদিন থাকবেন?

বললুম ঃ একদিনও না। কয়েক ঘণ্টা পরেই আমাদের ফিরতে হবে।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন, বললেন ঃ এত কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করে এত দূরে বেড়াতে এসে এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেন! কত হাজার বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এই কাঞ্চী। কত রাজ্য ও রাজা, কত ধর্ম ও বিশ্বাস, কত মহামানব ও পণ্ডিতের ইতিহাসে উজ্জ্বল এই কাঞ্চী। আমার নিজের দেশ বলে বলছি না, ভাল করে কাঞ্চী না দেখে ফিরলে আপনার দক্ষিণ ভারত দেখা সম্পূর্ণ হবে না।

তারপরে ভদ্রলোক আমাকে কাঞ্চীর গল্প শোনালেন।

কাঞ্চীপুরম মানে কাঞ্চনপুর—সোনার শহর। কাঞ্চীপুরমকে অনেকে দক্ষিণ কাশীও বলেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন ঃ দক্ষিণে দক্ষিণ কাশী অনেক। কেউ কুম্ভকোনামকে দক্ষিণ কাশী বলেন, কেউ তিরুবিল্লমলয়কে। ত্রিবাঙ্কুর যাবার পথে তেনকাশী নামে একটি স্টেশন পাবেন। তেনকাশীর মানে দক্ষিণ কাশী। এ দেশে দক্ষিণ মথুরা আছে, দক্ষিণ দ্বারকা আছে, দক্ষিণ মক্কাও আছে। মাতুরাকে আমরা দক্ষিণ মথুরা বলি। মান্নারগুড়িকে দক্ষিণ দ্বারকা, আর দক্ষিণ মক্কা বলি মহিশূরের বুদনকে। অনেক শহরের ইংরেজী নামও আছে। যেমন কুম্ভকোনামের নাম ক্যাম্ব্রিজ অব ইণ্ডিয়া আর মাতুরার নাম এথেন্স অব ইণ্ডিয়া। সপ্তপুরীর নাম শুনেছেন তো?

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

কাঞ্চী এই সপ্তপুরীর অন্যতম।

এই কাঞ্চী যে কত কালের পুরনো শহর, আজও তার হদিস পাওয়া যায় নি। শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেও এই শহরের প্রতিপত্তি ছিল এই দেশে। আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ এই নগরবাসীকে নাকি ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তার পরে সম্রাট অশোক এই শহরের চারিদিকে স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তোড়ল তন্ত্রে কাঞ্চীর উল্লেখ আছে বলে শুনেছি।

নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটি দেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥

বৃহন্নীল তন্ত্রেও আছে—

কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যাদবন্ত্যামতিপাবনী।

তন্ত্রের নাম ও শ্লোকগুলি আমি পরে সংগ্রহ করেছিলুম। এই ভদ্রলোক আমাকে স্থল পুরাণের গল্প শুনিয়েছিলেন। তারপরে বলেছিলেন: ভারতের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এর ওপর দিয়ে যে কত ঝড় বয়ে গেছে, তার হিসেব নেই। তার সাক্ষ্য এর মন্দিরে মূর্তিতে স্থাপত্যে ও চারুকলায়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন চাঙ এসেছিলেন এ দেশে। কাঞ্চীকে বলেছেন কি-এন-চি-পু-লো। অনুমান করেছেন যে গৌতম বুদ্ধের চেয়েও প্রাচীন এই শহর। বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ দিঙ্‌নাগ বোধিধর্ম ও ধর্মপাল জন্মেছেন এই কাঞ্চীতে। জৈন প্রতিপত্তিও হয়েছিল এই অঞ্চলে। কাঞ্চীর দু মাইল দূরে তিরুপ্পরুত্তিকুণ্ড্রম্ আজও জৈনদের একটি তীর্থস্থান। দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি তাদের মন্দিরটি স্থাপত্য ও চিত্রকলার জন্যে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বেগবতী নদীর দক্ষিণ তীরে এ জায়গা এখন জৈন কাঞ্চী নামে পরিচিত।

ভদ্রলোক আমাকে কাঞ্চীর ইতিহাস শোনালেন।

পল্লব যুগ চতুর্থ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত। পল্লব যুগের পূর্বের ইতিহাস সামান্য কিছু পাওয়া গেলেও জানা যায় যে পল্লব রাজারাই কাঞ্চীকে তাঁদের রাজধানী করেছিলেন। তাঁদের সময়েই কাঞ্চী সারা দক্ষিণ ভারতে শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সভাতেই ছিলেন কবি ভারবি ও দণ্ডী। এই পল্লব রাজাদের সময়েই কৈলাসনাথ ও বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। কৈলাসনাথের মন্দিরটি ভারতের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম। ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ রাজসিংহের রাজত্বকালে এই মন্দিরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। পল্লব স্থাপত্যের এমন অপূর্ব নিদর্শন আর নেই।

এই পল্লব রাজাদের সঙ্গে চালুক্য রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। সাতবাহন বংশের পতনের প্রায় তিন শো বছর পরে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য বংশ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে তোলে। বাতাপীপুর বা বাদামীতে তাদের রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।

তিনিই পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মনকে পরাজিত করে কাঞ্চী পৌঁছলেন। তারপর আরও দক্ষিণে চোল চের পাণ্ড্যদের পরাজিত করে তাদের ওপরও আধিপত্য বিস্তার করেন। পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে তাঁর দূত-বিনিময় হত। আর হিউয়েন চাঙ উচ্চকণ্ঠে তাঁব বীরত্বের কীর্তন করে গেছেন।

৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটল। পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মন পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র বর্মন ও প্রথম পরমেশ্বর বর্মন বাদামী ভোগ করেন। পরে অবশ্য পুলকেশীর পুত্র বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয়ের চেষ্টায় হৃত রাজ্যশ্রী আবার ফিরে আসে। বিক্রমাদিত্য পরমেশ্বর বর্মনকে পরাজিত করে কাঞ্চী অধিকার করেন। পুত্র বিনয়াদিত্য ও পৌত্র বিজয়াদিত্যের সহযোগিতায় চোল চের ও পাণ্ড্যদের আবার পদানত করেন। আনুমানিক ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিযান সার্থক হয়। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য আবার পল্লবরাজ নন্দিপোত বর্মনকে যুদ্ধে পরাজিত করে কাঞ্চীতে প্রবেশ করেন ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এই বিজয়বার্তা অমর করে যান। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটেরা এই চালুক্য রাজ্য ধ্বংস করে।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই পল্লবদের শক্তি কমে যাচ্ছিল ও এক শো বছর পরে চোলরা তাদের নির্মূল করে কাঞ্চী অধিকার করে। তারাও এই জয়ের সাক্ষ্য রেখে গেল আরও মন্দির নির্মাণ করে। কাঞ্চীর মন্দিরগাত্রে পাথরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে এই সব রাজবংশের কীর্তিগাথা।

বিজয়নগরের রাজারা এসেছিলেন সকলের পরে। কী অপূর্ব শিল্পপ্রীতি এই বংশের, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। একাম্বরনাথ-মন্দিরের বিরাট গোপুর তৈরি করেছেন বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়। প্রাচীন ইতিহাসের নানা তথ্যপূর্ণ এত বড় মন্দির আর শহরে নেই। কিন্তু এইটুকুই বিজয়নগরের সব নয়। যদি কখনও সুবিধে পান তো মহিসুর রাজ্যের হাম্পিতে নেমে মতঙ্গ পর্বতের উপর থেকে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখবেন। সিউএল সাহেব তাঁর ফরগটন এম্পায়ারে বা লংহার্স্ট সাহেব তাঁর রুইন্স অব হাম্পিতে আর কতটুকু

বর্ণনা করতে পেরেছেন ! সেখানে গেলে আপনার মনে হবে যে ভারতের শ্মশানে দাঁড়িয়ে তার ঐতিহ্যের শেষ স্মৃতিচিহ্ন দেখছেন।

ভদ্রলোক আবার কাঞ্চীর কথায় ফিরে এলেন। বললেন ঃ এই কাঞ্চী উন্নতির শিখরে ওঠে বিজয়নগরের রাজত্বকালে। আজ যা কিছু আমরা সেখানে দেখি, তার নির্মাণ এই সময়েই সমাপ্ত হয়েছে। একাম্বরেশ্বর ও বরদরাজ পেরুমল মন্দিরে বিজয়নগরের যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আজও অম্লান হয়ে আছে। কাঞ্চীর মৃত্যু হয়েছিল বিজয়নগর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে। মুসলমান ও মারাঠারা অধিকার করল এই দেশ। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজ এ স্থান অধিকার করে নিল। শোনা যায় যে মহিসুরের হায়দর আলির ভয়ে একাম্বরনাথকে মাদ্রাজে আর কামাক্ষী দেবীকে তাঞ্জোরে সরিয়ে নেওয়া হয়। লর্ড ক্লাইভ নাকি শিবকাঞ্চীতে একাম্বরনাথের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাঞ্জোরবাসীদের বাধার জন্যে কামাক্ষা দেবীকে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। শিবকাঞ্চীতে তাই আজকাল নকল কামাক্ষী দেবীর পূজো হচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ ধর্মের সংঘাতও গেছে অনেক। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গিয়ে যখন হিন্দু ধর্ম আবার প্রতিষ্ঠিত হল, তখন শৈবের সঙ্গে সংঘাত বাধল বৈষ্ণবের, শঙ্করাচার্যের সঙ্গে রামানুজের। কাঞ্চী বিভক্ত হয়ে গেল দুটি পৃথক শহরে—শিবকাঞ্চী আর বিষ্ণুকাঞ্চী। ইংরেজীতে বলা হল বিগ কাঞ্জিভরম্ আর লিট্‌ল কাঞ্জিভরম্। বিষ্ণুর ওপর দিয়ে মাথা উঁচু করে আছেন শিব।

ভদ্রলোক প্রচুর উৎসাহ দেখিয়ে বললেন ঃ জানেন বোধ হয় যে, চাণক্য বা কৌটিল্যের জন্মস্থান এই কাঞ্চী। ভারতের প্রথম অর্থশাস্ত্র বা রাজনীতির বই লিখে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

চাণক্যের জন্মস্থানের কথা আমার জানা ছিল না। বললুম ঃ তাই নাকি।

ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে বললেন ঃ জানেন বোধ হয় যে কিছু দিন আগে যখন কৌটিল্যের মূল গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হল, তখন অনেকে বললেন যে এই বই কৌটিল্যের লেখা নয়। এই বই নাকি অনেক

পরবর্তী কালের রচনা। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যে, এ বই কৌটিল্যের না হয়েই যায় না। এতে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও রাজ্যশাসনের প্রণালী বিশদ ভাবে লেখা হয়েছে। আর এর থেকেই আমরা জানতে পারি যে সে যুগে রাজ্যশাসন কত উন্নত ছিল। এখনকার মতো সে যুগেও রাজকার্যে সুনির্দিষ্ট বিভাগ ছিল, আর এই বিভাগগুলি এক একজন অধ্যক্ষ পরিচালনা করতেন। যুদ্ধ কী প্রণালীতে হবে, সন্ধিবিগ্রহের শর্তাদি কী রকম, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম, গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা—সবই তাতে আছে। সে যুগে মন্ত্রীরা বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। গুরুতর বিষয়ের আলোচনার জন্যে একটি পরিষৎও থাকত। প্রয়োজন মতো মন্ত্রী ও এই পরিষদের সঙ্গে একত্র পরামর্শ করে রাজা নিজের কর্তব্য স্থির করতেন। কাজেই রাজার স্বেচ্ছাচারী হবার কোন উপায় ছিল না। এই বই থেকেই জানা যায় যে রাজা জনমতকে কত ভয় করে চলতেন। কেন না প্রজার বিরাগভাজন হলে রাজা পদচ্যুত এমন কি নিহতও হতেন। রাজা নিজেকে রাজ্যের বেতনভোগী সাধারণ কর্মচারীর মতো প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানকেই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। আপনি পড়েছেন এ বই ?

বললুম ঃ পড়ি নি।

ভদ্রলোক বললেন ঃ কী নিন্দুক দেশের লোক দেখুন! এ বই কৌটিল্যের রচনা স্বীকার করতে তাদের এত আপত্তি কেন বলুন তো।

ভদ্রলোক আবার বললেন ঃ জানেন, বৈষ্ণব মুনি পয়গাই আলোয়ারের জন্মও এই কাঞ্চীতে। রামায়ণ রচয়িতা কবি কাম্বরও বাস করতেন এখানে। একাম্বরনাথ থেকে তাঁর নাম হয়েছে কাম্বর।

ভাল লাগল ভদ্রলোকের এই দেশপ্রীতি। এই প্রীতিই আজকের মাদ্রাজবাসীকে টেনে তুলছে। দিল্লীতে পাঞ্জাব প্রাধান্য পেয়েছে তার দেশ বলে, মাদ্রাজ তার স্থান করে নিচ্ছে তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের গুণে। আমরা দেশ বলতে যেদিন ভারত বুঝব, সেদিন আমাদের দেশে সত্যিকার স্বাধীনতা আসবে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ কয়েক ঘণ্টা থাকবেন তো কাঞ্চীতে, একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে সব কিছু দেখে নেবেন।

বললুম ঃ কী কী দেখা সম্ভব হবে আমাদের ?

অনেক কিছু দেখা হবে। শিবকাঞ্চী স্টেশন থেকে মাইল খানেক, আর বিষ্ণুকাঞ্চী চার মাইল। সাতটি তীর্থ আছে বিষ্ণুকাঞ্চীতে, সাত বারের নামে সাত তীর্থ। রামানুজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে এই বিষ্ণুকাঞ্চী। রামানুজ এখানে এক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদব-প্রকাশের কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। অল্প দিনেই অদ্বৈতবাদের বিরোধী ব্যাখ্যা করবার জন্যে গুরুশিষ্যে মতভেদ হয় ও গুরু সশিষ্য কাশীযাত্রার পথে শিষ্যকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। রামানুজ আত্মরক্ষা করেন পালিয়ে। শোনা যায় যে এই কাঞ্চীতেই বাল্যকালে রামানুজ শূদ্র জাতীয় মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন এবং তাঁরই নির্দেশে যমুনাচার্যের শিষ্য মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গল্প লোকের মুখে মুখে আজও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই চলে আসছে। অন্য দিকে শিবকাঞ্চীতে একাম্বরনাথের মন্দিরে দেখবেন শঙ্করাচার্যের সমাধি। এক সময় শঙ্করের কামকোটি পীঠ ছিল এইখানে। তারপর তাঞ্জোরের রাজার আমন্ত্রণে তাঞ্জোরে সরিয়ে নেওয়া হয়। এখন শৃঙ্গেরী মঠের এক শাখা আছে কুম্ভকোনামে।

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন ঃ রেলে কাঞ্চীপুরম মাদ্রাজ থেকে সাতান্ন মাইল, মোটরে সোজা রাস্তায় এলে মাইল বারো কম হত। মাদ্রাজ থেকে সকালে বেরিয়ে সব-কিছু দেখেশুনে বিকেলে ফিরে যাওয়া যায়, যেমন করে লোকে মহাবলীপুরম দেখে ঠিক তেমনি করে। শ্রীপেরাম্বুদুর নামে আর একটি তীর্থস্থান আছে পথে, সেখানে বিষ্ণুর মন্দির। কাঞ্চী-পুরম পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই দূর দিগন্তে দেখা যায় বড় বড় মন্দিরের চূড়া নীল আকাশের গায়ে মাথা তুলে আছে। রাস্তার দু ধারে তাঁতীরা বুনছে তাঁত, নানা রঙে রঙীন হয়ে আছে রাস্তার দু পাশ। আজকের খবর সঠিক দিতে পারব না, তবে যুদ্ধের আগে কাঞ্চীতে তাঁতীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। শুনতে পাই যে ভারত-

বর্ষে মাদ্রাজ আর বাঙলাই নাকি তাঁতশিল্পে অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়িয়ে গেছে।

বললুম ঃ কয়েক বছর আগের বাঙলার খবব আমি জানি। অখণ্ডিত বাঙলায় তখন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তাঁত আর পৌনে চার লক্ষ লোকের অন্নের সংস্থান হত এই তাঁত থেকে। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে সে সময় বাঙলায় প্রতি বছর প্রায় দশ কোটি গজ কাপড় তৈরি হত।

ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে চাইলেন আমার দিকে। বললুম ঃ এক সময় হাত-তাঁতে বাঙলার তাঁতী সারা দিনে পাঁচ গজ কাপড় বুনত, ঠক্-ঠকি-তাঁতে বুনতে শুরু করল দশ গজ। সে আজ এক শো বছর আগের আবিষ্কার। বছর তিরিশেক আগে চিত্তরঞ্জন সেমি-অটোমেটিক তাঁত বসেছে বাঙলা দেশে। তাঁতীরা পঁচিশ গজ কাপড় বুনতে শিখেছে সারা দিনে। এর পরে শাড়ির পাড়ে নকশা তোলবার জন্যে যন্ত্র এসেছে ডবি আর জ্যাকার্ড। যখনকার কথা বলছি তখন বাঙলায় তাঁতসরঞ্জামের মূলধন ছিল কম করেও দেড় কোটি টাকা, বছরে সুতো দরকার হত প্রায় ছু কোটি পাউণ্ডের, আর যা কাপড় তৈরি হত তার দাম কম করেও আট কোটি টাকা।

ভদ্রলোক গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ এ দেশে আমার কাপড়ের ব্যবসা, আমি জানি নে আমাদের হিসেবনিকেশের কথা।

বললুম ঃ আমিও জানতুম না। বছর কয়েক আগে এক তাঁতবস্ত্রের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এই সব জেনেছিলুম। বড় আশ্চর্য লেগেছিল বলেই মনে আছে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ তাঁতশিল্পের ছুর্দিন আমরা বোধ হয় কাটিয়ে উঠেছি। দেড় শো বছর আগে যখন প্রথম কলের কাপড় এল দেশে, তখন মনে হয়েছিল যে তাঁত বোধ হয় ডুবে যাবে। শুনেছি যে বাঙলার ঢাকায় যে মসলিন কাপড় তৈরি হত, তার তুলনা ছিল না ভারতে ও ভারতের বাইরে। সেই তাঁতীর বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে নাকি মসলিন বোনা বন্ধ করতে চেয়েছিল ইংরেজ। কী নৃশংস বলুন তো!

বললুম ঃ এ তো দেড় শো বছর আগের কথা। প্রতিপত্তির জন্যে হানাহানি কি আজও বন্ধ হয়েছে! আমরা রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখি। সে শুধুই স্বপ্ন। রাবণ যে অমর, তাঁর আত্মা বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

গাড়ি কখন এসে চিঙ্গলপুট স্টেশনে ঢুকেছিল টের পাই নি। যাত্রী-দের কলরবে আর কুলির ছুটোছুটিতে বুঝতে পারলুম যে এইমাত্র থেমেছে গাড়ি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন ঃ কাল আপনারা কোথায় থাকবেন?

সংক্ষেপে বললুম ঃ বোধ হয় ত্রিচিতে।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন ঃ তাঞ্জোরে আমার এক দিনের কাজ। ঠিকানা দিলে ত্রিচিতে আপনাদের সাহায্য করতে আসব।

বললুম ঃ স্টেশনে রিটায়ারিং রুম পেলে আমরা হোটেল বা ধর্ম-শালায় যাব না।

ত্রিচিতে পাবেন।

বলে আমাকে নমস্কার করে বিদায় দিলেন। গাড়ি থেকে আমি নেমে পড়লুম।

মামা তখন জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলেছেন। বললেন ঃ আমি ভাবলুম যে তুমি বুঝি মাদ্রাজেই রয়ে গেলে!

স্বাতি আমাকে চুপি চুপি বলল ঃ আমাদের বোধ হয় তাঞ্জোরও দেখা হবে। মা বলছিলেন, এত কাছে এসে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের দর্শন পাব না? বাবা মুখে বলছেন যে শেষ রাতে গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না। কিন্তু ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে খানিকটা ঝুঁকেছেন সেই দিকে।

আমিও চুপি চুপি বললুম ঃ সত্যি নাকি!

স্বাতি বলল ঃ দেখা যাক মজাটা!

১৬

আমাদের লটবহর আমরা চিঙ্গলপেটের ক্লোক রূমেই জমা করে দিলুম। তারপরে ঝাড়া হাত পায়ে আর্কোলামের গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। মাদ্রাজ থেকে এখানে আসতে ছ্যঘণ্টা সময় লেগেছে, এখান থেকে আরও ঘণ্টা খানেক লাগবে। কিন্তু ট্রেন ছাড়তে এখনও এক ঘণ্টার বেশি বাকি। মামা চা খেয়ে পাইপ ধরিয়ে বসলেন, আমি ঘুরে ফিরে সব দেখতে লাগলুম। স্বাতি বসে রইল মামা মামার সঙ্গে।

ইংরেজী জানেন এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল দেরিতে। চিঙ্গলপেট স্টেশন ছেড়ে আমাদের গাড়ি অনেকটা দূরে চলে আসবার পরে ভদ্রলোক আমাকে বললেন ঃ চিঙ্গলপেটের দুর্গটা দেখে নিয়েছেন তো?

দুর্গের কথায় আমি আশ্চর্য হলুম, বললুম ঃ এখানে যে দেখবার কিছু আছে, সে কথা তো কেউ বলেন নি!

ভদ্রলোক বললেন ঃ দুর্গের উপর দিয়েই তো রেলের লাইন। খেয়াল করেন নি বুঝি!

বললুম ঃ না।

ভদ্রলোক বললেন ঃ যোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের ক্ষমতা যখন কমে এল, তখন তাঁরা দু জায়গায় থেকে রাজ্য শাসন করতেন—চন্দ্রগিরি আর এই চিঙ্গলপেট। এ দুর্গ তাঁদেরই তৈরি। চিঙ্গলপেট মানে জানেন?

একথার উত্তরেও বললুম ঃ জানি না।

সিঙ্গালা পেট্টা বা চেঙ্গলপেট থেকে ইংরেজী হয়েছে চিঙ্গলপুট। তার মানে পদ্মের শহর। তবে এসব পুরনো মানে নিয়ে আজকের লোকেরা মাথা ঘামায় না। এসব বিষয়ে কোন কৌতূহলই নেই এ যুগের মানুষের।

অভিযোগ তাঁর মেনে নিলুম। জিজ্ঞাসা করলুমঃ দেখবার মতো দুর্গ বুঝি ?

দেখবার মতো বৈকি। কাঞ্চী যাচ্ছেন তো, বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে রথ দেখতে পাবেন। তারই অনুকরণে তৈরি হয়েছে রাজা মহল। এরই নাম থের মহল, থের মানে রথ। পুরাকালে পাঁচ তলা ছিল, একটা তলা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বেলা বারোটার সময় রাণীরা এই বাড়ির ছাদে উঠে কাঞ্চীর মন্দিরের দিকে চেয়ে উপাসনা করতেন। ছেঞ্জির দুর্গ দেখেছেন ?

বলে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুমঃ ইতিহাসে জিঞ্জির নাম পড়েছি, কিন্তু সে দুর্গ কোথায় তা জানি নে।

ভদ্রলোক বললেনঃ ইংরেজীতে জিঞ্জি বলে, আর আমরা বলি ছেঞ্জি। সাহেবরা মডার্ন ট্রয়ও বলে। সে দুর্গ আপনার দেখা থাকলে বলতাম যে দুটো একই আদর্শে তৈরি।

মডার্ন ট্রয় কেন বলে ?

বোধহয় যুদ্ধের জন্যে। একে তো এবড়ো খেবড়ো পাথরে তৈরি তিনটি পাহাড় জুড়ে, তার উপরে তার সারা দেহে যুদ্ধের ক্ষত। চিঙ্গলপুট দুর্গের মতো কত হাত বদলেছে তার হিসাব নেই। বিজয়নগরের হাত থেকে যায় বিজাপুরের হাতে, তারপর শিবাজী তা দখল করেন। কখনও মুসলমান কখনও মারাঠা, কখনও ফরাসী কখনও বা ইংরেজ এই দুর্গ দখল করেছে। এসব কথা আপনি ইতিহাসেই পড়ে থাকবেন।

আমি বললুমঃ আপনি তাহলে দুর্গেরই বর্ণনা দিন।

ভদ্রলোক বললেনঃ বর্ণনা আর কী দেব! দুটো মন্দির আর কল্যাণ মহল—একটা চৌকো অঙ্গনের চারিদিকে মহিলাদের থাকবার ঘর, মাঝখানে আটতলা টাওয়ার। রাজাগিরি পাহাড়ে লোকে কামান দেখে, আর দেখে বন্দীদের কূপ।

ভদ্রলোক আমাকে এই দুর্গের অবস্থানও বললেন। মাদ্রাজ থেকে ছিয়াত্তর মাইল দক্ষিণে টিণ্ডিবনাম স্টেশন, সেখান থেকে বাসে করে

আঠারো মাইল যেতে হয়। তারপরেই বললেন ঃ আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। একটি গানের জন্যে এই ছেঞ্জি নাম লোকের খুব প্রিয় হয়ে আছে। এই দুর্গের এক রক্ষক রাজা দেসিং বা তেজসিং-এর বীরত্বের কাহিনী আজও লোকে প্রচুর আনন্দ করে গায়। আপনারা তো শুধু মন্দির দেখতে আসেন, এসব জিনিস দেখেনও না। দেখবার ইচ্ছাও আপনাদের নেই। ইচ্ছা থাকলে ভেলোরে গিয়েও একটা দুর্গ আপনারা দেখে আসতে পারতেন। ভেলোরের বিখ্যাত হাসপাতালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

বললুম ঃ শুনেছি।

ভদ্রলোক বললেন ঃ ভেলোর সম্বন্ধে একটি হাসির কথা প্রচলিত আছে—ভেলোরে আছে এ রিভার উইদাউট ওয়াটার, এ টেম্পল উইদাউট গড, পুলিশ উইদাউট পাওয়ার ও লেডিস উইদাউট বিউটি।

হাসতে হাসতেই তিনি বললেন ঃ পালার নদীতে সত্যিই জল নেই, দুর্গের মন্দিরে নেই দেবতা, আর পুলিশ আছে ট্রেনিং স্কুলে।

তারপরে তিনি বললেন ঃ আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

বললুম ঃ বাঙলা থেকে।

আপনাদের দেশে শুনেছি কিছুই দেখবার নেই ?

কঠিন মন্তব্য। কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। ভদ্রলোক তার জন্যে অপেক্ষা না করে বললেন ঃ এখন কি মাদ্রাজ থেকে আসছেন ?

বললুম ঃ হ্যাঁ।

এও দেখি আপনাদের একটা স্বভাব। মাদ্রাজে কয়েকটা দিন আপনারা কাটান, কিন্তু কী দেখেন সেখানে ? একটা শহর দেখতে আর কত সময় লাগে ?

আমি বললুম না যে মাদ্রাজে আমরা একটি দিন কাটিয়েছি। ভদ্রলোক নিজেই কথা বলতে লাগলেন ঃ আপনাদের কাঞ্জীভরমে এসে কয়েক দিন থাকা উচিত ছিল।

এবারে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কেন বলুন তো ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ নতুন শহরে দেখবার আর কী আছে! কাঞ্জী-

ভরম হল একটা প্রাচীন শহর। পল্লব চোল ও বিজয়নগরের রাজধানী ছিল। তিরুপতি নিশ্চয়ই দেখেছেন?

দেখেছি।

তবে তো রেনিগুন্টা থেকে আর্কোলাম হয়ে ম্যাড্রাসে এসেছিলেন। আপনার উচিত ছিল আর্কোলামে নেমে কাঞ্জীভরমে আসা। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের টুরিস্ট বাংলো আছে, পি. ডব্লু ডি আর মিউনিসিপাল রেস্ট হাউসও আছে। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে কয়েকটা লজও আছে। কাঞ্জীভরম হেড কোয়ার্টার করে এ অঞ্চলটা আপনি সহজে দেখতে পারতেন। একদিন সকালের বাসে ম্যাড্রাস গিয়ে সন্ধ্যে-বেলায় ঘুরে আসতেও পারতেন।

ভারি আশ্চর্য লাগল তাঁর এই পরামর্শ। ভদ্রলোক তা বুঝতে পেরে বললেন: তিরুত্তানি এখান থেকে পঁচিশ মাইল, তিরুপতি আশি মাইল। মাদ্রাজ সাতচল্লিশ মাইল আর ব্যাঙ্গালোর এক শো পঁয়ষট্টি মাইল। শহরের উত্তর দিক দিয়ে বড় রাস্তা গেছে মাদ্রাজ থেকে ব্যাঙ্গালোর—পূর্ব থেকে পশ্চিমে। শহরের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বেগবতী নদী—সেও পশ্চিম থেকে পূর্বে। তিরুপতির পথ উত্তর থেকে দক্ষিণে ব্যাঙ্গালোর রোড ক্রস্ করে দক্ষিণে শহরের মধ্যে ঢুকেছে। এই পথ থেকেই বেরিয়েছে ভেলোরে যাবার রাস্তা। রেল লাইন শহরের পূর্ব প্রান্তে—পশ্চিম থেকে পূর্বে এসে দক্ষিণে চিঙ্গলপুটের দিকে গেছে। শহরের সম্বন্ধে একটা ধারণা হচ্ছে তো?

বললুম: হচ্ছে।

একাম্বরনাথের মন্দির শহরের উত্তরে, এই অঞ্চলের নাম শিবকাঞ্চী। স্টেশন বাস স্ট্যাণ্ড ও অন্যান্য মন্দিরগুলি সব কাছাকাছি। বরদরাজের মন্দির বিষ্ণুকাঞ্চীতে, সে একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। রাজা স্ট্রীট আর গান্ধী রোড ধরে যেতে হয়। এই পথেই চিঙ্গলপুট পক্ষীতীর্থ ও মহাবলী-পুরম। পক্ষীতীর্থ উনত্রিশ মাইল আর তিরুভাল্লামালাই ছিয়াত্তর মাইল। ভেডাল থাঙ্গালের নাম শুনেছেন?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন: তিরিশ মাইল দক্ষিণে

একটি বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি। বিদেশীরা পাখি দেখতে যায় রবিবারের টুরিস্ট বাসে। পরশু আপনিও দেখে আসতে পারতেন। মাদ্রাজ থেকে মহাবলীপুরম আর পক্ষীতীর্থ দেখে চলে যেতেন ভেডাল থাঙ্গাল, ফেরার পথে কাঞ্চীভরম দেখতেন। একদিনেই সব দেখা হয়ে যেত।

বললুম ঃ ভাল করে কিছুই দেখা হত না।

তা ঠিক। এক দিনে কাঞ্চীভরমেরই সব মন্দির দেখা হয় না। কত মন্দির আছে জানেন? একসময় এক হাজার আট শিবের মন্দির আর একশো আট বিষ্ণুর মন্দির ছিল।

সবিস্ময়ে আমি বললুম ঃ বলেন কি!

ভদ্রলোক হেসে বললেন ঃ ভয় নেই, এখন আপনাদের এত মন্দির দেখতে হবে না। পল্লবযুগের দুটি মন্দির দেখবেন, বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির আর কৈলাসনাথের মন্দির। ভাল করে দেখবেন এই মন্দির দুটি, ঐতিহাসিক মন্দির বলেই আমি এই কথা বলছি।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের কথাও আমি এই ভদ্রলোকের কাছে জেনে নিলুম। তিনি বললেন ঃ স্টেশনে একখানা গাড়ি ভাড়া করবেন· সাইকেল রিক্সা আছে একজন বসবার উপযোগী, ঝট্‌কার চেয়ে রিক্সাই ভাল হবে। ভাড়া কম লাগবে, দেখবেনও তাড়াতাড়ি। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির কাছে, প্রথমে সেখানেই যাবেন। তারপরে আসবেন বাস স্ট্যাণ্ডে। কাছাকাছি অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ চিত্রগুপ্ত মন্দির সাঙ্গুপাণি বিনায়ক মন্দির উলগনাথ পেরুমল মন্দির কামাক্ষী মন্দির কুমার কোট্টম শ্রীকামকোটি শঙ্কর মঠ শ্রী শৃঙ্গেরী শঙ্কর মঠ। পায়ে হেঁটেই এ সব দেখে আপনি একাম্বরনাথের মন্দিরে যেতে পারবেন। সেখান থেকে আবার একখানা রিক্সা নেবেন। কৈলাসনাথ মন্দির ও কচ্ছপেশ্বর মন্দির দেখে চলে যাবেন বিষ্ণুকাঞ্চী। বরদরাজ মন্দির দেখে রেলওয়ে রোড ধরে স্টেশনে ফিরে আসবেন।

আমি বললুম ঃ তিন চার ঘণ্টায় কি এত দেখা সম্ভব হবে!

ভদ্রলোক মেনে নিলেন আমার কথা, বললেন ঃ তাহলে এক কাজ করুন। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির দেখে চলে যান কামাক্ষী মন্দিরে।

সেখান থেকে একাম্বরনাথের মন্দির দেখে আসবেন কৈলাসনাথের মন্দিরে। বিষ্ণুকাঞ্চীতে বরদরাজের মন্দির দেখে স্টেশনে ফিরবেন।

একটু থেমে বললেন: দেখবার জায়গা আরও একটা ছিল, কিন্তু সময় পাবেন না।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন: জৈন কাঞ্চী। বেগবতী নদীর দক্ষিণ পারে এই জায়গাটি বাস স্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে। জৈনদেব মন্দির আছে এখানে।

যে সব জায়গা দেখা হবে না, সে সবের সম্বন্ধেও আমি কিছু জেনে নিলুম। ট্রেন থেকে নামলেই আমাকে গাইডের কাজ করতে হবে। সেই জন্যেই আমার জানবার প্রয়োজন। ভদ্রলোক যা বললেন, তাতে আমার মোটামুটি একটা ধারণা হল।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে উত্তর দিকে কয়েক পা এগোলেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, আর তার পাশেই চিত্রগুপ্তের মন্দির। চিত্রগুপ্ত হলেন যমরাজের পেশকার, সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তাঁর এই একটি মাত্র মন্দির। আমি গল্প শুনেছি যে যমরাজের ভগিনী যমীর বিবাহ হয়েছিল চিত্রগুপ্তের সঙ্গে। তাঁদের বারোটি সন্তান বারো উপাধির কায়স্থ। শ্রীবাস্তব ভর্মা কুলশ্রেষ্ঠ আম্বাস্তা প্রভৃতি বিহার ও উত্তর প্রদেশের কায়স্থরা ভাইফোঁটার দিন চিত্রগুপ্তের পূজা করে। একে দোযাত পূজোও বলে। সেদিন অনেকে দোযাতের পূজো করে বলে লেখাপড়ার কাজ করে না। দক্ষিণ ভারতেও চিত্রগুপ্তের মন্দির আছে জেনে তাই বেশ আশ্চর্য লাগল। আর একটু এগিয়ে সাঙ্গুপাণি বিনায়কের মন্দির। কাশীতে যেমন ঢুণ্টি গণেশ, কাঞ্চীতে তেমনি সাঙ্গুপাণি বিনায়ক।

মিনিট তিনেক উত্তরে হাঁটলেই উলগনাথ পেরুমলের মন্দির। দেবতা এখানে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বামন মূর্তি। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রায় ষোল হাত উঁচু মূর্তি পল্লব যুগের বলে মনে করা হয়। বিষ্ণুর বামন অবতারের গল্প আমাদের জানা। অসুররাজ বলি যজ্ঞ শেষ করে ব্রাহ্মণদের দান করছেন। সেই সময়ে বিষ্ণু এলেন বামন রূপে, বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চাইলেন।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর ছলনা বুঝতে পেরে বলিকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু বলি সত্যভ্রষ্ট হতে চান নি, বামনের প্রার্থনা পূরণে রাজী হয়েছিলেন। তারপর বিষ্ণু সেই বিরাট মূর্তি ধারণ করলেন। এক পায়ে পৃথিবী ও আর এক পায়ে আকাশ অধিকাব করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার তৃতীয় পা আমি কোথায় রাখব? বলি বললেন, আমার মাথায়। বিষ্ণু তাই করলেন, বলি নির্বাসিত হলেন পাতালে। দেবতারা ফিরে পেলেন তাঁদের স্বর্গরাজ্য।

ভদ্রলোক বললেন ঃ কামাক্ষী আম্মান মন্দিরে শঙ্করেব কামকোটি পীঠ দেখবেন। আদি শঙ্কবেরও একটি ছোট মন্দিব আছে।

তারপরে কুমার কোট্টম। এটি সুব্রহ্মণ্যম বা কার্তিকেব মন্দির। রাজা স্ট্রীটের উপবে এই মন্দির, কিন্তু কামাক্ষী আম্মান মন্দিবের ভিতর দিয়েও যাওয়া যায়। কার্তিককে এখানে সৃষ্টিকর্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মাকে তিনি শিক্ষা দেবার জন্য বন্দী কবেছিলেন এবং সৃষ্টিব কাজ নিজের হাতে নিয়েছিলেন। শিব এসে রক্ষা কবেন ব্রহ্মাকে, আর ব্রহ্মা কার্তিকের পূজা করছেন এই কুমার কোট্টমে। এই মন্দিরেব এক পূজারী কচিয়াপ্পা শিবাচারিয়ার এইখানেই তামিল ভাষায় স্কন্দ পুরাণ রচনা করেছিলেন।

ভদ্রলোক বললেন ঃ কচ্ছপেশ্বরের মন্দির তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাস স্ট্যাণ্ডে ফেরার পথে এই মন্দির। কূর্ম অবতারে বিষ্ণু এইখানে শিবের পূজা করেছিলেন।

একটু থেমে বললেন ঃ পল্লব যুগের ছুটি মন্দির দেখবার কথা আপনাকে বলেছি। সে যুগের ছোট ছোট মন্দির আরও অনেকগুলি আছে। বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরের কাছে মুক্তীশ্বর মন্দির মতঙ্গেশ্বর মন্দির; কচ্ছপেশ্বর মন্দিরের উল্টোদিকে ইরাবতীশ্বর মন্দির ও কামাক্ষী মন্দিরের উত্তরে ইরাবথানেশ্বর মন্দির। এছাড়াও যে আরও কত মন্দির আছে, তার নাম আমি বলতে পারব না।

কথায় কথায় এক ঘণ্টা সময় যে কেটে গিয়েছিল, তা বুঝতে পারলুম কাঞ্চীভরম স্টেশনে পৌঁছে। ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি নেমে পড়লুম। তিনিও নামলেন কিনা তা ফিরে দেখলুম না।

১৭

মামার গাড়ীর কাছে এসে দেখলুম যে তাঁরা নেমে পড়েছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই মামা বললেনঃ একখানা ট্যাক্সি ধর তাড়াতাড়ি। যা দেখবার আছে তা এই বেলাতেই দেখে নিতে হবে।

স্টেশনের বাহিরে বেরিয়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল, সব দেখাবার জন্যে চুক্তি করে নেওয়া হল তার সঙ্গে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী কী দেখাতে হবে? মামা আমার দিকে চেয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলুম যে স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথমে দেখাবে বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির, তারপরে কামাক্ষী ও একাম্বরনাথ। বাধা দিয়ে মামা বললেনঃ না না, পেরুমল টেকুমল নয়, সোজা শিবকাঞ্চী চল। আগে শিবের দর্শন হোক, তারপরে তোমার পেরুমল।

মামার এই আদেশ শুনে মামী খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু ড্রাইভার বলেছিল যে স্টেশনের কাছেই তো বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির, দেখতে সুবিধা হবে।

স্বাতি বলেছিলঃ তাহলে ফেরার পথে এই মন্দির দেখব।

ড্রাইভার আর আপত্তি করে নি, সোজা আমাদের একাম্বরনাথের মন্দিরের সামনে এনে হাজির করেছিল। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে মোড় নিলেই মন্দিরের বিরাট গোপুর চোখে পড়ে। এত উঁচু গোপুর নাকি দক্ষিণ ভারতে কম আছে। দশতলা এই গোপুরটি একশো আটাশি ফুট উঁচু। সামনে একটি ষোল স্তম্ভের মণ্ডপ, তার কারুকার্য চমৎকার। এটি পেরিয়ে এসে আমরা গোপুরের সামনে নেমেছিলুম।

গাড়ি থেকে নামতেই এক ব্রাহ্মণ এসে আমাদের আক্রমণ করলেন। ভাঙা ইংরেজী ও হিন্দীতে আমাদের ভিতরে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

স্বাতি গোপুরের কারুকার্য দেখছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল: এর ওপরে ওঠা যায় না গোপালদা? উঠতে পারলে গোটা কাঞ্চী শহরটা দেখা যেত।

ব্রাহ্মণ বোধহয় বাঙলা কথা অনুমানে বুঝতে পেরেছিলেন, বললেন: উপরে ওঠা যায় বৈকি। কিন্তু ধাপগুলো খুব উঁচু উঁচু আর অন্ধকার। টর্চ আছে আপনাদের সঙ্গে?

স্বাতি বলল: না।

ব্রাহ্মণ বললেন: তবে আমি প্রদীপ জ্বেলে আনতে পারি।

মামী বললেন: পাগল নাকি!

আমি জানি যে মামীর নানা রকমের ভয়। শুধু ভেঙ্গে পড়বার ভয় আর পোকা মাকড়ের ভয় নয়। স্বাতিকে একা ছেড়ে দিতেও তাঁর ভয় আছে। আমি তাই কোন কথা না বলে গোপুরের ভিতর দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকে গেলুম।

ব্রাহ্মণ আমাদের অনুসরণ করে বললেন: এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়। এর বয়স হয়েছে সাড়ে চারশো বছরের বেশি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: মন্দিরটি কত পুরনো?

তার হিসেব জানা নেই। পল্লবরাজাদের পরে বোধহয় চোল রাজারা নির্মাণ করেন। কিন্তু একজনের সময় এ মন্দির তৈরি হয় নি। দীর্ঘ দিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

খানিকটা এগিয়ে আমরা তার কারণ বুঝতে পারলুম। মন্দিরের এত বড় প্রাঙ্গণ আমরা আগে কোথাও দেখি নি। গোপুরগুলি মুখোমুখি, প্রাকারগুলিও নয় সমান্তরাল। আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা সেই হাজার স্তম্ভের মণ্ডপটি দেখতে পেলুম। স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: সত্যিই কি এই মণ্ডপে এক হাজার থাম আছে?

উত্তর দিলেন ব্রাহ্মণ, বললেন: পাঁচশো চল্লিশটি থাম আছে।

তারপরে মামীর দিকে চেয়ে বললেন: পঞ্চভূতের অতীত হলেন মহাদেব, এখানে তাঁর ক্ষিতি লিঙ্গ।

মামী বললেন ঃ সে আবার কী !

ব্রাহ্মণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, বললেন ঃ বালির তৈরি শিব লিঙ্গ, তাই এখানে জলে শিবের অভিষেক নয়, তেল আর মধু দিয়ে অভিষেক হয়। একদল ব্যবসাদাব লোক এখন তিরুবাল্লুরের ত্যাগরাজ স্বামীকে ক্ষিতি লিঙ্গ বলে অপপ্রচার করছে। এ সব কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। এ দেশে এসেছেন, এখানে আপনারা ক্ষিতি লিঙ্গ দর্শন করে তীর্থ যাত্রা শুরু করবেন। তিরুচিরপল্লীতে দেখবেন অপ্‌ লিঙ্গ জম্বুকেশ্বর জলের উপরে, তিরুবন্নমলয়ে তেজোলিঙ্গ আগুনের শিখার মতো, কালহস্তীতে মরুৎলিঙ্গ সারাক্ষণ কাঁপছে, আর চিদম্বরমে ব্যোম লিঙ্গ আকাশের প্রতীক। অনেকে শ্রীশৈলমের মল্লিকার্জুনকে জ্যোতির্লিঙ্গ বলেন। কিন্তু সে জায়গা দুর্গম ছিল বলে জনপ্রিয় হয় নি। এখন শুনছি বাস যাতায়াত করছে।

ব্রাহ্মণ থামলেন না, বললেন ঃ একাম্বরনাথ দর্শনে কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনের পুণ্য হয়।

মামা বললেন ঃ নকল দেখে আসলের পুণ্য সঞ্চয়ের দরকার কী ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ একাম্বরনাথ তো নকল নয় ! নকল হলেন কামাক্ষী দেবী।

মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ এ আবার অন্য কথা বলছে যে ! আমি বলছিলুম, বিশ্বনাথ দর্শনের পুণ্যের জন্যে আমরা বিশ্বনাথই দর্শন করব, কাঞ্চীর একাম্বরনাথ দেখব কেন !

এই আসল নকলের গল্প আমি শুনেছিলুম। বললুম ঃ হায়দর আলির ভয়ে এই মন্দিরের পূজারীরা একাম্বরনাথকে মাদ্রাজে ও কামাক্ষী দেবীকে তাঞ্জোরে সরিয়ে নিয়ে যায়। রবার্ট ক্লাইব একাম্বরনাথকে ফিরিয়ে এনে এই মন্দিরে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু কামাক্ষী দেবীকে আর ফিরিয়ে আনা যায় নি।

কেন ?

প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল তাঞ্জোরবাসী। তাই কাঞ্চীতে এখন নকল কামাক্ষী দেবীর পূজো হচ্ছে।

ব্রাহ্মণ বললেনঃ মন্দিরের বাইরে হায়দর আলির গোলার চিহ্ন আছে। তিনি এই মন্দির আক্রমণ করেছিলেন।

আশ্চর্য হয়ে মামা বললেনঃ হায়দর আলিও কি কালাপাহাড়ের মতো হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন ?

বললুমঃ ইতিহাস তো সে কথা বলে না।

তবে এই মন্দির কেন আক্রমণ করলেন ?

বললুমঃ তিনি মন্দির আক্রমণ করেন নি, আক্রমণ করেছিলেন ইংরেজ সৈন্য। তারা এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করছিল তাঁর সঙ্গে। স্যর মুনরো এই মন্দিরকে ব্যবহার করছিলেন দুর্গ হিসেবে। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে গুন্টুর থেকে সৈন্য নিয়ে আসছিলেন কর্নেল বেইলি। হাযদর আলি বেইলির সৈন্য ধ্বংস করেন কয়েক মাইল দূরে পল্লিলোর নামে একটা জায়গায়, আর মুনরো তাঁর বন্দুক ফেলে দিয়েছিলেন মন্দিরের দক্ষিণে সর্বতীর্থ নামে একটা পুকুরে।

বিরক্ত ভাবে মামী বললেনঃ তোমরা ঠাকুর দর্শন করবে, না গল্প করবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম, কিন্তু মামা বললেনঃ তোমাকে তো আমরা ধরে রাখি নি, তুমি যাও না এগিয়ে।

মামী বললেনঃ ধরে তো রাখ নি, কিন্তু পূজোর ব্যবস্থা করেছ ?

মামা প্রায় ক্ষেপে উঠছিলেন, কিন্তু মামী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর সংকল্পে অটল হয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণ বললেনঃ মন্দির তো বন্ধ হয় নি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কাজেই মামা মামী গর্ভগৃহের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর আমরা শিবকে প্রণাম করে মন্দিরটি ভাল করে দেখবার জন্য ফিরে এলুম। মন্দিরের থামগুলো আর তার কারুকার্য দেখতে লাগলুম ঘুরে ঘুরে। থাকে থাকে খোদাই করা মূর্তির থাম দেখলুম। প্রথম থাকে খাটো মুকুট পরা পুরুষ দুজন হাত জোড় করে বসে আছে, মাঝখানে মেয়েদের খেলা। তার পরের থাকে গাধার টুপির মতো লম্বা মুকুট পরা দুজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো, মাঝখানে খালি মাথায় মেয়েরা নাচছে

দুহাত তুলে। সকলের উপরের থাকে পাশাপাশি বসে আছে দেব দেবী। প্রশান্ত ঔদার্যে ভরা মুখ, হাতে বরাভয়। এই হল একটি স্তম্ভ। দেওয়ালের গায়েও মূর্তি ক্ষোদিত দেখলুম। নাচের ভঙ্গিতে দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন এক পা আর এক হাত তুলে, দেবী পাশে দাঁড়িয়ে সেই তাল রক্ষা করে আছেন

এক সময় স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ শিবের নাম একাম্বরনাথ কেন হল গোপালদা ?

বললুম ঃ এরা একাম্বরনাথ বলে, কিন্তু আসল নাম হল একাম্রনাথ। এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন আম গাছ আছে, সেই গাছে নাকি চাব রকম স্বাদের ফল হত—টক মিষ্টি কটু ও তেতো। এর মানে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল। কিন্তু প্রতিদিন একটি করে আম পাকত, সেই আমটি দেওয়া হত শিবের ভোগে। এক আম্র থেকে একাম্রনাথ। চতুর্বর্গ ফলদাতা তিনি।

স্বাতি বলল ঃ এ তোমার বানানো গল্প।

বললুম ঃ আমার বানানো নয়, তোমার আমার জন্মেব বহু আগে লেখা একখানা বাঙলা ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছি।

মামা মামী ফিরে আসবার পরে আমরা আর একটি কথা জানলাম। দক্ষিণের সকল মন্দিরে দেবতার একটি ভোগমূর্তি—উৎসবমূর্তি থাকে। এই মূর্তিটি উৎসবের সময় রথে পাল্কীতে বা নৌকোয় চাপিয়ে ঘোরানো হয়। একাম্বরনাথেরও একটি ভোগমূর্তি আছে। আর পার্বতী এই মূর্তিটি আলিঙ্গন করে আছেন। ব্রাহ্মণ এই মূর্তির গল্পটি আমাদের শোনালেন।

পার্বতী একদিন খেলাচ্ছলে শিবেব চোখ দুহাতে চেপে ধরেছিলেন। শিবের ত্রিনয়ন হল চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি। এই তিনটি চোখ ঢাকা পড়তেই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। শিব অসন্তুষ্ট হয়ে পার্বতীকে ত্যাগ করলেন। তপস্যায় আবার শিবকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পার্বতী কাঞ্চীতে এলেন কম্পা নদীর তীরে। বালি দিয়ে লিঙ্গ মূর্তি তৈরি করে শিবের পূজায় নিমগ্ন হলেন। শিব পার্বতীর ভক্তি পরীক্ষার জন্য নদীকে বললেন বন্যার মতো

ভারতে তিনি চারটি মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে বদরীনারায়ণের পথে যোশী মঠ, দক্ষিণে মহিস্থুর রাজ্যে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ, আর পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ। আজও এই সমস্ত মঠে যোগ্য অধ্যক্ষের পরিচালনায় বেদ-বেদান্তের আলোচনা হয়ে থাকে।

আচার্যের জন্মস্থান কেরালার কালদী গ্রাম আজ একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, মন্দিরে শঙ্করাচার্য ও সারদা দেবীব মূর্তি বিরাজিত। দক্ষিণ ভারতেব অন্যান্য মন্দিরে যেমন তান্ত্রিক মতে পূজা হয, এ মন্দিবে তেমন হয় না। আচার্যদেবের সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতি গভীর প্রীতিব সম্মানার্থে এখানে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বৈদিক প্রথায হয়। শৃঙ্গেবী মঠেব অধ্যক্ষেব স্বাধীনে এখানে একটি বেদ বিদ্যালয় ও বেদান্ত বিদ্যালয স্থাপিত হযেছে।

আব আজ কাঞ্চীতে আমরা তাঁর সমাধি দেখলুম। যাত্রীবা তাঁব মূর্তিতে একটা দায সারা নমস্কার ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছে। নিজের জীবন দিয়ে যে মহাপুরুষ দেশেব ধর্মকে রক্ষা কবে গেলেন, জনসাধারণের কাছে তিনি এর বেশি আব কী পাবেন!

হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শঙ্করের নাম। এত প্রাচীন এই ধর্ম যে তার প্রতিষ্ঠাতার নাম কেউ জানে না। ইতিহাসের মাপ কাঠিতে এই ধর্মের বয়সের থই পাওয়া যায় না। কেউ যদি আজ দাবী করে যে পৃথিবীর জন্মদিনে যে ধর্ম ছিল বিশ্ববাসীব, তাবই নাম হিন্দুধর্ম—তবে কে তা খণ্ডন করতে পারে যুক্তি দিযে! এক একজন ধর্মপ্রচারক জন্ম গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত করেছেন কিছু হিন্দুকে। খ্রীষ্টান হয়েছে, মুসলমান হয়েছে, বৌদ্ধ ও জৈন হয়েছে দুর্বল মনের হিন্দু। আর সেই ভ্রষ্ট হিন্দুকে আমরা চির দিনের মতো পরিত্যাগ করেছি। জানি না এই মত প্রচার করলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীবা কী বলবেন! আচার্য শঙ্কর হিন্দুর ধর্মে নবজীবনের সঞ্চার করেছিলেন। শঙ্করকে যদি আমরা ভুলি, তাহলে আমরা নিজেব ধর্মকেই ভুলেছি বুঝতে হবে।

আমাদের ট্যাক্সি একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

১৮

খেতে বসে মামা বললেন : গোপালের কথা শুনে চললেই হয়েছিল আর কি!

আমি এই অভিযোগের কারণ খুঁজে না পেয়ে তাঁর মুখের দিকে

মামা বললেন : কাঞ্চীতে তাঁতি দেখেছ?

স্বাতি বলে উঠল : গোপালদার কাণ্ডই এমনি। কবেকার এক পুরনো ভ্রমণ কাহিনীতে তাঁতির কথা পড়ে ভেবেছিল যে এখনও বুঝি কাঞ্চীতে শুধু তাঁতিই আছে।

আমি বললুম : এ রকম করে সব জায়গা দেখতে গেলে তো রামেশ্বরে পৌঁছনোই যাবে না!

কেন?

চিদম্বরমের নটরাজ মন্দির আপনাকে দেখতে হবে, মায়াভরম আর কুম্ভকোনাম বাদ দিলেও তাঞ্জোর কিছুতেই বাদ দিতে পারবেন না। কাঞ্চী যেমন পল্লব রাজাদের রাজধানী, তাঞ্জোর তেমনি চোল রাজাদের। বৃহদীশ্বর শিব দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় শিব, সবচেয়ে বড় মন্দির সেখানে। আর আছেন আসল কামাক্ষী দেবী। তারপর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ সরস্বতী মহল সঙ্গীত মহল—এ সব বাদ দিলে তামিল সংস্কৃতির কিছুই জানা হবে না।

মামা স্বাতির দিকে তাকালেন করুণ ভাবে। আর আমি তাকালুম মামার দিকে। মামী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : যে গাড়িতে আমরা যাচ্ছি, তাতে তাঞ্জোরে কখন পৌঁছব?

বললুম : ভোর পাঁচটার আগে।

মামা চমকে উঠলেন, বললেন : ভোর বলছ কেন, রাত বল।

মামী বললেন ঃ আমি তোমাদের ডেকে দেব।

আনন্দে স্বাতির চোখ নেচে উঠল। মামীকে আমি বলতে পারতুম যে তাঁকেও কষ্ট করতে হবে না, গাড়িতে আমাকে হয়তো জাগতেই হবে। না জাগলেও প্রতিটি বড় স্টেশনেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। যাত্রীরা যতক্ষণ ওঠানামা করে ততক্ষণ আমরা জেগেই থাকি।

মামা বললেন ঃ তবে আর কী! এই ভাবেই এগোনো যাক, এর পরে আমাকে আর দোষ দিও না।

দুপুরের আহার সেরে আমরা যাত্রা করলুম। এখন আর মামার কোন তাড়াতাড়ি নেই। বললেন ঃ গোপাল কোথায় যাবে বলছিলে?

বললুম ঃ কাঞ্চীপুরমের সব মন্দির দেখা তো সম্ভব নয়, বেছে বেছে কয়েকটা দেখতে হবে। এখন আমরা পল্লব যুগের কৈলাসনাথ মন্দির দেখতে যাচ্ছি, সেখান থেকে বিষ্ণু কাঞ্চী দেখে ফেরার পথে বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির দেখব।

স্বাতি বলল ঃ কতগুলো মন্দির আছে এখানে?

হেসে বললুম ঃ সাহেবদের হিসেবে এক হাজার শিবমন্দিরে দশ হাজার শিবলিঙ্গ ছিল, তার ওপর বিষ্ণুর মন্দির। এখনও কম করে একশো চব্বিশটা মন্দির আছে।

মামা বললেন ঃ সর্বনাশ! সব দেখতে হলে তো এইখানেই থেকে যেতে হবে।

কথায় কথায় আমরা কৈলাসনাথের মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলুম।

এ একেবারে অন্য জাতের মন্দির। আকাশ ছোঁয়া গোপুর নেই সামনে। বিমানটি পিরামিডের মতো চৌকো, কিন্তু মণ্ডপ আর অন্তরাল আছে। এক হাজার বছরের পুরনো এই মন্দিরটি পল্লব স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমি খুব যত্ন করে এই মন্দিরটি দেখবার চেষ্টা করলুম।

একটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা মন্দিরের এলাকা, আব মাঝখানে আর একটি দেওয়ালে বিভক্ত হয়েছে প্রাঙ্গণটি। মাঝখানে একটি ছোট মন্দিরের দুধার দিয়ে যাতায়াতের পথ। বড় অঙ্গনটির মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি

মন্দির। ছোট অঙ্গনটির মধ্যে আটটি মন্দির আছে মহাবলীপুরমের রথের মতো, আর দেওয়ালে কয়েকটি সুন্দর চিত্র আছে। একটিতে শিব বারোজন ঋষিকে উপদেশ দিচ্ছেন, আর একটিতে এগারজন ঋষিকে। সকলের হাতেই এক একটি অস্ত্র দেখে মনে হয় যে শিব যুদ্ধবিদ্যার সম্বন্ধেই কোন উপদেশ দিচ্ছেন। রথগুলিতেও শিবের মূর্তি আছে নানা ভাবে। শিবের নাক ও মুখের ভাব দেখে অনেকে এই অঞ্চলের আদিবাসী কুরুম্বরদের মুখের সঙ্গে তুলনা করেন। বড় অঙ্গনটির চারিধারে আছে ছোট ছোট মন্দির, তার মধ্যেও শিব আছেন নানা মূর্তিতে। নন্দীমণ্ডপের ভগ্ন-দশা। মূল মন্দিরের অর্ধ মণ্ডপ ও মহামণ্ডপ আছে। পার্বতীর মূর্তি আছে নানা স্থানে, লক্ষ্মীর মূর্তি শুধু এক জায়গায়। শিবের উপাসনায় রত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মূর্তিও আছে। কিন্তু সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার অবকাশ পেলুম না। স্বাতি এসে বলল ঃ তুমি কি এখানেই থেকে যাবে গোপালদা ?

অপ্রস্তুত ভাবে আমি বললুম ঃ তোমাদের দেখা হয়ে গেছে বুঝি !

বলে তাতাতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

কৈলাসনাথ মন্দিব থেকে আমরা সোজা বিষ্ণু কাঞ্চী চলে এলুম। এই পথে বাস যাতায়াত করে। সাইকেল রিক্সা ও টাঙ্গাও যাতায়াত করছে। শিব কাঞ্চী থেকে বিষ্ণু কাঞ্চীর দূরত্ব হবে দু'তিন মাইল। প্রশস্ত রাজ-পথের দুধারে ঘর বাড়ি দোকানপাট দেখে মনে হয় না যে এই দুই কাঞ্চীর মধ্যে কোন ছেদ আছে। রাস্তার ধারে ছোট ছোট মন্দির আছে। অল্প সময়েই আমরা বরদরাজ স্বামীর মন্দিরের দরজায় পৌঁছে গেলুম। ট্যাক্সি দাঁড়াল গোপুরমের বাহিরে। যেমন অন্যত্র করেছি তেমনি এখানেও আমাদের চটি জুতো গাড়িতে খুলে রেখে নামলুম।

এই মন্দিরেরও প্রাঙ্গণ অত্যন্ত প্রশস্ত। সামনেই একটি উঁচু মণ্ডপ, আর নিচু মন্দিরের মতো কক্ষ। বাঁ হাতে একটি একশো স্তম্ভের মণ্ডপ, তার কারুকার্য অপরূপ। স্তম্ভ তো নয়, যেন অশ্বারূঢ় যোদ্ধা। নানা রকমের চিত্র আছে ক্ষোদিত, বিষ্ণুর অবতার এবং রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্রাবলী! কয়েকটি অদ্ভুত মূর্তিও আছে, যেমন বন্দুক হাতে রাজপুত।

একটি পাথরের তৈরি শিকল ছিল, মাঝখানে ছেঁড়া বলে লোহা দিয়ে যুক্ত হয়েছে। লোকে বলে যে হায়দর আলি তাঁর তরবারির শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন এই পাথরের শিকল কেটে। মণ্ডপের কয়েক জায়গায় ক্ষত চিহ্ন আছে। লোকে বলে যে এসব মুসলমান আক্রমণের চিহ্ন, হায়দর আলিরও নাম করে অনেকে। এই মন্দিরটিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যুদ্ধের সময় ব্যবহার করেছিল। লর্ড ক্লাইব তারপরে অলঙ্কার উপহার দিয়েছিলেন বরদরাজ স্বামীকে।

এই মণ্ডপের পিছনে একটি বিরাট সরোবর আছে। কিন্তু আমরা সেদিকে না গিয়ে দ্বিতীয় প্রাকারের ভিতরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

অনেকে বলেছেন যে এই মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে। কিন্তু আমরা সমতল পথেই এসেছি। এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে উঠেছি ধাপে ধাপে। মূল মন্দিরটি মনে হয়েছে দোতলায় কিংবা তেতলার উপরে অবস্থিত। পিছনে পাহাড় আছে, বা পাহাড়ের গায়ে এই মন্দির, ভিতর থেকে তা দেখতে পাই নি।

এই মন্দিরটি যে অনেক পরে নির্মিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। একাম্বরনাথ মন্দিরের তুলনায় অনেক ছোট। সাত তলা গোপুর একশো ফুট উঁচু, কিন্তু কারুকার্যে অপরূপ। মনে হয় যে বিজয়নগরের রাজাদের হাত পড়েছিল এই মন্দিরে।

একাম্বরনাথের মন্দির দেখতে কারও সাহায্য নেবার দরকার হয় না। সবই খোলামেলা, চোখের সামনেই সব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে এসে এক নজরে কিছুই দেখা যায় না। বিষ্ণুর নৃসিংহ মূর্তি দেখবার পরে কোন্ দিকে যেতে হবে জেনে নিতে হয়। পূজারী ব্রাহ্মণেরাই সাহায্য করেন। লক্ষ্মীর মন্দির দেখিয়ে বলেন উপরে চলে যেতে। সেও সোজা পথে নয়, অনেকটা ঘুরে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয় উপরে। মূল মন্দিরে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তি নানা অলঙ্কারে শোভিত। হাতে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম। নিচে নেমে আমরা তাঁর ভোগমূর্তিও দেখলুম। আর শুনলুম সোনার টিকটিকির কথা। যাত্রীরা এই টিকটিকি স্পর্শ করে গায়ে টিকটিকি পড়ার দোষ ক্ষালনের জন্য।

মন্দির থেকে বাহির হবার পথে এক যাত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বরদরাজ স্বামীর যে নগ্ন-মূর্তি তা লক্ষ্য করেছেন ?

আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর কথা শুনে, বললুম ঃ দেখি নি তো।

সে ভদ্রলোক বললেন ঃ আমিও দেখি নি, কিন্তু শুনছি তাই। একটা গল্পও শুনলুম।

গল্পটি শোনবার জন্য আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন ঃ ব্রহ্মা যজ্ঞ করবার জন্য এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন। সরস্বতী নারদের মুখে এই কথা শুনলেন। ব্রহ্মা তাঁকে খবর দেন নি বলে ক্রুদ্ধ হয়ে এই যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেবেন বলে নদীরূপে প্রবাহিত হলেন। ব্রহ্মা প্রমাদ গুনলেন, আর শরণ নিলেন বিষ্ণুর। বিষ্ণুকে দেখে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হলেন। বিষ্ণু আর উপায় না দেখে নগ্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন নদীতে। সেই নগ্নমূর্তি দেখে লজ্জিত হলেন সরস্বতী, থমকে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপ্ত হল, আর বিষ্ণু সেই নগ্নমূর্তিতে বরদরাজ নামে এখানেই রয়ে গেলেন।

মামা মামীর সঙ্গে স্বাতি এগিয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে সকৌতুকে তাকাচ্ছিল দেখে আমি আর দেরি করলুম না। বললুম ঃ গল্প যখন আছে, তখন সত্য হতেও পারে।

অবিশ্বাসের সুরে ভদ্রলোক বললেন ঃ এ সব বাজে গল্প।

বিষ্ণু কাঞ্চী থেকে আমরা বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরে চলে এলুম।

কৈলাসনাথ মন্দিরের মতো এটিও পল্লব যুগের মন্দির, দ্বিতীয় নন্দী বর্মন এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরে এখনও বিষ্ণুর পূজা হচ্ছে, তাই যাত্রীরা পূজার জন্যেও আসছে, আবার পল্লব স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন বলেও আসছে। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৈলাসনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মন, আর বৈকুণ্ঠ পেরুমল তার পরবর্তী কালে তৈরি হয়েছে। তাই এর পরিকল্পনা আরও পরিণত বুদ্ধির। দুটি প্রাকার আছে এই মন্দিরে, আর অঙ্গনের চারিদিক

ঘরে বারান্দা। পাথরের উপরে যেমন চালুক্যদের সঙ্গে পল্লবদের যুদ্ধের চিত্র খোদাই করা আছে, তেমনি নানা রকমের চিত্র আছে আঁকা। কিন্তু এই সব চিত্র ভাল করে দেখবার আগেই স্বাতি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। মামা বললেন ঃ ট্রেনের আর কত দেরি আছে গোপাল ?

বললুম ঃ এখনও অনেক সময় আছে।

মামীর দিকে চেয়ে মামা বললেন ঃ তবে আর কি, চল।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল ঃ শাড়ি কেনা হবে।

বললুম ঃ সত্যিই, কাঞ্জীভরমের শাড়ি খুব ভাল।

মামা বললেন ঃ তুমিও তাই বলছ !

বললুম ঃ আমি তো শাড়ি চিনি না, লোকের মুখে এই কথা শুনেছি।

গাড়িতে উঠে স্বাতি বলল ঃ তাহলে তুমি আসল কথাই শোন নি। কাঞ্জীভরমের শাড়ি কলকাতায় অচল। অমন গাঢ় রঙও চলে না, অমন মোটা শাড়িও না।

তবু আমরা কয়েকটা দোকানে শাড়ি দেখলুম। মামী নিজের জন্যে কিনবেন না, তাঁর শাড়ি চাই স্বাতির জন্যে। একখানা দুখানা নয়, পছন্দ মতো পেলে খান কয়েক শাড়ি কিনে নিয়ে যাবেন। তার বিবাহ স্থির হয়েছে অগ্রহায়ণ মাসে, তখন এই সব কাজে লাগবে। কিন্তু স্বাতির একখানা শাড়িও পছন্দ হল না। মামা ক্লান্ত হয়ে বললেন ঃ থাক তবে।

আমরা তাই স্টেশনেই ফিরে এলুম।

আমি ভেবেছিলুম যে কাঞ্জীভরমের কাজ আমার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু ওয়েটিং রুমে বসেই বুঝতে পারলুম যে আমি নিতান্তই ভুল ভেবেছিলুম। মামা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ একটা কথার উত্তর দিতে পার গোপাল ?

সবিনয়ে আমি বললুম ঃ বলুন।

উত্তর ভারতের অনেক জায়গা তো দেখেছ, কিন্তু এত মন্দির দেখেছ কোনখানে ?

এত মন্দির উত্তর ভারতে নেই।

ঠিক বলেছ। কিন্তু কেন নেই তা ভেবে দেখেছ কি ?

বললুম ঃ ভেবে দেখি নি। কিন্তু অনেকে বলেন যে বিদেশী মুসলমানের আক্রমণে বহু মন্দিরের ক্ষতি হয়েছে উত্তর ভারতে। তাই মন্দিব গড়ার উৎসাহ ছিল না উত্তর ভারতের লোকের। তার বদলে তারা দুর্গ নির্মাণ করত, সৈন্যদল রাখত, যুদ্ধ বিগ্রহেই লিপ্ত থাকত বেশি।

মামা বললেন ঃ দক্ষিণ ভারতেও তো যুদ্ধ বিগ্রহ হত।

হত। আব এই মন্দিরগুলোই তখন দুর্গে পবিণত হত। ইংরেজরাও কর্নাটেব যুদ্ধে কাঞ্চীর একাম্বরনাথ ও বরদবাজের মন্দিরে সৈন্যদের শিবির করেছিল। দুর্গের মতো করেই মন্দিরগুলো তৈবি হত। আর সেই জন্যেই এব একাধিক প্রাকার।

আরও একটি প্রেরণা আছে এই সব মন্দির নির্মাণেব পিছনে। শান্তিব দিনে মানুষ ধর্মকে বুঝতে চায়। ধর্ম বা দর্শনের তো কোন স্বরূপ নেই, জনসাধারণ তাই চোখের সামনে এমন কিছু দেখতে চায় যা হবে ধর্মের প্রতীক। এই চাওয়া থেকেই দেবতাব জন্ম, আর সেই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হযেছেন মন্দিবে মন্দিবে। যে শিল্পীরা এই সব মন্দির নির্মাণ করেছেন, তাঁবাও জনসাধারণেব সামনে আসতে চান নি। তাই আমরা শিল্পীর নাম জানি না, শুনি না কোন শিল্পীর পবিকল্পনাব কথা। এ যুগের মতো একটা মর্মর মূর্তি নির্মাণ কবে তাব নিচে শিল্পীব নাম লিখে দেওয়ার রীতি সে যুগে ছিল না। তাই কালেব স্রোতে শিল্পীর নাম গেছে হারিয়ে, কিন্তু তার শিল্পকর্ম কালজয়ী হয়ে আছে।

জনসাধারণের সামাজিক জীবনে এই সব মন্দির নির্মাণের উপযোগিতা ছিল অসাধারণ। ধর্ম ছিল সভ্যতাব নামান্তর। তাই এক একটা মন্দিরকে কেন্দ্র করে গ্রাম বা নগবেব জনজীবন গড়ে উঠত। শুধু সামাজিক নয়, অর্থনৈতিক অবস্থাও নির্ভর কবত এই সব মন্দিবেব উপবে। রাজাদের আগ্রহে এক একটা মন্দির তৈরি আবম্ভ হলে হাজাব হাজার শিল্পী ও মজুরের অন্নের সংস্থান হত। দেশে তো কলকারখানা ছিল না, মন্দির নির্মাণের কাজই ছিল মজুরদের জীবিকা। একটা মন্দির তৈরি শেষ হলে তারা আব একটা মন্দির গড়তে যেত। নতুন শিল্পী তৈরি হত, নতুন মজুর আসত, কিন্তু মন্দির নির্মাণ শেষ হত না।

আর এই সব মন্দিরে কত লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল তার হিসেব নেই। পূজারী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের নানা কাজের জন্য নিযুক্ত হতেন, সঙ্গীতজ্ঞ ও দেবদাসীরা থাকতেন অষ্টপ্রহরের উৎসবের জন্য, বেদাধ্যয়ন পুষ্পোদ্যান-রক্ষা দানলব্ধ সম্পত্তি পরিচালনা হিসাব নিকাশ ও মন্দিরের নানাবিধ কার্যনির্বাহের জন্য বহু কর্মীর প্রয়োজন হত। রাজা ধনী ও ভক্তরা অকৃপণ হাতে এই সব মন্দিরে দান করতেন, আর এই মন্দিরগুলি হত জনসাধারণের আশ্রয়। ভিখারী সাধু সন্ত তীর্থযাত্রী ও ব্রাহ্মণেরা পূজার প্রসাদ পেত, দরিদ্র কৃষকেরা ঋণ পেত মন্দিরের কোষাগার থেকে, সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মমূলক সংগঠনের সহায়ক হত এই সব মন্দির প্রতিষ্ঠান। মন্দিরের উৎসবগুলি ছিল জনজীবনে আনন্দ বিধানের জন্য, সিনেমা থিয়েটার ছিল না, ছিল মন্দিরের উৎসব। এই উৎসবে মেলা বসত, নানা পণ্য ও আনন্দের উপকরণ আসত নানা জায়গা থেকে, দেশদেশান্তর থেকে যাত্রী আসত। মল্লবীররা আসত মন্দিরের অঙ্গনে মল্লযুদ্ধ দেখাতে, সঙ্গীতজ্ঞ ও দেবদাসীরা আসত যাত্রী ও দেবতার মনোরঞ্জনের জন্য, পণ্ডিতরা আসতেন শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক যুদ্ধের জন্য। বড় বড় সত্র ও ধর্মশালায় সকলের স্থান নির্দেশ হত। খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য কারও ব্যয় হত না।

মন্দির সংলগ্ন বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ থেকে শাস্ত্রাধ্যয়ন পর্যন্ত হত, বৈদ্য ও ঔষধ থাকত চিকিৎসার জন্য, পঞ্চায়েৎ বসত নগর পরিচালনা ও বিচারের জন্য। মন্দির তো শুধু দেবতার উপাসনার জন্য নয়, মন্দির থেকে দেবতার নামে রাজ্য শাসন হত। দেশের রাজারাও মন্দিরে বাস করে দেবতার দাস রূপে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। এ শুধু দক্ষিণ ভারতেই ছিল, উত্তরে আমরা এই রকম সংগঠনের নজির দেখি না। সেখানে মন্দিরগুলিও এর উপযোগী করে তৈরি হয় নি। যাত্রীরা আসবে, দেবতার দর্শন করে ফিরে যাবে। দেবতার উৎসবও হবে, কিন্তু সেই উৎসবে যাত্রীসাধারণের দুর্দশার সীমা থাকবে না। স্থানাভাবে ব্যাধিত যাত্রীর চাপে লোকক্ষয়ের কথাও আমরা সংবাদপত্রে পড়ি। তাই দক্ষিণের দেবস্থান দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

১৭

যথাসময়ে আমরা টিকিট কেটে চিঙ্গলপেটে ফেরার গাড়িতে চাপলুম। আমার তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেই খোল করতাল নিয়ে চারজন বৈষ্ণব উঠেছিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব, কণ্ঠে তুলসীর মালা, কপালে নাকে রসকলি।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই খোলে চাঁটি পড়ল আর করতালে মচ-মচানি। তৃতীয় ব্যক্তি গলাটা সাফ করে নিয়েই নামকীর্তন শুরু করলেন:

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে।

যাত্রীরা সবাই তামিলভাষাভাষী, অর্থবোধ না হলেও কৌতূহলের বশে কিংবা সুরের মাহাত্ম্যে এই দিকে আকৃষ্ট হলেন। চতুর্থ ভদ্রলোক হেলে দুলে হাতে তালি বাজাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলুম যে খানিক ক্ষণ কীর্তন শোনবার পরে যাত্রীদের মধ্যেও একজন তাঁকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে। যে ভদ্রলোক গাইছিলেন তাঁর গলাটি বড মিষ্টি। বাকি তিনজনে ধুয়ো ধরছিলেন।

সহসা আমার শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কথা মনে পড়ল। তিনি এই গান গাইতেন আর গৌরাঙ্গের অগণিত ভক্তকে এই নামই ভজনা করতে শিখিয়েছিলেন। বলতেন, প্রভু, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নামগান কর, কিন্তু আমি অন্য নামগান করি।

সে কি আজকের কথা! পাঁচ শো বছর পুরো হতে আর বেশি বাকি নেই। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্দশাক্লিষ্ট বাঙলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। নব-দ্বীপবাসী পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে দোলপূর্ণিমায় নদের নিমাইএর উদয় হল। চঞ্চল শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে এল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে ভরা উদ্ধত যৌবন। কিন্তু গতানুগতিক জীবনে প্রথম পরিবর্তন এল গয়ায় পিতার পিণ্ডদান

করে নবদ্বীপ ফেরার আগে। সেখানে তিনি সম্মোহিত হলেন বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে, আর দীক্ষা নিলেন ঈশ্বরপুরীর কাছে। আর দশ জন মহাপুরুষের জীবনেও যেমন জীবের দুঃখে প্লাবন আসে হৃদয়ের দু কূল ভরে, নিমাইএর জীবনেও এল সেই মুহূর্ত, উচ্ছল তরঙ্গ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর থেকে। মা শচীদেবী কাঁদলেন, কাঁদলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, আর কাঁদলেন নিত্যানন্দ ও অগণিত ভক্তবৃন্দ। নিমাই গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

মহাপ্রভু জীবের মুক্তির জন্য গাইলেন ঃ

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্ ॥

কিন্তু জগৎ নিত্যানন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল ঃ

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে ॥

আজও এই বৈষ্ণবরা সেই নামই গাইছেন। কী মায়া, কী মোহ এই নামগানে!

তাঁরা কখন থেমেছিলেন খেয়াল করি নি। আমার আচ্ছন্নতা ভাঙল তাঁদের একজনের প্রশ্নে। খাঁটি বাঙলা ভাষায় প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি বাঙলা দেশ থেকে আসছেন?

খাঁটি বাঙালী চেহারা, পোশাকেও ভুল হবার উপায় নেই। বললুম ঃ আজ্ঞে, খাস কলকাতা থেকে।

সুকণ্ঠ ভদ্রলোকের কথাগুলি যেমন মিষ্টি, মনটিও তেমনি। ভাব হতে সময় লাগল না। আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, বললেন, তাঁরাও ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁরা গৌরাঙ্গদেবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আসছেন এবং ফিরবেনও তাঁরই পথে।

আর এক ভদ্রলোক নিঃশব্দে হাত ঘোরাচ্ছিলেন। তিনি বাধা দিয়ে বললেন ঃ মহাপ্রভুর নাম নিয়ে কেন পাপ বাড়াচ্ছ শ্রীবাস। বল শখে বেরিয়েছি। কোম্পানির গাড়িতে চেপে মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করছি বোলো না।

শ্রীবাসবাবু বললেনঃ অত গোঁড়া হয়ো না তুলালদা। সে যুগে কোম্পানির গাড়ি থাকলে মহাপ্রভুও কি হেঁটে ভারত-প্রব্রজ্যায় বেরতেন?

তুলালদার হাত ঘুরতে লাগল আগের মতো, কোন উত্তর দিলেন না। শ্রীবাসবাবু তাঁর নোটবুক বার করে একখানি মানচিত্র দেখালেন। ভারতের মানচিত্র, তাতে একটি পথ আঁকা। বললেনঃ মহাপ্রভুর ভারত-প্রব্রজ্যার মানচিত্র। উত্তরে গৌড়, পূর্বে শ্রীহট্ট ও উত্তর-পশ্চিমে শ্রীবৃন্দাবন গিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি প্রথমে এলেন পুরী, পুরী থেকে রামেশ্বর, কন্যাকুমারী। তারপর মহারাষ্ট্র ও সৌরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষ করে ফিরলেন নর্মদা আর মহানদীর তীরে তীরে রসালকুণ্ড হয়ে পুরীতে। আমরাও এই পথে ভারত-ভ্রমণ করব বলে বেরিয়েছি।

শুনেছিলুম যে গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কর্মকার নামে এক ভক্ত মহাপ্রভুর ভৃত্য হয়ে তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরেছিলেন। তিনি নিতান্তই সাধারণ লোক ছিলেন এবং লেখাপড়াও জানতেন না বলে শুনেছি। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দেখা জিনিস সাদা কথায় তাঁর কড়চায লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মহাপ্রভুর ভারত-ভ্রমণের উপর গোবিন্দদাসের কড়চা একখানি আদি ও অকৃত্রিম গ্রন্থ। সেই প্রসঙ্গে উত্থাপন করতে শ্রীবাসবাবু আমার ধারণাকে মেনে নিলেন না. বললেনঃ গোবিন্দদাসের কড়চার রচনাভঙ্গি সুন্দর, নিতান্ত আধুনিকও বটে। পুরোপুরি জাল না হলেও এতে যে অনেক ভেজাল আছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই ছোট বইটিতে মহা-প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বিষয়ে অনেক নতুন কথা আছে।

একটু থেমে বললেনঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন পরম পণ্ডিত লোক। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনি যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন, তা লোকের মুখে শুনে। তাঁর কাব্যরস রসবেত্তার কাছে গভীর, কিন্তু ভ্রমণের ধারা সেখানে ব্যাহত হয়েছে। তাঁর বৃত্তান্তে পারম্পর্য রক্ষা হয় নি।

শ্রীবাসবাবু বললেনঃ বড় দুঃখ হয়, বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় সিদ্ধান্তের কথা এত স্বল্পকথায় কেন লিপিবদ্ধ করলেন! এ ঐশ্বর্যের কি তুলনা আছে কোথাও!

বললুমঃ কম বলেই তা ঐশ্বর্য শ্রীবাসবাবু। ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত হলে তার দামও কমে যায়।

শ্রীবাসবাবু বললেন ঃ পার্থিব ব্যাপারে আপনার যুক্তি খুবই সত্য বলে মানি। কিন্তু সোনাদানা ছাড়াও যে ঐশ্বর্য আছে, তার বেলাতেও এ নিয়ম খাটে কি! এই ধরুন মহাভারত—পৃথিবীতে এত বড় গ্রন্থ আর একখানা আছে বলে তো জানি না। তবু কি তার দাম আজও এতটুকু কমেছে?

এ কথা আমাকেও মানতে হল। বললুম ঃ সেখানে জানবার সমস্ত আগ্রহ মিটে গেছে। মহাভারত পড়ে আমরা যে আনন্দ পাই, সেটা পরম তৃপ্তির আনন্দ। সেখানে সমস্ত ঐশ্বর্য আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু খানিকটা যদি বলা না হত, খানিকটা ভেবে দেখবার অবকাশ যদি দিতেন বেদব্যাস, তা হলে কল্পনা দিয়ে সেই পদপূরণের কৌতূহল কি আমাদের অনুভূতিকে আরও রসসিক্ত করত না! যে ঐশ্বর্য ধরা দিল না হাতের মুঠোয়, তার দাম কি আরও বেশি বলে মনে হত না!

শ্রীবাসবাবু খানিকক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন ঃ আপনি কি কৃষ্ণ-দাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন?

সঙ্কোচের সঙ্গে স্বীকার করলুম যে সে বই পড়বার সুযোগ আমি পাই নি।

শ্রীবাসবাবু বললেন ঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে লেখা এই বইখানি আজও বাঙলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ রত্ন হয়ে আছে। এ শুধু জীবনী নয়, এমন উচ্চাঙ্গের দার্শনিক আলোচনা দেখি নি কোনও বাঙলা বইএ। একে ইতিহাস বলব, না দর্শন বলব, না কাব্য বলব, তা কোনও দিনই ভেবে পাই নি।

শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমার জানা ছিল না। বললুম ঃ শুনেছি যে বাল্যকালে মহাপ্রভু অতিশয় চঞ্চল ও দুর্বিনীত ছিলেন। কথাটা কি সত্যি?

শ্রীবাসবাবু আমার চৈতন্য-প্রসঙ্গ অবতারণার ভূমিকাটুকু ধরতে পেরে সুখী হলেন, বললেন ঃ গীতার সেই শ্লোকটি আপনার মনে আছে নিশ্চয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। দেশে তখন রাজনৈতিক অশান্তি আর সমাজে বিশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতা। উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত লোকেরা চাকরি নিয়েছে হোসেনশাহী দরবারে, আর নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভয়ে বা পীড়নে মুসলমান হতে শুরু করেছে। সেন বংশের সময়ে যে নবদ্বীপ বাঙলার তথা সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, তার গণ্ডি অনেক সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। সূক্ষ্ম ন্যায়-দর্শনের চরম বিকাশে সহায়তা করেছিলেন যে নিষ্ঠাবান পণ্ডিতমণ্ডলী, তাঁদের সংখ্যাও তখন কমে এসেছিল। বাঙলার সেই দুর্দিনে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হল পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং আর ধর্মসংস্থাপ-নার্থায়। মহাপ্রভুর নামকরণ হল বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই। কিন্তু উজ্জ্বল গৌরবর্ণের জন্য আত্মীয়স্বজন ডাকলেন গোরা বা গৌরাঙ্গ বলে। মহা-প্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে-ছিলেন। এবং মহাপ্রভুর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু হয়েছিল অল্প বয়সেই। আপনি মহাপ্রভুর যে উদ্ধত স্বভাব বা পাণ্ডিত্যের গর্বের কথার উল্লেখ করলেন, তা সম্পূর্ণ ভাবে দূর হয় গয়ায় ঈশ্বরপুরীর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষালাভের পর। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আর আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে পুরীধামে তাঁর তিরোভাব হয়। জীবদ্দশায় জনগণের পূজা পেয়েছেন যে সব মহাপুরুষ, মহাপ্রভু তাঁদের অন্যতম।

হঠাৎ শ্রীবাসবাবু লজ্জিত ভাবে বললেন: আমাদের মাত্রাজ্ঞান বড় কম। একবার মহাপ্রভুর কথা উঠে পড়লে আমরা আর থামতে চাই নে।

আমি বললুম: থামবার তো দরকার নেই শ্রীবাসবাবু।

আমাকে সম্পূর্ণ বলবার অবকাশ না দিয়ে শ্রীবাসবাবু বললেন: তার চেয়ে আপনাকে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের গল্প বলি।

শ্রীবাসবাবু আবার তাঁর মানচিত্রটি বার করলেন। বললেন ঃ এই নীলাচল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথম আলালনাথ আসেন, তারপর আসল এই শ্রীকূর্মমে। সেখান থেকে এই জীয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে।

নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতিস্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্তি সীতাপতি॥

সিদ্ধবট ভদ্রাচলে, শ্রীরামচন্দ্র এই পথে সীতা অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন। এই গোদাবরী নদী, এরই তীরে উড়িষ্যার রাজার প্রাদেশিক শাসনকর্তা রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রথম পরিচয় হয়। মহাপ্রভুর মনে হল যেন বৃন্দাবনের যমুনা এই গোদাবরী, ভাবে বিভোর হলেন মহাপ্রভু। এই হচ্ছে বিজয়ওয়াড়া, এর কাছেই কোথাও ছিল বৌদ্ধ অধ্যুষিত ত্রিমঙ্গনগব। ধর্ম-বিচারে মহাপ্রভু তাঁদের পরাস্ত করলেন। গোবিন্দদাস বলেন, সেই পাষণ্ডরাও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। বেদ-বিরোধী যারা, অশিক্ষিত গোবিন্দদাসের কাছে সেই নাস্তিকরা পাষণ্ড ছাড়া আর কি! এর পব ছোট লাইনের গা'ড়িতে চেপে নাণ্ডিয়ালের পথে আমরা শ্রীশৈলম এলুম। আজকাল বাস চলছে বলেই রক্ষা। তা না হলে আগের মতো বত্রিশ মাইল বাসে ঠেঙিয়ে আত্মাকুর। সেখান থেকে ছাব্বিশ মাইল পেদ্দা-চেরুভু মোটরে কিংবা গোযানে, তার পরের দশ মাইল পায়ে হেঁটে। কী দুর্গম সেই পথ! অনেকে ঘোড়ায় কিংবা ডুলিতে যেত মল্লিকার্জুনে মহাদেবের জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের প্রত্যাশায়। তার পর—

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্তি দেখি ভেঙ্কট অচলে॥

এই বালাজী দেখে মহাপ্রভু কেঁদে বুক ভাসালেন। সত্যিই এই বেঙ্কটেশ্বর বালাজীর তুলনা নেই। নাণ্ডিয়াল থেকে আমরা রেনিগুণ্টায় এসে নামলুম। সেখান থেকে তিরুপতি তিরুমালাই পাহাড়ে বালাজী দর্শন করে কাঞ্চীপুরম এসেছিলুম।

শ্রীবাসবাবু হঠাৎ আমার নাম জানতে চাইলেন ঃ এতক্ষণ আলাপ করছি, আপনার নামটি তো জানা হল না!

বললুম ঃ গোপাল।

সমস্বরে সকলে বললেন ঃ গৌর গৌর !

ছুলালদা মালা ঘোরাতে ঘোরাতেই আবার বললেন ঃ আহা, খাসা মানিয়েছে নামটি। গোপালের এমনি চেহারাই ছিল বটে।

আবার সকলে বললেন ঃ গৌর গৌর !

নিজের হাত ছুটো চট করে দেখে নিলুম। গায়ের রঙ কি এতই ময়লা? তবে এঁরা নবদ্বীপের গোস্বামী, গোপাল নাম নিয়ে তামাশা করবেন না, এটুকু ভরসা ছিল।

আমি খুবই লজ্জিত ভাবে বললুম ঃ তারপর ?

শ্রীবাসবাবু কবিতায় উত্তর দিলেন ঃ

শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ ॥

গোবিন্দ দাসের কড়চায় পাওয়া যায়, মহাপ্রভু কাঞ্চীতে ভবভূতি শ্রেষ্ঠীর অতিথি হয়েছিলেন। বিষ্ণুকাঞ্চীর লক্ষ্মীনারায়ণ ও ক্রোশ ছয়েক দূরে ত্রিকালেশ্বর শিব ও গৌরী দর্শন করেছিলেন। শিবকাঞ্চীর উল্লেখ নেই গোবিন্দদাসের কড়চায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ এখন আপনারা কোথায় চলেছেন ?

ভদ্রলোক মানচিত্রটি মুড়ে রেখেছিলেন, আবার খুলে বললেন ঃ আজ আমরা চিঙ্গলপেটে রাত কাটিয়ে সকালে মহাবলীপুরম যাব। গোবিন্দদাসের কড়চায় আছে যে মহাপ্রভু সেখানে শ্বেত বরাহকে নমস্কার করেছিলেন। এর পর বৃদ্ধাচলমের বৃদ্ধকাশী আর এই চিদম্বরমের পীতাম্বর শিব। তার পর—

কুম্ভকর্ণ কর্পরেতে সরোবর হয়।
সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময় ॥

তার পর স্বামীমলয় ও পাপনাশম হয়ে তাঞ্জোর। এখানে কাবেরী নদীর তীরে মহাপ্রভু গোসমাজ শিব দর্শন করেন। নাগোর আজ শুধু মুসলমানেরই তীর্থস্থান, কিন্তু মহাপ্রভু যে রাম লক্ষ্মণের মূর্তি দেখেছিলেন সে মূর্তি আজ আর সেখানে নেই। ত্রিচিনপল্লীতে মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্ট নামে এক শৈব ব্রাহ্মণের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ ও চাতুর্মাস্য করেছিলেন।

শোনা যায় যে মহাপ্রভুর সঙ্গে নানান শাস্ত্রালোচনা ও বিচার-বিতর্কের পর তিনি বৈষ্ণব হন। এখনও যাঁরা বেঙ্কটভট্টের শিষ্য বলে পরিচয় দেন, তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব, রামানুজ মতাবলম্বী নন। মহাপ্রভু রামেশ্বরে তিন দিন ছিলেন ও ভাবে বিভোর হয়ে শুধু নামসংকীর্তন করেছিলেন। মহাপ্রভু দর্ভশয়নমও গিয়েছিলেন ঃ

কৃত মালায় স্নান করি আইলা দুর্বেশন।
দুর্বেশন রঘুনাথে করি দরশন ॥

আমরা ধনুষ্কোডিও যাব। মাদুরাও আমাদের দেখতে হবে। মহাপ্রভু সেখানে রামদাস নামে এক রামায়েত বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায় যে জননী সীতাকে রাবণ স্পর্শ করেছে বলে রামদাস উপবাস করত। মহাপ্রভু তার সন্দেহ ভঞ্জন করেন, বলেন, রাবণ যে সীতা স্পর্শ করেছে সে মায়া সীতা। তার ধ্বংসের জন্যে এই ছলনা। রামদাস এই কথা শুনে উপবাস ভঙ্গ করে।

মানচিত্রের উপরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শ্রীবাসবাবু বললেন ঃ মহাপ্রভু এই পথে এসেছিলেন কন্যাকুমারীতে। তাম্রপর্ণীতে স্নান করে দেখেছিলেন নবতিকুপতি, আর পানাগুড়িতে সীতাপতি। কন্যাকুমারীর সাগরতীরে বসে মহাপ্রভু অঝোরে কেঁদেছেন ভাবাবেশে। গোবিন্দদাস বলেছেন, সেখানে—

দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য দেখে যার শুদ্ধ মন ॥

এই তাঁর ফেরার পথ। পয়স্বিনীর জলে স্নান করে আদিকেশব দেখলেন, ত্রিবেন্দ্রামে দেখলেন অনন্তশয্যায় পদ্মনাভ। মহাপ্রভু নীল-গিরির প্রাকৃতিক শোভা দেখেও বিহ্বল হয়েছিলেন। কোটগিরিতে পুণ্যতোয়া ভবানী নদীর উৎপত্তিস্থলে স্নান করতেও বাকি রাখেন নি। তারপর এলেন কাণ্ডার দেশে উড়ুপ কৃষ্ণ দেখতে। মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ এইখানেই শেষ। এর পর মহিসুরের চিতোল ও মহারাষ্ট্রের পুণা নাসিক দমন ভরোচ আমেদাবাদ হয়ে সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ করলেন। দেখলেন সোমনাথ জুনাগড় ও দ্বারকা। তার পর দোহদের পথে এলেন

নর্মদার উত্তর তীরে। বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ দিয়ে রায়পুর পেরিয়ে ধরলেন মহানদীর উত্তর তীর। সম্বলপুর ছাড়িয়ে মহানদী ডিঙোলেন। তার পর রসালকুণ্ড হয়ে আবার পুরী।

মানচিত্রটি ভাঁজ করে এবারে নোটবুকের ভিতর পুরলেন।

বাহিরে অন্ধকার তখন গভীর হয়েছে। গোঁসাইরা নির্বিকারভাবে হাত ঘুরিয়ে চলেছেন। শ্রীবাসবাবু গুন গুন করে আবার গান ধরলেন—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

আজ আমরা শ্রীচৈতন্যকে ধর্মপ্রচারক বলি বা ভগবানের অবতার বলি, এতে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর শিক্ষা সার্বজনীন সনাতন আদর্শসম্ভূত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে প্রেম আর হৃদযে ভক্তি আনবার জন্যে নামসংকীর্তন—একে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলা যেমন সঙ্গত হবে, ধর্ম বা রিলিজিযান বলা তেমন শোভন হবে না। আজ আমরা তাঁর দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি সংহত করে জাতিগঠনের প্রচেষ্টাকে ভুলে গেছি। হিন্দু-সমাজে তখন সংকীর্ণতা ঢুকেছে, সকল জাতিবর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চয়েব অধিকার হারিয়েছে। শ্রীচৈতন্য আনলেন সেই অপূর্ব প্রেরণা। মানুষে মানুষে প্রভেদ কী করে হয়, মানুষ তা ভুলে গেল। আজ বাঙালীকে স্বীকার করতেই হবে তাব প্রথম জাগরণের দিনের কথা। শুধু ধর্মে নয়, দার্শনিক চিন্তায সাহিত্যে সঙ্গীতকলায় বাঙালীর অন্তর্নিহিত প্রতিভা সর্বত্রই মূর্ত হয়ে উঠল।

শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত বা জাতিগত দানের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর রাষ্ট্রগত দান আজও অমর হযে আছে। আমরা তাঁর কাছেই প্রথম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখেছি, নিরীহ অবনমিত জনগণের নির্ভীক নিরস্ত্র জাগরণ। সেই হোসেনশাহী রাজদরবারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাঙলার বৈষ্ণবরা যখন নির্যাতিত, শ্রীচৈতন্য বিদ্রোহ জানালেন শান্ত সংঘবদ্ধ ভাবে। রাজাজ্ঞা অমান্য করে নামকীর্তনের অনুষ্ঠান হল প্রতি দিন, শোভাযাত্রায় নগর পরিক্রমা করলেন হরিনাম বিলিয়ে। আজ রাজনৈতিক চরম পরিণতির দিনে আমরাও শোভাযাত্রা করি। কিন্তু হরিনামের বদলে শ্লোগান দেই। ভারত স্বাধীন হবার পূর্বে আমাদের

নেতারা শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এই পথই অবলম্বন করেছিলেন। এই পথই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবার শাশ্বত পথ।

খোলে আবার চাঁটি পড়ল, আর করতালের মচমচানি। শ্রীবাসবাবুর গুন গুন স্বর উচ্চকিত হয়ে উঠল নতুন আনন্দে ঃ

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে!

আমরা কি চিঙ্গলপেট পৌঁছে গেলুম!

২০

ইণ্ডো-সিলোন এক্সপ্রেসে মামার রিজার্ভ করা বার্থ এল। দুখানার পরিবর্তে তিনখানা পাওয়া গেছে বলে মামীও নিশ্চিন্ত হলেন। দুর্ভাবনা মামারই বেশি ছিল। পা ছড়িয়ে ঘুমোবার জায়গা না পেলে যাওয়া উচিত হবে কি না সে কথাও তিনি ভাবছিলেন। এবারে খুশী হয়ে বললেন ঃ কী অদ্ভুত গাড়িখানা দেখেছ গোপাল ?

মালপত্র ওঠানো হচ্ছিল। দেখলুম যে গাড়িখানা আমাদের দেশের মতো নয়। একটা ছোট দরজা দিয়ে উঠে দু পাশে দুখানা কামরা, তাদের দরজা মুখোমুখি, মাঝখানে বারান্দার মতো। বেশ পরিচ্ছন্ন কামরা, দু দিকে জানলার নিচে দুখানা বার্থ, উপরে দুখানা বাঙ্ক, ওধারে ল্যাভেটরি। পাশের কামরায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দরজা বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন। এ গাড়ির ভদ্রলোক ছিলেন জেগে। তিনি নিঃশব্দে সবকিছু দেখছিলেন। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই বোধ হয় মামা আমাকে বললেন ঃ তুমিও এ গাড়িতে চল গোপাল, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।

এ কথার উত্তর দিলে মামা অসন্তুষ্ট হবেন। তাই কথা না বলে মালপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগলুম। মামী তাঁর মুখের পান সামলাচ্ছিলেন, আর স্বাতি দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছিল।

কুলিরা বিদায় নিলে আমি আমার ব্যাগ আর চাদর-বালিশ সংগ্রহ করে নিলুম। মামা বললেন ঃ কোথায় যাচ্ছ ?

আমি দরজা দিয়ে বেরবার সময় বললুম ঃ নিজের জন্যে একটু জায়গা দেখে নিই।

মামা বললেন ঃ এই গাড়িতেই জায়গা হবে। আমি তাদের বলে দিচ্ছি, তারা ভাড়া নিয়ে নেবে।

তখন আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছিলুম। বললুম: তার আর কী দরকার মামাবাবু, এ ট্রেনে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে।

অন্ধকারে বুঝতে পারলুম না, তাঁকে আঘাত দিতে পেরেছি কি না! কিংবা ভদ্রতারই উত্তর দিয়েছি ভদ্রলোকের মতো! এগিয়ে যাবার সময় মামীর কথা শুনতে পেলুম: হল তো! আত্মসম্মান বোধটা তোমার একচেটে নয়।

দু একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারতেই একটি বাঙালী দম্পতি দেখতে পেলুম। এ ভুল হবার নয়। গাড়িতে উঠবার আগে আমি চিরদিনই সঙ্গী খুঁজি। বাঙালী না হলেও ক্ষতি নেই, শিক্ষিত ভদ্রলোক হলেই হল, যাঁর সঙ্গে সময় কাটানো যাবে ভাবের আদান-প্রদান করে। অপর পক্ষেরও মনোভাব বুঝতে পারি। ভদ্রলোক তারা এড়িয়ে চলে, নিতান্ত স্থানাভাব হলেই ওঠে ভদ্রলোকের গাড়িতে। আমরা তাদের স্বাধীনতায় যেন কাঁটার মতো।

ভদ্রমহিলা একটা কোণায় একখানা শতরঞ্চির উপর শুয়ে ছিলেন, ভদ্রলোক বসে ছিলেন পাশে। আমাকে উঠতে দেখে একটু সোজা হয়ে বসে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিলেন। আরও দুচারজন ভদ্রলোক ছিলেন, বেশ একটু শুয়ে বসে আসছিলেন তাঁরা। স্থির জলে একটা ঢিল পড়বার মতো খানিকটা তরঙ্গ উঠে আবার সব শান্ত হয়ে গেল।

দু একজন বাঙ্কের উপরে বিছানা বিছিয়ে কথা কইছিলেন নিচে বসে। আমিও উপরে আমার চাদর বিছিয়ে নিচে বসলুম। রাত বেশি হয় নি। সাড়ে নটার কাছাকাছি হবে সময়। বাঙালী ভদ্রলোক আমার বিছানা বিছানো দেখে বললেন: অনেক দূর যাবেন বুঝি?

বললুম: তাঞ্জোর।

ভদ্রলোক বললেন: আমরা ভিলুপুরমে নামব।

এবারে প্রশ্ন করবার পালা আমার। বললুম: অনেক দূর থেকে আসছেন মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন: খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাই না? সত্যিই অনেকটা পথ এসেছি। কাল সন্ধ্যে বেলায় নাগপুর ছেড়েছি

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে। আজ সন্ধ্যে বেলায় সে গাড়ি থেকে নেমে এ গাড়িতে চড়েছি।

বললুম ঃ ভিলুপুরম কি খুব বড় জায়গা?

ভদ্রলোক বললেন ঃ মোটেই না। আমরা যাচ্ছি কোডাইকানাল পাহাড়ে। কর্ড লাইনের কোন ট্রেনে উঠলে সোজা কোডাইকানাল রোডেই নামতে পারতুম। কিন্তু পণ্ডিচেরীতে আমাদের একটু কাজ আছে বলে ভিলুপুরমে নামছি। কাল ভোরবেলায় পণ্ডিচেরী যাব, সেখান থেকে ফিরে কোডাইকানাল।

ভদ্রলোকের বয়স কম, ত্রিশের নিচেই হবে। স্ত্রীও অল্প বয়সের। আড়চোখে আর একবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন ঃ আসল কথা কী জানেন? আমার বউ পাহাড় একটু বেশি ভালবাসে। তাই আজ এ পাহাড়, আর কাল সে পাহাড় করে আমায় বেড়াতে হয়।

ভদ্রলোক গল্প করতে ভালবাসেন দেখলুম। নিজের পরিচয় দিলেন। নাম দত্ত। নাগপুরের টিকিট কালেক্টর। বছরে তিন সেট ফ্রী পাস পান। তাই রেলে বেড়াবার এই সুবিধে। তা না হলে তাঁর মতো অবস্থার লোকের বছরে তিনবার করে বেড়ানো কি সম্ভব হত! তবে তিনবারই পাহাড়ে যান না। একবার শ্বশুরবাড়ি যান জামাই-ষষ্ঠীতে, পূজোতে পাহাড় দেখেন। আর এক সেট পাস বছরের শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে হয়। দেশে বুড়ো বাপ মা আছেন—কখন দরকার হয় ছুটে যাবার, তার তো ঠিক নেই! শেষ পর্যন্ত দরকার না হলে শ্বশুরবাড়িই ঘুরে আসেন আর একবার। পণ্ডিচেরী যাবার দরকারটুকুও বুঝিয়ে বললেন। তাঁর মামাশ্বশুরের এক ছেলে আশ্রমে থাকে। বাপ শয্যাশায়ী খবর পেয়ে জানিয়েছিল যে মায়ের কৃপায় ভাল হয়ে যাবেন। মামাশ্বশুর ভাল হয়ে জানতে চেয়েছেন, ছেলে আশ্রমে কী করে, আর আশ্রমটা কাদের।

বলে হাসতে লাগলেন।

বউটি মিটমিট করে চেয়ে দেখছিলেন আর গল্প শুনছিলেন।

আমি বললুম ঃ উটকামণ্ডকে পাহাড়ের রাণী বলে শুনেছি। কিন্তু

আপনারা সেখানে না গিয়ে কোডাইকানাল যাচ্ছেন শুনে বেশ আশ্চর্য লাগছে।

দত্ত রসিয়ে রসিয়ে হাসলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেনঃ সে আর বাকি নেই দাদা। ম্যাপ দেখে দেখে এক নম্বর পাহাড় সব দেখে ফেলেছি। এখন সব দু নম্বর দেখছি। তবে আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলি যে পাহাড়ে বেড়াতে হলে উটিতেই বার বার যাওয়া উচিত। কী অপূর্ব উটির মায়া!

পকেট থেকে এক প্যাকেট মেপোল সিগারেট বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বললেনঃ একটা চলবে দাদা?

আমি সিগারেটে অভ্যস্ত নই। ধন্যবাদ জানিয়ে হাত গুটিয়ে রইলুম।

ভদ্রলোক একটা মুখে পুরলেন ও গোটা কয়েক দেশলায়ের কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া নিয়ে খানিকটা কেশে বললেনঃ আমিও আগে খেতুম না, সম্প্রতি খাওয়া ধরেছি।

তারপর গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললেনঃ সিগারেটের গন্ধটা বউএর ভাল লাগে কিনা, তাই ধরতে হল। কড়া সিগারেট এখনও টানতে পারি নে। তাই এই ছোট সিগারেট খাই। বন্ধুরা বলে, এ নাকি লেডিজ স্মোক!

ঘন ঘন বার দুই তিন সিগারেটে টান দিলেন আর জোরে জোরে ধোঁয়া বার করলেন ফুঁ দিয়ে। বললেনঃ নাকে ধোঁয়া গেলে বড় অস্বস্তি বোধ হয়।

আমি সমর্থন করলুম। উত্তরপাড়ায় আমার জানলার পাশে একজন বালতির উনুন ধরাত। আমি জানি নাকে ধোঁয়া গেলে কী কষ্ট হয়!

দত্ত বললেনঃ সবাই বলে সিগারেট নাকি খেতে খেতেই ধাতস্থ হয়।

বললুমঃ তা হয়। তবে সে কম বয়সে ধরলে হয়।

দত্তর সিগারেট তখন আধখানা পুড়েছিল। আর একটা টান দিয়ে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন। পকেট থেকে লবঙ্গ বার করে মুখে পুরলেন একটা। বললেনঃ একটু তেতো হয় মুখটা। তাই একটা লবঙ্গ ফেলি মুখে।

বেশ বুঝতে পারা গেল যে ভদ্রলোক স্ত্রীর শখের জন্যেই সিগারেট খাওয়া ধরবার চেষ্টা করছেন। আর সেটা না খেতে হলেই আবাম পেতেন বেশি। যতক্ষণ সিগারেট ছিল মুখে, মনও ছিল সেই দিকে। এবার সেটা ফেলে দিয়ে পুরনো গল্প শুরু করলেন। বললেন: আপনি ঠিকই বলেছেন উটির কথা। পাহাড়ের রাণীই বটে। কিন্তু আমার বউ কী বলে জানেন? বলে, রাণী নয়, মেথরাণী।

বলে হাসতে হাসতে বললেন: আপনি উটি গেছেন নিশ্চয়ই?

আমি যাই নি শুনেই চমকে উঠলেন, বললেন: উটি দেখেন নি! ছি ছি, করেছেন কী!

এমন একটা কর্তব্যকর্ম করি নি ভেবে নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হল। কৈফিয়ত দেবার মতে করে বললুম: কী কাবি বলুন ভাই, যা দূরে থাকি, তার ওপর—

ও, বুঝতে পেরেছি। আপনাদের বেড়ানোটাও তো একটা শৌখিন ব্যাপাব। রেলের যা ভাড়া হয়েছে আজকাল! দেখুন দাদা—

আমি বয়সে তাঁর ছোট না বড়, সে খবর জানা হয নি। কিন্তু দত্ত আমাকে 'দাদা'ই বলছেন বারে বারে। বললেন: যখন রেলে ঢুকি, বন্ধুবান্ধবেরা বললে, লেখাপড়া শিখে বেলে ঢুকছিস কেন? একটু দ্বিধা এসেছিল মনে। কিন্তু এখন দেখছি যে বেলে না ঢুকলে বছরে বছরে বউকে এমন পাহাড় দেখাতুম কী করে! আপনিই বলুন দাদা, এই সামান্য মাইনের চাকরি—

একটু গলা নামিয়ে বললেন: দুটো উপার-পযসা আছে বলেই বেঁচে আছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন দাদা, গোড়ায আমি এক পযসা নিতুম না। ভাবতুম যে লেখাপড়া শিখেছি, অন্যায় করব না। পরে দেখলুম যে অন্যায় বলে যা জানতুম সে তো অন্যায় নয়, ন্যায়-অন্যায়েব সংজ্ঞা একেবারে পাল্টে গেছে। আপনাকে বলব কী দাদা, এমন বিপদে পড়লুম যে চাকরি যায় আর কি! বুড়োরা বললেন যে বেলে বিনে টিকিটে লোকে চিরকাল চড়েছে, চড়বেও। তা নিয়ে যাত্রীদের ওপর এমন জুলুম কেন! গেটে টিকিট নেবার সময় দুটো হাতই বাড়িয়ে রাখ। যার টিকিট আছে সে

তোমার ডান হাতে টিকিট দেবে, আর যার নেই সে তোমার বাঁ হাতে কিছু দিয়ে যাবে। আধুলি দিল কি আধলা দিল দেখবে না, যে কিছু না দেবে তাকেও যেতে দাও। তখন কি অত শত জানতুম ! বিনে টিকিট দেখলেই ঠুকে চার্জ করতুম। তারপর একদিন যখন অফিসারদের সামনে পেশ হলুম, তখন দেখলুম যে আমার চেয়ে খারাপ লোক আর পৃথিবীতে নেই। আমি অভদ্র ইতর দুর্বিনীত, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে শিখি নি, মহিলাদের ইজ্জত রাখতে জানি নে—পাবলিকের আরও অনেক কমপ্লেণ্ট পড়েছে তাঁদের হাতে। বুড়োদের চেষ্টায় সে যাত্রায় চাকরি বাঁচল, ধার করে দু শো টাকা দিযেছিলুম তাঁদের হাতে। কিন্তু বদলিটা এড়ানো গেল না, একটা জঙলি স্টেশনে গিয়ে পড়লুম। অফিসের বাবুরা পরামর্শ দিল, আর দু শো টাকা খরচ করলেই দু মাসের ভেতর শহরে ফিরিয়ে আনব। সত্যি বলছি দাদা, ভেবেছিলুম জঙ্গলেই পড়ে থাকব। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হল বউএর জন্যে। নতুন বউ বললে, অমন জঙ্গলে ঘর করতে যাব না। কী বলব দাদা, সেই প্রথম বাঁ হাত পাতলুম, আর সেই বাঁ হাতের টাকা ডান হাতে অফিসে পৌঁছে নাগপুরেই আবার ফিরে এলুম। এখন বুড়োদের কথা শিরোধার্য করেছি। এখন নাগপুরের পাবলিক কী বলে জানেন ?

পরম গৌরবে হাসতে হাসতে দত্ত বললেন ঃ এখন সেই সব লোকই বলে, দত্তবাবু না থাকলে নাগপুর স্টেশনই বন্ধ হয়ে যাবে।

দত্তকে হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে পড়তে দেখলুম। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, বউএর ভৎর্সনা দেখেছেন তাঁর কঠিন দৃষ্টিতে। ভৎর্সনা করবারই কথা। একজন অজ্ঞাত অপরিচিত যাত্রীর কাছে নিজের দুর্বলতার কাহিনী বর্ণনায় সাবল্য থাকতে পারে, পৌরুষ নেই। মেয়েরা পুরুষকে ভালবাসে না, ভালবাসে তার পৌরুষকে। মেয়েদের ভালবাসার এই রীতিই চলে আসছে পৃথিবীর আদিম বর্বর যুগ থেকে।

ভদ্রলোক কিন্তু থামবার পাত্র নন। বললেন ঃ কী বলছিলুম যেন আপনাকে ? এই আমার একটা বড় দোষ। কথা বললে বলতে খেই হারিয়ে ফেলি।

বললুম ঃ উটির গল্প বলছিলেন।

দত্তর মনে পড়ল সেই কথা। বললেন ঃ হ্যাঁ দাদা, সুন্দর দেশ! পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট পাহাড় সমুদ্রের ধারে ধারে দক্ষিণে বরাবর নেমে এসে এই নীলগিরি পাহাড়ে মিলেছে। পশ্চিম ঘাট প্রায় পাঁচ হাজার আর পূর্ব ঘাট দু হাজার ফুট উঁচু। নদীগুলোও তাই পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের সমুদ্রে এসে পড়েছে। আর একটু দক্ষিণে নেমে আমার ভূগোলের জ্ঞান সব গুলিয়ে যায়। কোন্‌টা আন্নামালাই পাহাড় আর কোন্‌টা পাল্‌নি হিল্‌স্‌, কোডাইকানাল পাল্‌নি হিল্‌সের দক্ষিণাংশ না স্বতন্ত্র একটি পাহাড়, তা ঠিক ধরতে পারি নে। কার্ডেমাম পাহাড় কিন্তু ভুল হয় না। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সমুদ্র থেকে খানিকটা দূরে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নেমে গেছে। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, ৮৮৬০ ফুট উঁচু আনাইমুদি শৃঙ্গ দক্ষিণ-ভারতের সব চেয়ে উঁচু পাহাড়, কিন্তু এটি যে কোন্‌খানে তা জানি নে। নীলগিরির ডোডাবেটায় উঠেছি, উচ্চতা ৮৭৯০ ফুট। চারি দিকের দৃশ্য যে কী অপূর্ব আপনাকে কী বলব?

আমি কল্পনায় সে দৃশ্য দেখলুম। মনসা হিমালয়ং গচ্ছতি যদি সম্ভব হয় তো আমি ডোডাবেটায় উঠে চারি দিকের শোভা দেখছি, এ কথা ভাবতে পারব না!

ভদ্রলোক আমায় একটা ঠেলা দিয়ে বললেন ঃ আপনি ঘুমচ্ছেন নাকি দাদা?

একটু চমকে উঠে সামলে নিয়ে বললুম ঃ না, ডোডাবেটায় উঠে চারি দিকের দৃশ্য কল্পনা করছিলুম।

ভদ্রলোক বলে চললেন ঃ আমি জানি আপনার ভাল লাগবে এই গল্প। জানেন, নীলগিরি পাহাড়ে তিনটি শহর আছে। মেট্টুপালায়ম থেকে ন্যারো গেজের গাড়িতে চড়ে প্রথমে পড়ে কুন্নুর—প্রায় ছ হাজার ফুট উঁচুতে, তার বারো মাইল পরে উটি। উঁচু প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট। কিন্তু আমার যে শহর ভাল লাগে সেখানে রেল নেই, ধোঁয়া ধুলো ইঞ্জিনের শব্দ নেই, যাত্রীর ঠেলাঠেলি আর ভেণ্ডারদের চেঁচামেচি নেই। কোটাগিরি সত্যিই ভারি সুন্দর জায়গা। কুন্নুর থেকে মোটর-

বাসে চোদ্দ মাইল এক ঘণ্টার পথ, উঁচু প্রায় পাঁচ শো ফুট বেশি। উটি থেকেও আসা যায় একটা ঘাট রাস্তায়, একুশ মাইল পথ। যাঁরা প্রকৃতিকে ভালবাসেন আর সত্যিকার বিশ্রাম চান, তাঁদের কোটাগিরিই বেশি ভাল লাগবে।

দত্ত উটির গল্প ফাঁদলেন, বললেনঃ কিন্তু উটিতে নেই কী? দিশী বিলিতী হোটেল, রাজারাজড়ার বাড়ি থেকে টোডাদের কুঁড়ে পর্যন্ত। রেস খেলতে ভালবাসেন? আসুন মে মাসে। গল্‌ফ্ খেলেন? আছে চমৎকার আঠারো-হোল গল্‌ফ্-কোর্স। শিকারে আপনার শখ? উটি তো তা হলে আপনার স্বর্গ, ছোট বড় সব রকমের শিকার পাবেন সেখানে। মাছ ধরতে চান তো অ্যাভেলাঞ্চ আর পাইকারা নদীতে বসুন ছিপ ফেলে। নৌকো বাইতে ভালবাসেন তো বোট-ক্লাবে যোগ দিয়ে সারা দিন লেকের ওপব নৌকোতেই পড়ে থাকুন। আর যদি ফুলের শৌখিন হন তো আসুন মে মাসে। এমন বোটানিক্যাল গার্ডেন নেই সারা পূর্বদেশে, আর পৃথিবীর সমস্ত ফুল দেখতে পাবেন এখানকার ফ্লাওয়ার শো-তে। যদি নিজের মোটর থাকে, আর মোটর চালিয়ে আনন্দ পান তো অন্যখানে যাবেন না। আর যদি কোন শখই না থাকে, তবু আসবেন উটিতে। লেকের ধারে বসে বসে শুধু চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে যাবে আপনাব। বড় বড় ওক পপলার আর ইউক্যালিপ্টাস গাছে ঘেরা এমন লেক কি কোথাও আছে! বরফ পড়া দেখেছেন? শীতকালে এখানে বরফও পড়ে পেঁজা তুলোর মতো। যদি শীতকাতুবে হন তো পালিয়ে আসবেন কুনুরে। সেখানেও সব আছে, শুধু বরফ পড়া নেই।

বললুমঃ এত সব ফেলে তবে কোডাইকানাল যাচ্ছেন কেন?

দত্ত গলা নামিয়ে বললেনঃ বউ নতুনত্ব বড় ভালবাসে। পুরনো জিনিস একেবারেই দেখতে চায় না।

আমিও তেমনি মৃদু স্বরে বললুমঃ বড় বিপদ তো আপনার—আপনিও তো দিন দিন পুরনো হচ্ছেন!

ভদ্রলোক রহস্যটা সরল ভাবেই নিলেন, বললেনঃ বেশ বলেছেন কথাটি, নিরিবিলি জিজ্ঞেস করে দেখব।

কী একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করল। ভিল্লু-পুরম পৌঁছতে এখনও আধ ঘণ্টার উপর বাকি। দত্ত কোডাইকানালের গল্পও বললেনঃ জানেন দাদা, কোডাইকানালকে অনেকে নন্দনকানন বলে। সারা বছর এমন ফুলের বাহার নাকি নন্দনকাননেও নেই। সেখানেও আছে একটি লেক, মাইল তিনেক তার পরিধি। আর এই লেক ঘিরে নাকি সুন্দর মোটরের রাস্তা।

একটু বিমর্ষ ভাবে বললেনঃ তবে কি জানেন দাদা, এক শো মাইলের মোটর ভাড়া দিতে হচ্ছে আমাদের। বিনি পয়সায় বেড়ানো অভ্যেস, গায়ে লাগে গাঁটের কড়ি খরচ করতে।

ক্লান্তিতে আমার চোখ বুজে আসছিল। তা দেখতে পেয়েছিলেন দত্তর বউ। ঘড়ি দেখে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, বললেনঃ রাত কত হল জান?

দত্ত চমকে উঠলেনঃ সত্যিই তো! আমাদের যে নামতে হবে এখুনি।

বলেই তৎপর হয়ে উঠলেন শতরঞ্জিখানা নিয়ে। একবার আমার দিকে ফিরে বললেনঃ বুঝলেন দাদা, গল্পে গল্পে কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গেল বুঝতেই পারলুম না।

আমি বুঝতে পারলুম যে দত্তর বউ এর উত্তর দেবে আরও কিছু দিন গেলে, কোলে কাঁকালে একটি দুটি কাচ্চাবাচ্চা উঠলে।

ভিল্লুপুরমে দত্তরা নেমে গেলেন। আমি উঠলুম বাঙ্কের উপর। গাড়িতে যাত্রীও উঠল কিছু। যারা ওঠে, তারা নামবার লোকের ইজ্জত রাখে না। প্রথমটায় দেশীয় প্রথায় ঠেলাঠেলি হয় কিছুক্ষণ, শেষ পর্যন্ত কুলিরাই সমস্যার সমাধান করে। যাঁরা উঠবেন, তাঁদের কুলিরা ওঠে আগে। যাঁরা নামবেন, তাঁদের কুলিরা নামে তার পরে। এবারে নিচের যাত্রীরা উপরে ওঠেন, তারপর উপরের যাত্রীরা নিচে নামেন। নিচে নেমে পুরনো যাত্রীরা ভাবেন, উপরে কিছু রয়ে গেল কি না, অনেক মালপত্র দেখেছেন নামবার সময়। আর গাড়িতে উঠে নতুন যাত্রীরা ভাবেন, কিছু

রয়ে গেল না তো নিচে, অনেক মালপত্র দেখা যাচ্ছে সেখানে। বাক্স বিছানা পোঁটলা পুঁটলি সামলে কুলি বিদায় করতেই বেশ খানিকটা সময় লাগে। গাড়ি যত কম সময় দাঁড়ায়, বিশৃঙ্খলা হয় তত বেশি।

গাড়ি ছেড়ে দিতেই চোখ বুজলুম। আর এক দত্তের সঙ্গে দেখা হলেই রাতে ঘুমের দফারফা হবে।

২১

নিচে দুই ভদ্রলোক হিন্দীতে গল্প শুরু করেছিলেন। তাঁদের একজনের গল্প শুনে হালদারের কথা মনে পড়ল। শোনবার ইচ্ছে না থাকলেও কানে এসে এমন কর্কশ ভাবে আঘাত করে যে না শুনে উপায় নেই। হিন্দীতে যে আলাপ হচ্ছিল, তার বাঙলা কতকটা এই রকম—

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে শ্রীমার ব্যবস্থাই চিরকাল চূড়ান্ত ছিল, এ কথা একজনের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আব একজন বললেনঃ বিশ্বাস না করে আর উপায় কী, নিজের কানেই তো শুনে এলে!

প্রথম ব্যক্তি বললেনঃ কিন্তু সব শোনা কথাই তো আর সত্যি হয় না!

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিবাদ করলেন, বললেনঃ মায়ের চেষ্টাতেই এই আশ্রম গড়ে ওঠে, আব শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে মা তার সর্বময়ী কর্ত্রী হবেন, এতে এমন অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে?

আমার মনে পড়ল সেই দিনের কথা, যখন ভারতে বাণিজ্য করতে এসে ফরাসীরা পণ্ডিচেরীতে কুঠী তৈরি করল। সে বোধ হয় ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তারপর পশ্চিমে ইংরেজ-ফরাসীর যুদ্ধের সঙ্গে তাল রেখে ভারতে ইংরেজ-ফরাসীর মন-কষাকষি। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সমুদ্রপথে পণ্ডিচেরী অবরোধ করল, কিন্তু ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে তিন হপ্তা পরে পালিয়ে বাঁচল। পণ্ডিচেরী ফরাসীরই রয়ে গেল। দীর্ঘকাল পণ্ডিচেরী ফরাসীর ছিল।

ঘুমোবার জন্যে যখন ছটফট করি, ঘুম তখন আসে না। গাড়িতে কি সকলেরই ঘুম আসে না!

পণ্ডিচেরী পত্তনের তারিখটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে এল। মনে হল যে পণ্ডিচেরীর পত্তন হয়েছে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের চৌঠা এপ্রিল, যেদিন

লোকচক্ষুর আড়ালে শ্রীঅরবিন্দ এসে নামলেন তার মাটিতে। মহাবলীপুরমের ছখানা রথ চলে গেছে সমুদ্র গর্ভে, ডুপ্লের মূর্তিও এক দিন যাবে। কিন্তু যা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে আপন মহিমায় সে এই আশ্রম—জন তিন চার সঙ্গী নিয়ে যার পত্তন হয়েছিল সেদিন, আর শ্রীমার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ যা সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ডুপ্লের নাম আছে ইতিহাসেব পাতায় আর শ্রীঅরবিন্দের নাম রইল মানুষের বুকে। এক দিন যে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে, নতুন মানুষের নতুন পৃথিবী, শ্রীঅরবিন্দ সেই অক্ষয় অরোভিলের ঋত্বিক।

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পনেরই অগস্ট। যে স্বাধীনতার জন্য তিনি জীবন পণ করেছিলেন, সেই স্বাধীনতাও আমরা পেয়েছি পনেবই অগস্ট। তাঁর পিতা ডাক্তাব কৃষ্ণধন ঘোষ বিলেত-ফেরত সিভিল সার্জন। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর ছেলে ধোপদুরস্ত সাহেব সিভিলিয়ান হবে। কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে নরাণাং মাতুলক্রমঃ। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণকুমারী তাঁর মা। ছেলের নাড়ীতে তিনি দিলেন দেশাত্মবোধেব বীজ। সাত বছর বয়সে শ্রীঅববিন্দ বিলেত গেলেন তাঁর দুই দাদার সঙ্গে ইংরেজ পরিবারে থেকে সাহেব হতে। পিতার নির্দেশে শুধু পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গেই পরিচিত হতে লাগলেন। পণ্ডিত হলেন গ্রীক আর লাতিনে, ফরাসী শিখলেন ফরাসীর মতো, জর্মন আর ইতালিয়ান শিখে গ্যেটে আর দাঁতে পড়ে তাব রসগ্রহণ করলেন।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে তিনি দু বছর শাগরেদি করলেন। শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় না চড়ার জন্য তাঁর চাকরি হল না। লোকে জানে যে তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন নি। যারা সত্যি কথা জানে যে তিনি পরীক্ষা দিতেই আসেন নি, তাদেরও অনেকের সন্দেহ যে ঘোড়ায় চড়তে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু কটা লোক তাঁর অন্তরের খবর রাখত! পশ্চিমেব দেশগুলিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরব স্বাধীনতার আনন্দ ও জনগণের কল্যাণের প্রচেষ্টা দেখে দেখে তাঁর হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিল আপন দেশমাতৃকার দুঃখে! কী হবে ঐশ্বর্যে ও রাজানুগ্রহে!

সত্যিকার দেশসেবা কি গোলামিতে, না গোলামিতে কোন যশ আছে। আঠারো বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন। শৃঙ্খলমুক্ত মাতৃভূমি আবার তাঁর লুপ্ত মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চাকরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি দেশের বাহবা নিলেন না, চাকরিতে অকৃতকার্য হয়ে তিনি শনির দৃষ্টি এড়ালেন।

চোদ্দ বছর বিলেতে কাটিয়ে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরলেন। বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গুণগ্রাহী, বিলেতেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। নিজের রাজ্যে রাজস্ব-বিভাগের চাকরি দিলেন তাঁকে। কিন্তু অল্প দিনেই যখন বুঝতে পারলেন যে গতানুগতিক রাজকার্য শ্রীঅরবিন্দের নয়, তখন বরোদা কলেজে প্রথমে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনার ভার দিলেন, পরে তাঁকে সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজীতে কবিতা লেখা শুরু করেন চোদ্দ বছর বয়সে। তাঁর পরবর্তী সমস্ত কবিতাই বরোদায় লেখা। যোগজীবনে তিনি শুধু সাবিত্রী মহাকাব্যই রচনা করেছেন। বরোদায় অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধ্যয়নও করেছেন ছাত্রের মতো। ভারতীয় ভাষা দর্শন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করেন। সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমাব বায বরোদায় গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে বাঙলা শেখায় সাহায্য করেন।

এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বিবাহ করেন মৃণালিনী দেবীকে। ঘর বাঁধবার মোহ যে তাঁর ছিল না তা বোঝা যায় তাঁর টুকরো কথায়। স্ত্রীকে বলে-ছিলেন, 'পাগলের সঙ্গে পাগলী হতে।'

-তাঁর স্বাধীনতার সাধনার শুরু এই সময়। বিলেতে থাকতেই তিনি স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের কাজ করতেন, মাঝে মাঝে বক্তৃতাও দিতেন। এবারে জোরালো ভাবে বোম্বাইএর ইন্দুপ্রকাশ পত্রে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন জনজাগরণের জন্যে। বরোদায় বাঙলায় ও মহারাষ্ট্রে যে বিপ্লবীরা গোপনে তাঁদের যজ্ঞাগ্নি জ্বেলেছিলেন, তাঁরা কেউ প্রত্যক্ষে কেউ পরোক্ষে তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছেন। বিলেতে তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আর বাঙলার বিপ্লবের প্রকাশ্য নেতা ছিলেন তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ছিল ইংরেজ প্রভুর কাছে আবেদন নিবেদন, ক্বচিৎ কদাচিৎ নিতান্ত নরম ভাষায় ক্ষীণ প্রতিবাদ। সেদিন স্বাধীনতার দাবি করবার সাহস ছিল না কংগ্রেসের। যা ভিক্ষা করবার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন সকলে, তা দাসত্বেরই একটা সম্মানজনক নাম।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন বড় সংক্ষিপ্ত—১৯০২ থেকে ১৯১০। এর প্রথম দিকে তিনি যবনিকার আড়ালেই ছিলেন। তারপর যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন সোজাসুজি স্বরাজ দাবি করলেন। কোনও মধ্যপন্থা বা সন্ধি নয়—পূর্ণ স্বাধীনতা। তাঁর নতুন নীতি হল সেল্‌ফ্‌ হেল্‌প্‌। প্রথম উদ্দেশ্য দেশের সমস্ত শক্তি সংহত করা আর দ্বিতীয় কাজ অসহযোগ। বিদেশী জিনিস বর্জন করে স্বদেশী শিল্পকে গ্রহণ কর, ইংরেজের আদালত বয়কট করে সালিসী প্রথার প্রচলন কর, গভর্মেণ্টের কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে স্বদেশী স্কুল কলেজ খোল চারি ধারে, দেশের যুবকদের নিয়ে দেশরক্ষা-সমিতি গঠন কর—এই হল স্বাধীনতা-সংগ্রামের গোড়ার কথা। শ্রীঅরবিন্দের আশা ছিল যে তিনি এ কাজে কংগ্রেসের সহায়তা পাবেন এবং দেশের সমস্ত শক্তি কংগ্রেসের পতাকাতলে সংহত করে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। কংগ্রেস-রাজ্য হবে ইংরেজ রাজ্যের ভিতর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য।

শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক সাধনার সূত্রপাতের সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় লেলে মহারাজের নাম জড়িয়ে আছে। বরোদায় তিনি এঁর সংস্পর্শে আসেন। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে ভারত আধ্যাত্মিক দেশ, তার ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতি আদিকাল থেকে সারা জগতে আলোক বিকীর্ণ করে আসছে। এ কথাও বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের ভিত্তিতে ধর্ম হলে তার গোড়া শক্ত হবে, সেই বিপ্লবই স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে। এই সংস্কৃতির বিপ্লব শুরু করেন রাজা রামমোহন রায়, দেশাত্মবোধ মিলিয়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। শ্রীঅরবিন্দ দেশকে বোঝালেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না হলে আত্মার বিকাশ হবে না ভারতের। নিজে যোগসাধনা শুরু

করলেন। তাঁর সারা জীবনই তো যোগ! প্রথম জীবনে তিনি জ্ঞান যোগী, তারপর কর্ম যোগী, আর উত্তর কালে পূর্ণ যোগী।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হল। তার দু বছর আগে শ্রীঅরবিন্দ তেরো বছর চাকরির পর বরোদা ত্যাগ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে কলকাতায় যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, বাঙলার নেতারা তাঁকে সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে এখানেও তিনি কাজ ছাড়লেন।

এর পরের যুগ তাঁর অগ্নিযুগ। বন্দে মাতরম্‌ নামে এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। লোকমান্য তিলকের সহযোগিতায় তাঁর এই ক্ষুদ্র দলটির নাম হল চরমপন্থী দল। ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীনতা না আসুক, স্বাধীনতার বীজ সংক্রামিত হল দেশের জনগণের মনে। দাসত্ব ছাড়াও যে কোন মহৎ জীবন হতে পারে, তার সঙ্কেতে দেশ উদ্‌বুদ্ধ হল।

ব্রিটিশ শাসক সেদিন এই নির্ভীক নেতাকে আটকাবার প্রয়োজন বোধ করলেন, কিন্তু পারলেন না। বন্দে মাতরমে একটি রচনার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাঁর সাজা হল না। সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে বিপিন পাল কারাবরণ করলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দী হলেন আলিপুর বোমার মামলায়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের তিরিশে এপ্রিল মজঃফরপুরের জজকে হত্যা করতে গিয়ে কিশোর প্রফুল্ল চাকীকে আত্মহত্যা করতে হল, আর একটি কিশোর ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুললেন। তারই জের টেনে বারীন ঘোষ তাঁর দলবল সুদ্ধ ধরা পড়লেন মানিকতলার বাগানবাড়িতে। পুলিসের প্রলোভনে নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হবে জেনে জেলের মধ্যেই সত্যেন বসু ও কানাই দত্ত তাকে হত্যা করেন কুকুরের মতো। বিচারে এ দুজনের ফাঁসি হল, আর সকলের হল দ্বীপান্তর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন নবীন ব্যারিস্টার। আদালতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় বুকের রক্ত ঢেলে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি উদ্ধার করে আনলেন।

শ্রীঅরবিন্দ পুরো একটি বছর জেলে ছিলেন। কী অপূর্ব এই ভারতের কারাগার! কংসের কারাগারে হয়েছিল বাসুদেবের জন্ম। আর ইংরেজের কারাগারে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন বাসুদেবের বিশ্বরূপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভয় পেয়েছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন সেই আনন্দময়ের শ্যাম রূপ।

আমার মনে পড়ল, আমাদের লাইব্রেরিয়ান বুড়ো মুকুন্দবাবুর কথা। তিনি একদিন বলেছিলেন যে জেল থেকে বেরিয়েই শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন নাকি আমাদের উত্তরপাড়ায় বক্তৃতা দিতে। সেই প্রথম তিনি তাঁর জীবনের মর্মকথা, তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা বললেন। বললেন যে, ভারতের জাগরণ হয়েছে বিশ্বাত্মার প্রেরণায়। কাজেই আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন নিছক দেশ-হিতৈষণার আন্দোলন নয়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে ধর্মের পুনঃস্থাপনা।

কিছু দিন তিনি ইংরেজী কর্মযোগিন আর বাংলা ধর্ম এই দুটি সাপ্তাহিক পত্রের মারফতে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে রাজনীতিকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করলেন। এক সময় তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন মেনেছিলেন, কিন্তু পরে এ কথা উপলব্ধি করলেন যে পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় করা জাতীয় ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ভারত স্বাধীন হবে, কিন্তু সেদিনের দেরি আছে। তাঁর নেতৃত্বের প্রযোজন আছে বলে তিনি মানলেন, কিন্তু সে নেতৃত্ব রাজনীতিব ক্ষেত্রে নয়, দেশের অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষে তার প্রয়োজন। ভারত সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র, আধ্যাত্মিক চেতনায় সারা দুনিয়ার তীর্থক্ষেত্র। ভারতের শক্তি তার সম্পদে নয়, তার হাইড্রোজেন বোমার আস্ফালনে নয়—ভারতের শক্তি তার বিরাট সভ্যতায়, তার ঐতিহ্যে, তার হাজার হাজার বছরের আধ্যাত্মিক বিকাশে।

শ্রীঅরবিন্দ নতুন পথের সন্ধানে এলেন পণ্ডিচেরীতে। এ পথের সন্ধান পেলে মানুষকে আর ওঠানামার বন্ধুর পথে চলতে হবে না। তার মধ্যে এমন এক চৈতন্য আসবে, যাতে তার কাজ হবে অভ্রান্ত, জীবন হবে সুখ ও আনন্দে উজ্জ্বল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাতীয় কংগ্রেস তাঁকে সভাপতি

হবার জন্যে আমন্ত্রণ করেন, তখন শ্রীঅরবিন্দ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হল। ১৯২২এ গয়া কংগ্রেসে রাজনীতির মোড় ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে দেশবন্ধু যখন শ্রীঅরবিন্দের সাহায্য চাইলেন স্বরাজ্যদল গঠনে, শ্রীঅরবিন্দ একই উত্তর দিয়েছিলেন দেশবন্ধুকে।

উপলব্ধি হল যোগে চরম লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের যোগে ব্যক্তিগত উপলব্ধি হল তাঁর কাজের আরম্ভ, আর তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রকাশ। এই জন্যে প্রথমে তিনি অতিমানস শক্তির নাগাল পেতে চাইলেন, সেখানে ওঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে শক্তিকে নামিয়ে আনা। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করলেন যে সেই শক্তির স্পর্শ পেয়ে আমাদের চেতনা আলোকময় হবে, রূপান্তর হবে মন প্রাণ ও দেহের। সেই অতিমানসের শক্তি বস্তুজগতের ওপর তার প্রভাব ফেলে যুগান্তর আনবে ধীরে ধীরে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই বস্তুজগতের রূপান্তর এক দিনে হবে না। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

বুদ্ধ জীবনকে দেখতেন ভিন্ন চোখে, তাঁর লক্ষ্যও ছিল স্বতন্ত্র। তিনি নিষ্কৃতি চাইলেন ইন্দ্রিয় জগৎ থেকে। সে যুগের পরিবেশে হয়তো নির্বাণই ছিল সব চেয়ে বড় চাওয়া। শ্রীঅরবিন্দ জীবলীলার প্রকাশচক্র থেকে অব্যাহতি চান নি, চেয়েছেন জীবনের পূর্ণ রূপান্তর। অধ্যাত্মের আলোয় বস্তুর রূপান্তর হবে। আমাদের দেহ আত্মোপলব্ধির অন্তরায় না হয়ে উপলব্ধির সহায় হবে।

নিচের ভদ্রলোকদের একজন পরম উৎসাহে সঙ্গীকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে শ্রীমা এই আশ্রমের প্রাণ। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে মা ও পল রিশার সাহেব জাপানে ছিলেন। বালিকা বয়স থেকেই মা ছিলেন সাধিকা। শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনে এঁরা পণ্ডিচেরীতে তাঁকে দেখতে আসেন। শ্রীঅরবিন্দের যোগী মূর্তিতে মা দেখলেন তাঁর ধ্যানের দেবতাকে। এঁরা ফরাসী, যুদ্ধের কাজে তাঁদের দেশে ফিরতে হল। যুদ্ধ শেষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আবার তাঁরা পণ্ডিচেরী ফিরলেন।

দু এক বছর এখানে থেকে রিশার সাহেব দেশে ফিরলেন, কিন্তু মা আশ্রমেই রয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক নিতান্তই বস্তুবাদী। শ্রীঅরবিন্দের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কী একটা প্রশ্ন করলেন।

আমার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাতের কথা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাঙা শরীর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরীতে আসেন শ্রীঅরবিন্দ-সাক্ষাতে। তাঁর সেদিনের কথা আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে—

মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম—আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এ অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাত প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায় —আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

২২

ঘুম যখন ভাঙল, রাতের অন্ধকার তখনও বেশি স্বচ্ছ হয় নি। নিচের ভদ্রলোকদের গলার আওয়াজ পেলুম। কর্কশকণ্ঠ ভদ্রলোক বললেন ঃ জয় রামজীকি!

তাঁর সঙ্গী তেমনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন ঃ জয় রামজীকি!

নিচে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম যে তাঁরা দুজনেই তরুণ এবং আলস্য ত্যাগ করে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করছেন। গাড়ির ভিতরটা বিজলীর আলোয় এমন উজ্জ্বল যে সময় আন্দাজ করার উপায় নেই। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে চারটে, তাঞ্জোরে পৌঁছতে আর বোধহয় বেশি দেরি নেই।

প্রথম ভদ্রলোক "কেয়া বাতাউ" বলে গল্প শুরু করলেন। কাল রাতে রুটির অভাবে ভাত খেতে হয়েছিল, আর সারারাত তাঁকে ঘর আর বাথরুম করতে হয়েছে। ভাতে এত জলও আছে!

তাঁর সঙ্গী সহানুভূতির সুরে বললেন, কী করা যাবে! ঘর ছাড়লেই নানান কষ্ট। আরও কত কী কপালে আছে কে জানে!

প্রথম ভদ্রলোক নিজের পেটের ভাবনাতেই অস্থির। বললেন, ত্রিচিতে পৌঁছেই একটা ধর্মশালা খুঁজে বার করতে হবে। আর প্রথমেই অড়হর ডাল সহযোগে খান কয়েক আটার রুটি।

সঙ্গী বললেন ঃ মন্দির দর্শনের আগেই ?

প্রথম ব্যক্তি বললেন ঃ রাখো তোমার মন্দির, পেট সাফ না হলে কার পূজো কে করে!

সঙ্গী তাঁর টাইম-টেবিল বার করলেন। এইবারে গলা শুনে বুঝতে পারলুম যে এই ভদ্রলোকই একটু কৌতূহলী এবং কিছু খোঁজখবর রাখেন ও রাখতে ভালবাসেন। বললেন ঃ শুনেছিলুম যে গাড়ি থেকেই বৃহদীশ্বরের মন্দির দেখা যায়।

প্রথম ভদ্রলোক একটা মুখভঙ্গি করে বললেনঃ প্যাঁচা তো নই যে এই অন্ধকারে মন্দির দেখতে পাব!

আমার কিন্তু লোভ হল। আমি লাফিয়ে নেমে এলুম। প্রথম ভদ্রলোক একবার আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ফেরালেন। তাঁর সঙ্গী একটুখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ জয় রামজীকি!

আমি দু হাত তুলে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালুম।

বাহিরের অন্ধকার তখনও ভোরের আলোর স্পর্শ পায় নি, আবছা দেখাচ্ছিল চাঁদের আলোয়। মনে হল যে আর একটু পরিষ্কার হলেই মন্দিরের গোপুর দেখতে পাব।

স্থির হয়ে বসেই বড় অদ্ভুত লাগল পাশের এই দুটি তরুণকে। যাঁর তীব্র কণ্ঠ, তাঁর দেহটি বড়ই ক্ষীণ। স্বাস্থ্যের এমন অভাব দেখে বিশ্বাস হয় না যে ভদ্রলোকের কণ্ঠে এত শক্তি। অপর ব্যক্তির ভারী চশমা জোড়া বলিষ্ঠ দেহের সঙ্গে ভাল মানিয়েছে। আমাকে বললেনঃ আপনি দেশ দেখতে বেরিয়েছেন বুঝি?

আমার হিন্দীর জ্ঞান সীমিত। তবু হিন্দীতেই জবাব দিলুমঃ জী।

ভদ্রলোক টাইম টেবিলের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেনঃ তিনটি ভাল জায়গা আমরা পেরিয়ে এলুম— চিদম্বরম মায়াভরম ও কুম্ভকোনাম।

তাঁর সঙ্গী তীব্র ভাবে জবাব দিলেনঃ পেরিয়ে আসব না তো কি পিছিয়ে থাকব?

চশমাওয়ালা ভদ্রলোক বললেনঃ দেখবার জিনিস দেখতেই যদি না পেলুম তো দেখতে বেরনো কেন?

আমার দিকে ফিরে বললেনঃ এর ধারাই এমনি। পেট ভরে খেতে পেলেই এর ক্ষিধে মেটে। এর আর অন্য কোন ক্ষিধে নেই। আপনিই বলুন, এমন লোকের সঙ্গে বেড়ানো কি বিড়ম্বনা নয়?

অপর পক্ষের ভর্ৎসনা শোনা গেলঃ ফিরে যেতে তো আমি বারণ করি নি!

এই দেখুন, এই যদি ওর মনের কথা হয় তো আপনিই বুঝুন আমার সঙ্গী ভাগ্য!

আমি হিন্দীতে এর উত্তর দিতে পারলুম না, ইংরেজীতে বললুম: আপনার বুঝি খুব দেশ দেখাব শখ?

ভদ্রলোক ইংবেজীতে জবাব দিলেন: তা না হলে এত কষ্ট করে এত দূরের পথে বেরিয়েছি!

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: আপনি হিন্দী বোঝেন না?

বললুম: বুঝি, কিন্তু হিন্দীতে কথা কইতে পারি নে।

ভদ্রলোক বললেন: আমরা যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি জানিয়ে চেঁচামেচি করতুম, তখন জানতুন না যে ভারতের সর্বত্র হিন্দী চলে না। আপনি বোধ হয় বাঙলা দেশেব লোক. আপনি বলছেন—হিন্দী জানি নে। এ দেশে ভাঙা হিন্দী দু চাব জনে বোঝে। তারপবে দেখছি, হিন্দীর বিরুদ্ধে বেশ একটু গণ-আন্দোলন আছে। এক একটা স্টেশনে দেখলুম, হিন্দীতে স্টেশনেব নাম আলকাতবা দিযে মুছে দিয়েছে। শুনলুম যে, সবকারের সিদ্ধান্তেব বিরুদ্ধে জনমত গঠনেব জন্যেই তারা এমন করছে।

বললুম: কিন্তু সাধাবণ ভাষা তো আমাদের একটা চাই। কত অসুবিধে আমাদের বলুন তো? শিক্ষিত সমাজে ইংরেজীতে কাজ চলতে পারে, কিন্তু দেশে এত ভাষা থাকতে ইংবেজী ভাষাকে এখনও আঁকড়ে থাকব কেন! আর ইংবেজীকে তাড়াতে হলে হিন্দীর প্রসাব যে নিতান্ত দরকার।

ভদ্রলোক খুশী হলেন, বললেন: আমার আরও একটি নতুন জ্ঞান হল। আমি ভাবতুম যে যারা হিন্দী জানে না তারা বোধ হয় হিন্দী ভাষাকে ঘৃণা করে। এখন দেখছি তা নয়, আপনারা আমাদেব চেয়ে অনেক উদাব।

ভদ্রলোক টাইম-টেবলের দিকে আবাব একবার চেয়ে বললেন: আমার ইচ্ছে হচ্ছে, যে সব জায়গা দেখতে পেলুম না, তাদের সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা করি।

দক্ষিণদেশী এক ভদ্রলোক কোনও এক স্টেশনে গাড়িতে উঠেছিলেন এবং ব্যগ্র ভাবে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। বললেনঃ আপনারা আমাদের দেশ দেখতে এসেছেন, সত্যিই আপনাদের কত আগ্রহ! আমি বেশী জানি নে, কিন্তু যতটুকু জানি তা আপনাদের বলতে পেলে আনন্দ পাব।

পরিচয় হল সবারই। চশমার মালিক দীক্ষিত, আকোলার এক কলেজে এখনও ছাত্র। তাঁর সহপাঠী জোগলেকার সেই কর্কশকণ্ঠ ভদ্রলোক। যিনি আমাদের গল্প বলবেন তাঁর নাম সুব্রহ্মণ্য। বাড়ি চিদম্বরমে, ওকালতির চেয়ে রাজনীতিতে বেশি আনন্দ পান। তাঁর বিশ্বাস যে অভাব যত বাড়ছে, আমাদের মনোভাব তত বামপন্থী হচ্ছে।

জোগলেকার যত বিরক্ত হলেন, তার চেয়ে বেশি খুশী হলেন দীক্ষিত। আমার দিকে ফিরে বললেনঃ আমাদের কী ভাগ্য বলুন, তাই এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল!

সুব্রহ্মণ্য বললেনঃ আপনাদের বহু অসুবিধেয় পড়তে হয় দেখছি। আমরা একই দেশের লোক, অথচ একটা সাধারণ ভাষার অভাবের জন্যে কত জানার জিনিস আপনাদের জানা হয় না, কত বোঝার জিনিস আপনাদের কাছে রহস্য থেকে যায়। অনেকে হয়তো অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের পর একটা ক্লান্তিকর ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যান।

জানা গেল যে আমি ছাড়া আর সবাই ত্রিচি যাচ্ছেন। গাড়ি একটু লেট যাচ্ছে বলে তাঞ্জোর পৌঁছতে আরও কিছুক্ষণ দেরি আছে। দীক্ষিত বললেনঃ শুনেছি যে চিদম্বরমের মন্দির-প্রাঙ্গণে শিব ও বিষ্ণুর মূর্তি একত্রে।

সুব্রহ্মণ্য হেসে বললেনঃ আপনাদের কাছে এইটে আশ্চর্য লাগবে বইকি! দক্ষিণ-ভারতে শিব ও বিষ্ণু একত্র বাস করেন না। আমাদের হিন্দুধর্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—জন্ম জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আমরা ব্রহ্মার উপাসনা করি না। পিতামহ এমন অকৃপণ হাতে ভারতে জনসংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছেন যে কেউ জীবনকে আর কেউ মৃত্যুকে মানি—জীবনকে

সুখের করবার জন্যে, আর মৃত্যুকে এড়াবার জন্যে। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যে বৈরিতা, স্থিতির সঙ্গে প্রলয়ের, সে বৈরিতা উপাসনাতেও চলে আসছে। যেখানে শিব সেখানে বিষ্ণু নেই, অথচ একই শহরে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির আছে। যেখানে শৈবরা আগে মন্দির স্থাপন করেছে, সেখানে বৈষ্ণবরা তার পরে তার চেয়েও সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছে বিষ্ণুর জন্যে। আর যেখানে বিষ্ণুর মন্দির স্থাপিত হয়েছে আগে, সেখানে শিবের মন্দির তার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে আকাশে। শিব ও বিষ্ণুর এই যে রেষারেষি, চিদম্বরমে এই সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পায় নি। খানিক-ক্ষণের জন্যে তাঁদের বৈরিতা ভুলে হর-পার্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ একই মন্দির-প্রাঙ্গণে ভক্তদের পূজো গ্রহণ করছেন। একদিকে নটরাজ-শিবের মন্দির, অন্যদিকে গোবিন্দরাজ বিষ্ণুর মন্দির।

চিদম্বরমে মহাদেবের আকাশ মূর্তি, অর্থাৎ এখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার। একটি রত্নহার দিয়ে এই নিরাকার লিঙ্গের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। তার সামনে একটি পর্দা ঝোলানো থাকে, প্রয়োজন মতো সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়।

দুটি নদীর মাঝখানে বত্রিশ একর জমির উপরে অবস্থিত এই নটরাজ মন্দির। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনখানে পাথর দেখা যায় না, অথচ এই মন্দিরটি আগাগোড়া গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি। ভিতরের প্রাকারে চারটি গোপুর, তার দুটির গায়ে নাট্যশাস্ত্রের একশো আট ভঙ্গি খোদাই করা আছে। প্রাঙ্গণে আছে কারুকার্যমণ্ডিত পাঁচটি সভা—রাজসভা ও দেবসভা, চিৎ সভা কনক সভা ও নৃত্যসভা। এক হাজার স্তম্ভের বিরাট রাজসভাটি লম্বা ও চওড়ায় প্রায় সাড়ে তিনশো ও দুশো ফুট। পাণ্ড্য ও চোল রাজারা বিজয়ের উৎসব করতেন এইখানে। চিৎ সভায় শিবের আকাশ লিঙ্গ আর কনক সভায় নটরাজের মূর্তি। নৃত্য সভাটি একটি রথের আকারে নির্মিত, চাকাওয়ালা এই রথটি যেন কয়েকটি ঘোড়ায় টানছে। মোটের উপরে এই মন্দিরের সর্বত্র—মণ্ডপে স্তম্ভে গোপুরমে একটা নৃত্যের আবহাওয়া লীলায়িত হয়ে উঠেছে। পল্লব চোল পাণ্ড্য ও নায়ক রাজারা ধীরে ধীরে এই মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু

গোবিন্দরাজ বিষ্ণুর মন্দিরটি বিজয়নগর রাজাদের সময় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

মায়াভরমের বর্তমান নাম ময়ুরম, কিন্তু শহরের বিশেষত্ব কিছুই নেই। তীর্থস্থান হিসেবে কিছু খ্যাতি আছে। কাবেরী নদীর তীরে শহর, কার্তিক মাসে তুলা কাবেরীর মেলা একটি বিশেষ আকর্ষণ। লোকের বিশ্বাস যে তুলা রাশিতে রবির অবস্থানের সময় গঙ্গা মিলিত হন কাবেরীতে।

এখানে শিব মায়ানাথ, আর বিষ্ণু পরিমল রঙ্গনায়ক। মাইল তিনেক ব্যবধানে দুই মন্দির। মাঘ মাসে বিষ্ণু যখন কাবেরীতে স্নান করেন, তখন এক মাসব্যাপী তার উৎসব হয়।

তারপর কুম্ভকোনামের কথা।—কুম্ভকোনাম বড় প্রাচীন শহর, পুরাণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রলয়ের সময় যে কুম্ভে অমৃত রাখা হয়েছিল, তারই একটা কানা পড়েছিল মহামোক্ষম সরোবরে। বারো বছর পরে পরে তাই এখানে পূর্ণকুম্ভের উৎসব হয়। ছোট বড় আঠারোটি মন্দির তখন যাত্রী সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে।

কাবেরী নদীর তীরে এই কুম্ভকোনাম শহরে বছরে সাত-আটটি মেলা বসে। উৎসবও অনেকগুলি।

এখানে চক্রপাণি বিষ্ণুমূর্তির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। চক্রপাণি এখানে অষ্টভুজ ও ত্রিনেত্র—শিব ও বিষ্ণুর মিলিত মূর্তি।

কুম্ভকোনামকে অনেকে কেম্ব্রিজ অফ ইণ্ডিয়া বলেন। এক কালে হয়তো এই শহরে বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ ছিল, আজ শঙ্করাচার্যের কামকোটি পীঠ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নেই। মন্দির ছাড়া কুম্ভ-কোনামের গর্বের বস্তু যদি কিছু থাকে তো সে পেতল-কাঁসার বাসন—সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে এ শিল্পের তুলনা নেই। আর পান। দক্ষিণ ভারতের পান বিলাসীরা কুম্ভকোনামের পান বলতে অজ্ঞান।

দক্ষিণ-ভারতের সব চেয়ে প্রাচীন রাজ্য চোল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল উরেয়ুরে। কিন্তু সেখান থেকে কখনও কুম্ভকোনামে আসত কখনও বা

তাঞ্জোরে উঠে যেত। কাবেরী নদীর তীরে উরেয়ুর শহরের কোন ঐশ্বর্য আর নেই। তবে তারই কিছু পশ্চিমে গড়ে উঠেছে আজকের ত্রিচিনপল্লী শহর।

পল্লবদের পতনের পরে এই চোলরাই আবার দক্ষিণের সব চেয়ে বড় শক্তি হয়ে ওঠে। এই বংশের মহারাজাধিরাজ রাজরাজ চোল ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করবার পরে উত্তরে কলিঙ্গ ও দক্ষিণে সিংহল দেশ পর্যন্ত জয় করেন। তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, তাঁর রাজত্বকাল ১০১৮ থেকে ১০৪২। তিনি চালুক্যদের পরাজিত করেন ও বাঙলা পর্যন্ত তাঁর বিজয়বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তাঁর যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্র পেরিয়ে সুমাত্রা দ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপেব কতকাংশ অধিকার কবে। এব পরে প্রায় এক শো বছর পর্যন্ত চোলরাই দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দোরসমুদ্রের হয়শালবংশ বেশ প্রতিপত্তি বিস্তার করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চোলের জমিদাররাও স্বাধীনতা অবলম্বন করলে চোলবংশ একেবারেই নিস্তেজ হয়ে গেল। তখন পাণ্ড্যরা দখল করে কাবেরী নদীর দক্ষিণের সমস্ত দেশ আর উত্তরে পেন্নার নদী পর্যন্ত সমস্ত উপকূল প্রদেশ। বাকিটা যায় হয়শাল রাজ্যে।

দক্ষিণ ভারত পরাধীন হয়েছিল ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর তার তৃতীয় অভিযানে বেরিয়ে সমস্ত দক্ষিণকে নিজের পদানত করেছিল ঝড়ের মতন। দিল্লী থেকে বেরিয়ে দেবগিরি দ্বারাবতীপুর হয়ে এসেছিল তাঞ্জোবে। তারপর মাদুরা ছুঁয়ে গিয়েছিল সেতুবন্ধ রামেশ্বর। দোরসমুদ্রের বীর বল্লাল পরাজিত হলেন, মাদুরার পাণ্ড্যরাজ হলেন পদানত। সে এক অদ্ভুত বিজয়াভিযান! ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুর যখন দিল্লীতে ফিরল, তখন সমস্ত দক্ষিণ ভারত মুসলমানের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ ভারত আবার স্বাধীন হল ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুদয়ে। এই রাজ্যের উৎপত্তি এক রহস্যে ঘেরা। শোনা যায় যে

হরিহর বুক্ক প্রভৃতি পাঁচ ভাই মিলিত ভাবে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বুক্ক মারা যান ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণের সমস্ত ভূভাগই বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকাশ্যে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় হরিহর। রাজা কৃষ্ণ রায় শুধু বিজয়-নগরের নয়, সমস্ত দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে সম্মান দাবি করতে পারেন। এঁর পরেই এই বংশের দুর্বলতা দেখা দেয় এবং ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সদাশিব রায়ের সময় বিজয়নগব ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতিবেশী মুসলমান রাজাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল না, কিন্তু বিজয়নগর ধ্বংস করবার জন্যে এই সময় বিজাপুব আহমদনগর গোলকুণ্ডা ও বিদরের সুলতানরা নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে প্রথমবাব সম্মিলিত হয়েছিলেন।

ঔবঙ্গজেবেব সময় দাক্ষিণাত্যে আবার মুঘল আধিপত্য বিস্তাব হয়, আব তাঁরই রাজত্বকালে ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী দক্ষিণ ভারতের বেলারি ভেলোব ও জিঞ্জি দুর্গ অধিকার কবেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর জীবনেব শেষ ষোল বছর দাক্ষিণাত্যেই বাস করেন—১৬৮১ থেকে ১৬৯৭ পর্যন্ত। এই সময় তাঞ্জোর ও ত্রিচি পর্যন্ত মুঘল-অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের সেই চরম বিস্তার। একদিন যা ছিল আকবরের স্বপ্ন, ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তা সত্যে পরিণত হয়েছিল।

শিবাজীর পৌত্র সাহুর সময় আবার মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান হয়। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট সন্ধি করে তাঞ্জোর ত্রিচিনপল্লী মহিস্থর ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের দু রকম কর আদায় করবার অধিকাব স্বীকার করেন।

আমার দিকে চেয়ে সুব্রহ্মণ্য বললেনঃ আপনি তো তাঞ্জোরে নামছেন, সেখানকার বড় দুর্গে মারাঠাদের অতীত কীর্তির নানা নিদর্শন দেখতে পাবেন। পরিখার উপর দিয়ে দুর্গের ভিতরে পৌঁছে যে প্রাসাদটি দেখা যায়, বাজা বিজয়রাঘব এর নির্মাতা বলে প্রবাদ। প্রাসাদের দু ধারে দুটি উঁচু মিনার। লোকে বলে, একটির উপরে উঠে রাজা প্রত্যহ শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথস্বামীকে প্রণাম করতেন, আর দ্বিতীয়টির উপর থেকে

প্রয়োজনমত শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। এক স্থানে সভামণ্ডপ, এখানে রাজার দরবার বসত। সেইখানেই কালো স্ফটিকের বেদীর উপর শিবাজীর শুভ্র মর্মর মূর্তি। মুঘলদের বিরুদ্ধে শিবাজী যে কামান ব্যবহার করতেন, তার একটি নিদর্শন আছে খানিকটা দূরে। বাইশ ফুট লম্বা এই কামানটি আজও এতটুকু ম্লান হয় নি। এখানে আরও একটি দরবার-ঘর আছে, সেটি তাঞ্জোরের শেষ রাজা শিবাজীর দরবার। তার দেওয়ালে সুন্দর করে সাজানো তাঁর পূর্বপুরুষদের চিত্রাবলী। এই দরবারে এখন একটি পাথরের সিংহাসন আছে। পুরনো লোকে বলে যে, সেখানে যে সোনার সিংহাসন ছিল, সেটি আজ নাকি সাগরপারে।

এই রাজারা যে শুধু লড়াই করতেন না, শান্তির দিনে অবসর যাপনের জন্যে বিদ্যাচর্চা করতেন ও জ্ঞানার্জনে সবাইকে উৎসাহ দিতেন, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেখানকার সরস্বতী মহল। এটি একটি বিরাট গ্রন্থাগার। নানা ভাষায় লেখা ত্রিশ হাজার গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে সংস্কৃত ও তামিল প্রভৃতি ভাষায় লেখা পুঁথির সংখ্যা আঠারো হাজার। তালপাতার পুঁথিই হবে আট হাজার। আজ এগুলির রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে, কালো দাগও পড়েছে কোথাও কোথাও। নায়ক ও মারাঠা রাজারা প্রায় তিনশো বছর ধরে এই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

কিন্তু তাঞ্জোরের এই সব নয়। তার প্রাচীন সভ্যতার অনেকখানি বাঁধা আছে তার মন্দিরে। শুধু ধর্মচচায় নয়, শিল্পের নিখুঁত নিদর্শনে। এখানকার বৃহদীশ্বরের মন্দির দুশো ষোল ফুট উঁচু। দশম শতাব্দীর শেষে রাজরাজ চোল এই মন্দির নির্মাণ করেন। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের গোপুর নির্মাণের যে রীতি এক সময় প্রবর্তিত ছিল, এখানেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মন্দিরের চেয়ে গোপুব এখানে বড় নয়, মন্দিরই বড়। শিবগঙ্গা দুর্গের ভিতর এই মন্দির। শিবের লিঙ্গমূর্তি তেরো ফুট উঁচু আর তাঁর নন্দী উচ্চতায় বারো ফুট আর লম্বায় ষোল ফুট। এই মন্দিরের চূড়ায় যে অখণ্ড গোল পাথরটি বসানো আছে, তার ওজন দু শো মণ। কী করে এই ভারি পাথর অত উঁচুতে উঠল, স্তম্ভিত হয়ে তাই অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। এক মাইল লম্বা একটা ঢালু পথ তৈরি

করে গড়িয়ে গড়িয়ে এই পাথর ওপরে তোলা হয়েছিল বলে লোকের বিশ্বাস। বৃহদীশ্বরের সব কিছুই এমনি বৃহৎ!

বৃহদীশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণেই সুব্রহ্মণ্যের মন্দির। ভাল করে দেখতে হয় এর শিল্পসৃষ্টি, তাতে প্রাণ আছে বলে মনে হয়।

তিরুবায়ারের শিবমন্দিরের খ্যাতি অন্য রকম। কাবেরী নদীর উত্তর তীরে মাইল ছয়েক দূরে এই শহর। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা কাশীবাসের মতো তিরুবায়ারে বাস করে।

কবি ত্যাগরাজের নাম শুনেছেন তো?—বলে সুব্রহ্মণ্য আমাদের দিকে তাকালেন। আমাদের নীরব থাকতে দেখে বললেন: গত শতাব্দীতে তিনি কয়েক হাজার গান লিখেছেন। সেই গানই কর্ণাটিক মিউজিকের প্রাণ। তিরুবায়ারে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে অগণিত সঙ্গীতজ্ঞ প্রতি বছর মিলিত হন তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে। তিরুবায়ারকে তিরুবাদীও বলে। তীর্থস্থান বলেও এর খ্যাতি আছে।

সুব্রহ্মণ্য আমাদের আরও একটি নতুন জায়গার নাম শোনালেন। গঙ্গাইকোণ্ডা চোলপুরম। রাজরাজ চোলের পুত্র রাজেন্দ্র চোল উত্তরের গঙ্গা নদী পর্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার করে গঙ্গাইকোণ্ডা চোল উপাধি নিয়েছিলেন। আর তাঞ্জোর থেকে আটত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে গঙ্গাই-কোণ্ডা চোলপুরমে স্থাপন করেছিলেন নিজের রাজধানী। সেখানে তিনি নির্মাণ করেছিলেন একটি অপরূপ সুন্দর শিবের মন্দির। সে মন্দির বৃহদীশ্বরের মন্দিরের চেয়ে অনেক সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত। চণ্ডীর স্তব তাণ্ডবমূর্তি জ্ঞানসরস্বতী প্রভৃতি মূর্তি দেখবার জন্যে আজও এই পরিত্যক্ত স্থানে বহু যাত্রী যাতায়াত করে।

আমি ও দীক্ষিত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এই গল্প শুনছিলুম। জোগলেকার উশখুশ করছিলেন সারা ক্ষণ। চিদম্বরমের আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে সুব্রহ্মণ্য কিছুই বলেন নি। শুধু জেনেছিলুম যে তিনি তামিল সাহিত্য পড়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার কৌতূহলের শেষ নেই। জানি নে বললেই যদি জানতে পারা যায়, তার জন্যে নিজের অজ্ঞানতা স্বীকার করতে লজ্জা পাই নে এতটুকু। বললুম: তামিল

সাহিত্যে আমার দুটি নামের সঙ্গে পরিচয় আছে। প্রথম হল, কবি কাম্বার, তাঁর রামায়ণের অনুবাদ নাকি কবি বাল্মীকিকেও ছাড়িয়ে গেছে— যেমন ইংরেজেরা দাবি করে যে ফিট্‌জেরাল্ডের রুবাইয়াৎ আসল ওমর খৈয়ামের চেয়েও সুন্দর। আর দ্বিতীয় নাম জানি ভারতীর। শ্রীঅরবিন্দের জীবনচরিতে পড়েছি যে শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন দেশপ্রেমিক কবি ভারতী কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে স্বেচ্ছানির্বাসনে পণ্ডিচেরীতে ছিলেন। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক কাজ করার প্রস্তাবও নাকি করেছিলেন।

জোগলেকার এতক্ষণ কতকটা স্থির হয়েই ছিলেন। এবারে নতুন প্রসঙ্গের উত্থাপন হতেই বাথরুমে চলে গেলেন। দীক্ষিত কটাক্ষ করে বললেন: ইনি রানাডে-তিলক-লেলেমহারাজের বংশধর কিনা, তাই শ্রীঅরবিন্দের নাম বরদাস্ত করতে পারেন না। এক রকম জবরদস্তি করেই তাঁকে পণ্ডিচেরী নিয়ে গিয়েছিলুম।

সুব্রহ্মণ্যের কানে এ কথা গেল না। তিনি যেন ভারতীর কাব্যসমুদ্রে ডুবে গেছেন। দু চোখে খুশির দ্যুতি যেন ঠিকরে পড়ছে। বললেন: আপনি জানেন ভারতীর নাম?

বললুম: ভারতীর একটি কবিতার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম— পাঞ্চালী শপথম্। দুঃশাসনের রক্তে বেণীবন্ধনের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করে যে ভাবের আমদানি তিনি করেছেন, তার তুলনা দেখি না ভারতের কোন সাহিত্যে।

ভদ্রলোক আরও মুগ্ধ হলেন, বললেন: পড়েছেন পাঞ্চালী শপথম্?

মূল তামিল থেকে খানিকটা আবৃত্তি করে শোনালেন, তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বড় বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বললেন: আর তো সময় নেই, তাঞ্জোরের কাছাকাছি আমরা এসে গেছি।

বললুম: যতটুকু শোনা যায়, ততটুকুই লাভ।

কিন্তু সুব্রহ্মণ্য জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি তাঞ্জোরে কয়েকদিন থাকবেন, না আজই আসবেন ত্রিচিতে?

মনে হচ্ছে আজই পৌঁছব।

কোথায় উঠবেন সেখানে?

বোধ হয় রিটায়ারিং রুমে—অবশ্য যদি জায়গা পাওয়া যায়

তার পর?

বললুম: রাতের ট্রেনে রামেশ্বরে রওনা হয়ে যাব।

ভদ্রলোক বললেন: আমার যদি কাজ শেষ হয়ে যায় তো আমিও আজ রাতেই ফিরব। সন্ধ্যেবেলায় আপনি স্টেশনে থাকবেন কি?

বললুম: আমাদের গাড়ি রাত প্রায় দশটায়, সন্ধ্যেবেলায় স্টেশনেই থাকব আশা করি।

সুব্রহ্মণ্য বললেন: আমি সন্ধ্যেবেলাতেই স্টেশনে আসব। যদি দেখা হয়, কফি খেতে খেতে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে, কী বলেন?

বললুম: আপনার প্রস্তাবটি এমন ভাল যে সন্ধ্যেবেলায় আমাকে স্টেশনেই থাকতে হবে।

দীক্ষিত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন: আপনার সঙ্গে আমাদের বোধ হয় দেখা হবে না। আমরা দুপুরের গাড়িতে মাদুরা যাব। রাতে ট্রাভেল করবার মতো এনার্জি আর নেই। তাই আমরা স্থির করেছি যে মাদুরায় গিয়ে রাত কাটাব।

সুব্রহ্মণ্য বললেন: মাদুরায় এ সময় মশার বড় অত্যাচার শুনেছি। আমার এক বন্ধু এসেছিলেন দিন কতক আগে। তাঁর কাছে শুনলুম যে মনসুন নামবার পর থেকে বড় বড় মশা একেবারে ছেঁকে ধরছে।

জোগলেকার ইতিমধ্যে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছিলেন। মশার নামে যেন চমকে উঠলেন: বলেন কি!

তাঁর কণ্ঠস্বরে আমরাও চমকে উঠলুম।

ট্রেনের গতি তখন মন্থর হয়ে এসেছিল, বাইরের অন্ধকারও এসেছিল ফিকে হয়ে। আকাশের চাঁদ ও তারারা কখন খসে পড়েছিল তা টের পাই নি।

সুব্রহ্মণ্য ব্যস্ত হয়ে জানালা দিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করলেন। দীক্ষিত বললেন: বৃহদীশ্বরের মন্দির কি দেখতে পাওয়া যাবে?

পশ্চিমের জানালা দিয়ে আমরা বাহিরে তাকালুম। সুব্রহ্মণ্য বললেন: দেখুন তো, কিছু দেখতে পাচ্ছেন কিনা?

প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোয় মন্দিবের চূড়াটি যেন দেখতে পেলুম। এক রকমের অদ্ভুত আনন্দে মন আমার দুলে উঠল।

সুব্রহ্মণ্য বললেন: দুশো ষোল ফুট উঁচু বলেই বারো মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

জানালার ধার থেকে মুখ সরিয়ে দীক্ষিত একটি মূল্যবান প্রশ্ন করলেন সুব্রহ্মণ্যকে: দক্ষিণ ভারত নিয়ে লেখা কোন বই পাওয়া যায় কি? সাবা রাস্তা আমরা তাই জিজ্ঞেস করছি, হিগিনবথামের বুক-স্টলগুলোতে খানাতাল্লাশি করেও কিছু পাই নি। এগমোরে একজন রেল-কর্মচারী বললেন যে তাঁদের ছ আনার টাইম-টেবল ও গাইডে এ বিষযে সুন্দর একটি অধ্যায় আছে, কিন্তু আমবা তা পেলুম না। ভদ্রলোক নিজেও খুঁজে না পেযে বললেন যে আগে তা থাকত। আপনি এ বিষয়ে কোন সন্ধান দিতে পাবেন

সুব্রহ্মণ্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যে তিনি নিজেও কোন বই দেখেন নি। মাদ্রাজের মাউণ্ট রোডে আছে টুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস, তাঁরা হয়তো কোন খবর দিতে পারবেন।

দীক্ষিত বললেন: আমরা তাঁদের অফিসে হানা দিয়ে কিছু যে পাই নি তা নয়, তবে কাজের জিনিস বিশেষ কিছু নেই। গোটা দক্ষিণ ভারত দেখবার জিনিসে ভরা, সে সব তার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

সুব্রহ্মণ্য হেসে বললেন: আপনি ছাত্র মানুষ, লেখাপড়া করবার অবসর আপনার অখণ্ড। আজ যে অভাব অনুভব করছেন, তা পূরণ করবার মতো মেটিরিয়াল যোগাড় করে নিয়ে যান না।

আমার দিকে চেয়ে বললেন: আপনাব লেখার অভ্যেস নেই?

কোন উত্তর দেবাব আগেই গাড়ি এসে তাঞ্জোরের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিলুম।

২৩

মামার গাড়ির সামনে এসে দেখলুম যে গাড়ির দরজা বন্ধ এবং নিশ্চন্ত আরামে সবাই ঘুমোচ্ছেন। অন্ধকার আর নেই, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই আর দ্বিধা করলুম না, জানালার উপর আঘাত করলুম জোরে জোরে।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই জালের জানালা তুলে স্বাতি বলল ঃ ওমা, গোপালদা যে! তাঞ্জোরে বুঝি পৌঁছে গেছি!

মামীর গলাও শুনতে পেলুম, বললেন ঃ তাই নাকি!

কী বলছ?

বলে মামাও ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

স্বাতি দরজা খুলে দিয়েছিল। আমি ভিতরে গিয়ে বিছানাপত্র গুটিয়ে দিলুম। তারপরে নেমে পড়লুম প্ল্যাটফর্মে। মামা বললেন ঃ স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে কিনা দেখ তো!

একজন রেলের কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে রিটায়ারিং রুম আছে, কিন্তু খালি আছে কিনা তা উপরে গিয়ে জেনে আসতে হবে।

যে প্ল্যাটফর্মে আমরা নেমেছিলুম, রিটায়ারিং রুম সে প্ল্যাটফর্মে নয়। ওভারব্রিজের উপরে উঠতে হল। অন্য ধারে দোতলার উপরে রিটায়ারিং রুম। বেয়ারাকে জাগিয়ে জানলুম যে একখানা ঘর খালি আছে। বললুম ঃ ওটা আমাদের চাই, মালপত্র নিয়ে আমরা আসছি।

মামা খুশী হলেন এই সংবাদ পেয়ে, বললেন ঃ যাক, একটা ব্যবস্থা করেছ দেখছি।

জিনিসপত্র নিয়ে আমরা উপরে চলে এলুম।

এক সারিতে অনেকগুলি ঘর, সামনে বারান্দা। সেই বারান্দা থেকে শহরের একটা অংশ দেখতে পাওয়া যায়। দোকানপাট সব বন্ধ, রাস্তার

বাতি এখনও জ্বলছে। কিন্তু যানবাহনও চলছে। মামাকে আমি বললুম ঃ আপনারা তৈরি হয়ে নিন, নিচে থেকে আমি আসছি।

মামা বললেন ঃ নিচে আবার কেন ?

বললুম ঃ আমি ওয়েটিং রুমেই মুখ হাত ধুয়ে নেব, তাতে তাড়াতাড়ি হবে।

কিন্তু বাধা দিয়ে মামা বললেন ঃ এখান থেকে ত্রিচি কত দূর ?

আন্দাজে বললুম ঃ মাইল ত্রিশেক, ট্রেনে ঘণ্টা খানেক সময় লাগে শুনেছি।

সকালেই কোন ট্রেন পাওয়া যাবে কি ?

আশ্চর্য হয়ে মামী বললেন ঃ তুমি বুঝি ঐ ভদ্রলোকের পরামর্শ মতো কাজ করতে চাও ?

পরামর্শটাতো মন্দ নয়, একটা দিন এগিয়ে যাব।

আমি বললুম ঃ খবর নিয়ে আসব।

খবর আমাদের নেওয়াই আছে। নটার পরে একখানা ট্রেন আছে, তাঞ্জোর দেখবার জন্যে ঘণ্টা তিনেকই যথেষ্ট।

আমি কিছু বললুম না। কিন্তু মামী বললেন ঃ তোমাদের সব জায়গাতেই তাড়া।

গামছা কাপড় নিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। মামা বললেন ঃ আর শোন। চায়ের জন্যে বেশি হাঙ্গামা কোরো না। শিবের পূজো না করে তো তোমার মামী কিছু খাবেন না, আমাদের জন্যে শুধু চা পাঠিয়ো। সবকিছু দেখে শুনে স্টেশনে ফিরে এসে আমরা ব্রেকফাস্ট করব।

সেই ব্যবস্থাই হল। আকাশে রোদ উঠবার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। নিচে নেমে দেখলুম যে যানবাহনের ছড়াছড়ি। ঝট্‌কাই বেশি। ছোট ছোট গরুর গাড়ির মতো দেখতে, পা মুড়ে ভিতরে বসতে হয়, কিন্তু সামনে ঘেরা। পরে গরুর গাড়িও দেখেছিলুম, গরুতে টানা একই রকমের গাড়ি। চিন্তিত ভাবে মামা বললেন ঃ ট্যাক্সি নেই ?

চারি দিকে চেয়ে ট্যাক্সি দেখতে পেলুম না, দেখলুম যে এক সারি

সাইকেল রিক্সাও আছে। রিক্সাওয়ালারা আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল। তাদের কাছেই জানলুম যে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, কিন্তু এখন নেই। ট্যাক্সির চেয়ে তাড়াতাড়ি তারা শহর দেখাতে পারে। দূর তো বেশি নয়, সব-কিছুই কাছাকাছি।

অগত্যা আমরা রিক্সাতেই উঠে বসলুম। স্বাতিকে নিয়ে মামী উঠলেন একটাতে, আর আমি মামার সঙ্গে উঠলুম।

রিক্সাওয়ালারা ঠিকই বলেছিল, বৃহদীশ্বরের মন্দিরটি বেশ কাছে। স্টেশনের সামনেই তিনটি রাস্তা বেরিয়েছে। একেবারে বাঁ হাতের রাস্তার নাম রেলওয়ে স্টেশন রোড, সেই রাস্তা ধরে আমরা এগিয়েছিলুম। তারপরে পশ্চিমে কাছারী রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে গ্র্যাণ্ড অ্যানিকাট ক্যানাল। ক্যানালের পুল পেরিয়ে বাঁ হাতের পথ ধরে মন্দিরের দরজায় পৌঁছে গেলুম।

রিক্সা থেকে নেমে আমরা দুটি গোপুরের নিচে দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকলুম। গোপুরের সামনে স্বাতি একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। গোপুরটি ভাল করে দেখে বলেছিল: শিবকাঞ্চীর মতো বিরাট নয়।

আমি বলেছিলুম: সুন্দরও নয় শিবকাঞ্চীর মতো।

ভিতরের প্রাঙ্গণটি কিন্তু বড় সুন্দর। চারি দিকে উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা বাঁধানো প্রাঙ্গণ। তার ভিতর অনেকগুলি মন্দির ও মণ্ডপ। সামনেই নন্দীর মণ্ডপ, এত বড় নন্দী যে আশ্চর্য হয়ে দেখতে হয়।

বৃহদীশ্বরের মন্দিরের দিকে আমরা এগিয়ে গেলুম। এক ব্রাহ্মণ এসে-ছিলেন এগিয়ে, মামীর পূজার বাসনা আছে জেনে বললেন একটু অপেক্ষা করতে। সাতটার সময় মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে, তার আর বেশি দেরি নেই। মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন: মন্দির এখন বন্ধ?

ব্রাহ্মণের কাছেই জানা গেল যে এই মন্দির সকালে সাতটা থেকে এগারোটা আর বিকেলে সাড়ে চারটে থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত যাত্রী-সাধারণের জন্য খোলা থাকে। এই প্রাঙ্গণে প্রবেশের কোন বাধা নেই, কিন্তু হিন্দু না হলে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

এই রকমের বিধি নিষেধ তাঞ্জোরে আরও আছে। রাজপ্রাসাদের

ভিতর যে আর্ট গ্যালারি আছে, তা খোলা থাকে সকাল সাড়ে আটটা থেকে বারোটা, আর বিকেল তিনটে থেকে ছটা। বুধবারে একেবারেই বন্ধ।

স্বাতি বলে উঠল: আজ বুধবার নয়?

বারের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলুম। ব্রাহ্মণ আমাদের বলে দিলেন যে আজ বুধবারই বটে!

মামা বললেন: তাতে ক্ষতি নেই কোন, বাইরে থেকেই আমরা সব দেখে নেব।

আমি বুঝতে পারলুম যে মামা এই খবর পেয়ে খুশী হয়েছেন, সময় মতো স্টেশনে ফিরতে পারবেন বলে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছেন।

স্বাতি বলল: এস, এই সময়ে আমরা মন্দিরটা ভাল করে দেখে নিই।

মামা বললেন: মন্দিরের ইতিহাসটা জেনে নিই গোপালের কাছে।

কিন্তু আমি কিছু বললুম না দেখে মামা বললেন: চুপ করে রইলে কেন?

বললুম: মন্দিরের ইতিহাসের কথা এই ব্রাহ্মণই ভাল বলতে পারবে।

লজ্জা পাচ্ছ কেন!

বলে স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল।

গম্ভীর ভাবে বললুম: আমি বললে তো আর রাজরাজ চোলের কথা বলব না, আমি বলব মহাভারত আর পুরাণের কথা।

মামা বললেন: সেই জন্যেই তো তোমার খোসামোদ করি।

এইবারে আমি লজ্জা পেলুম। কিন্তু তা প্রকাশ না করে বললুম: আমরা জানি যে দ্বারকার যাদবেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে ধ্বংস হয়েছিল। ঋষিদের শাপ ছিল আর অভিশাপ ছিল গান্ধারীর। কিন্তু ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস যা বলেন তা পড়ে মনে হয় যে যাদব বংশের কোন কন্যা বা দৌহিত্র দ্বারকা থেকে দক্ষিণ ভারতে পালিয়ে এসে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটি স্ত্রীরাজ্য বলে পরিচিত ছিল। রাজ্যের নাম পাণ্ড্য ও রাজধানীর নাম মাদুরা কেমন করে হল, তারও একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যাদব ও পাণ্ডব একই

বংশের দুটি শাখা ছিল, আর যাদবদের পুরাতন রাজধানী ছিল মথুরায়। এই জন্যে দক্ষিণ ভারতে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা পাণ্ড্য রাজ্য নাম দিয়ে রাজধানীর নাম রাখেন মাদুরা।

স্বাতি বলল ঃ এ তো তাঞ্জোরের কথা নয়!

আমি বললুম ঃ মেগাস্থিনিসের লেখায় চোল রাজাদের তাঞ্জোরের কথা পড়ি নি। অথচ তিনি সিংহলের কথাও লিখে গেছেন। তিনি বলেছেন যে খ্রীষ্টের জন্মের চার পাঁচ শো বছর আগে মগধের যুবরাজ বিজয়কে যখন তাঁর পিতা নির্বাসন দেন, তখন সেই বিজয় সিংহলে গিয়ে সিংহল অধিকার করে বসেন।

মামা বললেন ঃ বিজয় সিংহ তো বাঙলার ছেলে। এখনও আমরা গাই, একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।

মগধে তখন বাঙলার রাজা ছিল, সেকথা ভেবে দেখতে হবে। আমি মেগাস্থিনিসের কথা বলছি। তিনি বলেছেন যে ভারত ও সিংহলের মধ্যে তখন একটি নদীর ব্যবধান ছিল। সেই নদীর নাম তাম্রপর্ণী, পালি ভাষায় তাম্বপন্নি। গ্রীকরা তাই সিংহলকে বলত তাপ্রোবন। সিংহলে তখন শুধু সোনা আর মুক্তোই পাওয়া যেত না, হাতির ব্যবসা ছিল তাদের। সেই হাতি তারা বড় বড় নৌকোয় তুলে কলিঙ্গ রাজ্যে নিয়ে যেত বিক্রির জন্যে।

মন্দির খোলার সময় হয়ে এল। ব্রাহ্মণ বললেন ঃ আমি পূজোর ব্যবস্থা করে আসি।

মামাও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ তাঞ্জোরের কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

বললুম ঃ শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে আমরা চোল রাজ্যের উল্লেখ পাই, দ্রাবিড়-তৈলঙ্গয়োর্মধ্যে চোলদেশঃ প্রকীর্তিতঃ। তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড়ের মধ্যে ছিল চোল দেশ। হিউএন চাং এসে এই চোল রাজ্য দেখেছেন, কিন্তু পাণ্ড্য রাজ্যের কথা বলেন নি। চোল রাজ্যের সম্বন্ধে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলে বোধ হয় দক্ষিণে আর যান নি।

মামা বললেন ঃ তিক্ত অভিজ্ঞতা কিসের?

বললাম ঃ তিনি লিখেছেন যে চোল রাজ্যে তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা।

দেশের লোকের নীতিজ্ঞান নেই, বস্ত্রহীন জীবন যাপন করছে তারা। স্বভাবে নৃশংস ও কুটিল। সৈন্যরাও লুঠপাট করে খাচ্ছে বলে তিনি দেখেছিলেন। এ সব তাঁর শোনা কথাও হতে পারে। কাজেই চোল রাজ্যের কথা তাঁর লেখাতেও ফুটে ওঠে নি। এ দেশের লোকেরা নাকি বিশ্বাস করেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চোলরাজা পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে দুজন কৃষিজীবি এই দুই রাজ্যকে প্রতিষ্ঠান্বিত করেছিলেন। কিন্তু সে যে খ্রীষ্টের জন্মের আগের কথা তার প্রমাণ আছে পেরিপ্লাসে ও টলেমির লেখায়। পাণ্ড্যদেশের রাজা পাণ্ডীয়ান নাকি রোম সম্রাট অগাস্টাসের সভাতেও দূত পাঠিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ ফিরে এসে মামাকে ডাকলেন ঃ আসুন।

মামী মন্দিরের একটা ধাপের উপরেই বসে পড়েছিলেন। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি বললুম ঃ চল।

স্বাতি এগিয়ে গেল মামা ও মামীর সঙ্গে। আমি পিছিয়ে রইলুম। ভিতরে ঢুকবার আগে মন্দিরটা দেখলুম ভাল করে। দক্ষিণ ভারতে এ রকমের মন্দির আর নেই। সর্বত্রই দেখেছি যে মূল মন্দিরের চেয়ে গোপুরের উচ্চতাই বেশি। কিন্তু এই মন্দির দেখে উত্তর ভারতের মন্দিরের কথা মনে পড়ছে। বৈদ্যনাথের মন্দির দেখেছি, দেখেছি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ছবি। বেশ উঁচু মন্দির। বৈদ্যনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ প্রাকারে ঘেরা, কিন্তু কোন গোপুর নেই। বুদ্ধ গযার মন্দিরে প্রাকারও নেই। শুনেছি যে উত্তর ভারতের কোনখানেই গোপুর নেই। উড়িষ্যাতেও নেই। যাত্রীরা মন্দিরের কারুকার্য দেখে, আর দেখে দেবতা।

এই মন্দিরের পর পর দুটি গোপুর দেখেছি। বাহিরের প্রাকার দেখে এটিকে একটি দুর্গ বলে মনে হয়েছিল। পরে শুনেছিলুম যে শিবগঙ্গা নামে একটি ছোট দুর্গের মধ্যেই এই মন্দির। অন্য ধারে শিবগঙ্গা পার্ক, শহরের একটি সুন্দর বেড়াবার জায়গা।

এখানকার প্রথম গোপুরটি খুবই মজবুত আকারের। প্রচুর কারুকার্যও আছে। কিন্তু উচ্চতায় মাত্র ষাট হাত উঁচু। দ্বিতীয় গোপুরটি এর চেয়েও ছোট। অথচ বৃহদীশ্বরের মন্দির সগৌরবে মাথা উঁচু

করে আছে। সুব্রহ্মণ্য এর উচ্চতা বলেছিলেন দুশো ষোল ফুট। এর চেয়ে উঁচু মন্দির দক্ষিণ ভারতে যে আর নেই, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম।

বাহির থেকে মন্দিরটিকে দোতলা মনে হয়, দোতলার উপরে বিমান। দেওয়ালের গায়ে কিছু মূর্তি আছে, কিন্তু বিমানে শুধু জ্যামিতির নক্সা। বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের মতো নয়, অথচ মিল আছে খুব বেশি। একেবারে মাথার উপরে একখানা বিরাট পাথর, তার ওজন নাকি দুশো মণ। চার মাইল দূরের একটি গ্রাম থেকে মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত পথ তৈরি করে এই পাথরটিকে গড়িয়ে তোলা হয়েছিল।

পূজো শেষ করে মামী বেরিয়ে আসবার আগেই আমি ভিতরে ঢুকে পড়লুম। গভীর বিস্ময়ে দেখলুম বৃহদীশ্বরকে। এত বড় শিবলিঙ্গ আমি এই প্রথম দেখলুম। অমরাবতীতে এর চেয়ে উঁচু শিবলিঙ্গ দেখেছি, কিন্তু তাকে শিব বলে মনে হয় নি। এখানকার শিব দেখে বিস্ময় ও ভক্তিতে মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে গেল।

স্বাতি মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছিল। আমি তাকে চারিদিকে ও উপরের দিকে চেয়ে দেখতে বললুম। অজন্তার মতো চিত্র আছে দেওয়ালে ও ছাদে। অপরূপ এই সব চিত্র। মনোযোগ দিয়ে এসব না দেখলে মন্দির দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। স্বাতি এই সব ছবি দেখে যত আশ্চর্য হল, তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছিল আমার কথা শুনে। বাহিরে এসে আমাকে বলল ঃ এই ছবির কথা তুমি কোথায় জানলে ?

আমি বললুম ঃ ছবি দেখেছিলুম তোমার বইএ।

স্বাতি আরও আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল। তাই দেখে হেসে বললুম ঃ তোমার সঙ্গে যেসব বই আছে, তাতে অনেক নতুন কথাও আছে।

মামা মামী ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরাও এগিয়ে গেলুম। প্রথমে দেখলুম সুব্রহ্মণ্যের মন্দির। ভারি সুন্দর এই মন্দিরটি। এর কারুকার্য ঠিক কাঠের উপরের কারুকার্যের মতো। অন্য ধারে বিনায়কের মন্দির, আর করুভুরর নামে এক মুনির মন্দির। বৃহন্নায়কী আম্মন মন্দির ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিগুলি তাড়াতাড়ি দেখে

আমরা বেরিয়ে এলুম। ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে মামা রিক্সায় উঠে পড়লেন, বললেন : দেরি কোরো না আর।

রিক্সাওয়ালারা আমাদের শিবগঙ্গা পার্কে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সদর রাস্তায় পৌছেই বাঁ দিকে এই পার্ক। কিন্তু মামা বললেন : না না, পার্ক অনেক দেখেছি। সোজা প্যালেসে চল।

রিক্সাওয়ালার কাছেই জানলুম যে এই বাগানে খেলনার ট্রেন আছে, চিড়িয়াখানা আছে, বসবার ও বেড়াবার জায়গা আছে ছেলেবুড়োর মনের মতন। কিন্তু আমরা এ সব না দেখেই বড় দুর্গের দিকে এগিয়ে গেলুম।

পিছন দিক দিয়েই এই দুর্গে পৌছনো যায়, কিন্তু মামা বললেন : সামনে দিয়েই চল। বড় রাস্তার বাঁ ধারে এই দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথ। আমাদের রিক্সা এসে একেবারে গেটের সামনে দাঁড়াল।

রিক্সা থেকে নেমে আমরা ভিতরে ঢুকে গেলুম। বাহিরে একটা স্কুল ছিল, আর ভিতরে দেখলুম কতগুলি সরকারী অফিসের সাইনবোর্ড। সাত সকালে কিছু মানুষ জন দেখে জানতে পারলুম যে এই দুর্গের কিছু অংশে কয়েকটি পরিবার বাস করছে। এদের নাকি মালিকানা স্বত্ব আছে এই দুর্গের উপরে। কে জানে একথা ঠিক কিনা।

অনেকগুলি অট্টালিকা এই দুর্গের ভিতরে। ডানদিকে সরস্বতী মহল আর বামদিকে সঙ্গীত মহল। সরস্বতী মহলের কথা আমি সুব্রহ্মণ্যের কাছে শুনেছিলুম। কিন্তু তা দেখবার সুযোগ পেলুম না। একটা গলিপথে লাইব্রেরির দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখলুম যে দরজা বন্ধ।

সঙ্গীত মহলেরও দরজা বন্ধ দেখলুম। কিন্তু একজন লোকের কাছে শুনলুম এই মহলের গল্প। রাজা সর্বোজী মাদুরার তিরুমল নায়কের সভাগৃহের মতো করে এটি নির্মাণ করেছিলেন এমন কায়দায় যে সামান্য শব্দও নাকি সকলের কানে পৌছয়। জার্মানিতে ছাড়া আর কোন দেশে এরকমের আর একটি সঙ্গীত মহল নেই। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক ত্যাগরাজ এখানে বসে তাঞ্জোরের রাজাদের গান শুনিয়েছেন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল : ত্যাগরাজ কে ?

ত্যাগরাজের নাম শোন নি ?

নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জানি না কিছুই।

বললুম ঃ বিদেশে যেমন বিটোফেন আর উত্তর ভারতে তানসেন, দক্ষিণে তেমনি ত্যাগরাজ। এই তিনজন সঙ্গীতের দিকপাল বলে পৃথিবীতে পরিচিত।

স্বাতি আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে, বলল ঃ এমন কথা তো শুনি নি !

বললুম ঃ এদেশের লোক তাঁকে স্বয়ং বাল্মীকি বলেই বিশ্বাস করে। বাল্মীকি লিখেছিলেন চব্বিশ হাজার শ্লোক, এঁরও নাকি চব্বিশ হাজার গান আছে। আর একটা কথা শুনেও আশ্চর্য হবে। ইনি ছিলেন অন্ধ্র দেশের ব্রাহ্মণ, কিন্তু এঁর পিতামহ গিরিরাজ তাঞ্জোর রাজসভার সভাকবি ছিলেন বলে ত্যাগরাজের জন্ম হয়েছিল তাঞ্জোর জেলাতেই। এটা আশ্চর্যের কথা নয়, আশ্চর্যের বিষয় হল তাঁর গানের ভাষা। তিনি নাকি তাঁর সমস্ত গান তেলুগু ভাষাতে লিখেছেন, আর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটিক সঙ্গীত গাওয়া হয় তাঁর গানেই। এ আমার শোনা কথা, তাই খানিকটা সন্দেহ এখনও আছে।

মামা মামী এগিয়ে গিয়ে দুর্গের পিছনের অংশ দেখছিলেন। ছ সাত তলা উঁচু একটি অট্টালিকার দিকে চেয়ে মামা বললেন ঃ এটি কোন্ কাজে লাগত ?

বাসের জন্য এ অট্টালিকা নয়। ভিতরে একটি ঘোরানো সিঁড়ি আর বাহিরে বারান্দা ছাড়া এ অট্টালিকায় আর কিছু নেই। পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কোনও কাজে এর ব্যবহারের কল্পনা করা যায় না। কিন্তু শুনলুম যে এর উপরেও নাকি আরও পাঁচটি তলা ছিল। রাজা এর উপরে উঠে শ্রীরঙ্গমের মন্দির দেখতেন।

পিরামিডের মতো আরও একটি অট্টালিকা দেখলুম দুর্গের ভিতরে। বৃহদীশ্বরের মন্দিরের মতো একটি গোল পাথর তার শিখরে। মন্দিরের মতো শিখর নয়, কয়েকতলা অট্টালিকা যেন সূক্ষ্ম হয়ে একটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে।

দুর্গের ভিতরে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে বলে শুনলুম। তার নাম অন্ধকার মহল। এই জায়গাটি এমন ভাবে নির্মিত হয়েছে যে দিনের বেলাতেও অমাবস্যা রাতের মতো ঘন অন্ধকারে পথ সমাচ্ছন্ন থাকে, অথচ শীতল বাতাসে শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যায়। স্থানে স্থানে এখন এটি ভেঙ্গে পড়েছে।

আর্ট গ্যালারিও আমাদের দেখা হল না। বন্ধ আছে, বন্ধ থাকবে আজ। কিন্তু তার জন্যে মামার দুঃখ নেই। বললেন ঃ ভালই হয়েছে।

বলে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালেন।

চলতে চলতে মামী বললেন ঃ কাঞ্চীতে বলেছিলে যে আসল কামাক্ষী দেবী আছেন তাঞ্জোরে। সে মন্দিব তো দেখালে না ?

আমার দিকে চেয়ে মামা বললেন ঃ বিপদ দেখ।

আমি বললুম ঃ বিপদ কিসের ?

বিপদ নয় ! কোথায় এখন কামাক্ষী খুঁজতে যাব ?

তার জন্যে আমাদের ভাবতে হবে না, রিক্সাওয়ালাদের বললেই ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।

মামাও নিশ্চিন্ত হলেন শুনে যে স্টেশনে ফেরার পথেই আমরা কামাক্ষী মন্দির দেখতে পাব।

এই পথের দুধারে অসংখ্য মন্দির আছে। মামার তাড়ায় কোন মন্দিরেই আমরা নামলুম না। শুধু কামাক্ষী দেবীকে প্রণাম করে স্টেশনে ফিরলুম। বড় পবিত্র পরিবেশ এই মন্দিরটির। মনে হল যেন কাশীর বিশালাক্ষী দর্শন করলুম।

২৫

পথের ধারে কোন ভাল রেস্তোরাঁয় আমরা সকালের জলখাবার খেতে পারতুম। কিন্তু মামা রাজী হলেন না, বললেন ঃ স্টেশনে ফেরাই ভাল। স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে বসলে গাড়ি ছেড়ে যাবার তাড়া থাকবে না।

খেতে বসে মামা বললেন ঃ পেট ভরে খেয়ে নাও, দুপুরের খাওয়া আজ কখন জুটবে বোঝা যাচ্ছে না।

মামী বললেন ঃ কেন ?

মামা বললেন ঃ ত্রিচি পৌঁছেই ছুটতে হবে তো! যা দেখবার তা এই বেলাতেই দেখে নিতে হবে।

আমি বুঝতে পাবলুম যে দুপুর বেলায় মামা একটু বিশ্রাম করতে চান। গত কয়েক দিন তাঁকে সারা দিন ঘুরতে হয়েছে। কষ্ট হয়েছে তার জন্যে। তাই আমরা কোন প্রতিবাদ করলুম না।

যথাসময়ে আমরা ট্রেন ধরলুম। স্বাতিকে মামা মামীর সঙ্গে তুলে দিয়ে আমি এসে একটা তৃতীয় শ্রেণীতেই উঠলুম। কিন্তু অন্য বারেব মতো এবারে আর সঙ্গী পেলুম না। একজনের সঙ্গে কথা বলবাব চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু তিনি এমনভাবে তাকালেন যে ভয় পেয়ে চুপচাপ বসে রইলুম।

দেবদাসীদের সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার ছিল। একটা পুরনো বাঙলা গ্রন্থে যা পড়েছিলুম তার সবটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় নি। কাউকে পেলে জিজ্ঞাসা করে সঠিক খবর জেনে নিতে পারতুম।

আমি পড়েছিলুম যে উড়িষ্যার মন্দির থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারতের সকল মন্দিরেই আছে দেবদাসী। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পুরাকালে বিদেশেও এই রকম দেবদাসী ছিল। দেবতার সামনে নৃত্য-গীত করাই তাদের কাজ। দক্ষিণের কোন কোন জায়গায় নাকি নিয়ম ছিল যে

বাড়ির বড় মেয়েকে পাঠাতে হত মন্দিরে, সেখানে নৃত্য গীত শিখে তারা দেবদাসী হত। কেউ কুমারী জীবন যাপন করত, কারও বিবাহ হত খড়্গের সঙ্গে। কেউ নিজেকে অপ্সরা ভাবত অমরাবতীর, কেউ বা দেবতার পায়ে আত্মদান করে শুচি থাকত সারাজীবন। পুত্রকন্যার জননী হয়েছে অনেক দেবদাসী, প্রভূত বিত্তের অধিকারীও হয়েছে। কিন্তু সামাজিক নিয়মে পুত্রকে কিছুই দিতে পারে নি, দিয়েছে কন্যাকে, কন্যা না থাকলে দত্তক কন্যাকে। এদেরও তারা শিক্ষা দিয়ে দেবদাসী করেছে। এই গ্রন্থেই আমি পড়েছিলুম যে তখনও অনেক মন্দিরে দেবদাসী ছিল। কিন্তু সে প্রায় সত্তর বছর আগের কথা। কাজেই আজকের কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করেই জানতে হবে।

এক সময় আমরা গোল্ডেন রক স্টেশন পেরিয়ে গেলুম। যত রেল লাইন, তত রেলকর্মীর বাড়ি। রেলের বড় কারখানা আছে এইখানে। ট্রেন থেকে নামবার জন্যে অনেক যাত্রী তৈরি হতে লাগলেন। আমিও তৈরি হলুম।

ত্রিচি পৌঁছেই আমি মামার গাড়ির দিকে ছুটলুম। আর আমাকে দেখতে পেয়েই মামা বলে উঠলেন ঃ তাড়াতাড়ি কর গোপাল, সময় খুব কম।

স্বাতি বলল ঃ তুমি একটা রিটায়ারিং রুম দেখ, আমরা মাল পত্র নিয়ে আসছি।

কথা না বলে আমি রিটায়ারিং রুমের জন্যে ছুটলুম। একখানা ঘর পাওয়া গেল, সেখানা দখল করেই দেখলুম যে সবাই এসে গেছেন। মামা বললেন ঃ ঐ একখানাতেই হবে। তুমি এবারে ট্যাক্সি ধর একখানা।

আর রাতের গাড়িতে রিজার্ভেশনও তো করতে হবে।

বলে মামার দিকে তাকালুম।

মামা বললেন ঃ একখানা চার বার্থের কম্পার্টমেণ্ট নিও। বাইরের লোক থাকলে ভারি অসুবিধা হয়।

আমি প্রথমেই গেলুম রিজার্ভেশন অফিসে। তারা বলল ঃ ইণ্টার-মিডিয়েট স্টেশন থেকে রিজার্ভেশন তো আমরা গ্যারাণ্টি করি না, তবে এ

সময় প্রচুর জায়গা পাওয়া যায় গাড়িতে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, সময় মতো আমরা তুলে দেব।

নিশ্চিন্ত না হলেও ধন্যবাদ দিয়ে স্টেশনের বাহিরে এলুম। খানকয়েক ট্যাক্সি ছিল দাঁড়িয়ে, কয়েকজন ড্রাইভার ভাড়ার জন্যে ছুটে এল। গাড়িতে মিটার কারও নেই, চড়বার আগেই ভাড়া ঠিক করতে হবে। ভাঙ্গা হিন্দীতে ইংরেজী মিলিয়ে বললুম ব্যাপারটা। সব শুনে একজন জবাব দিল ঃ পনর টাকার কমে হবে না।

আমি আশ্চর্য হবার সুরে বললুম ঃ পনর টাকা! কতক্ষণ ধরে কী দেখাবে?

সে বলল ঃ সব দেখাব। প্রথমে শ্রীরঙ্গমের মন্দির, তারপরে জম্বুকেশ্বর শিব, সেখান থেকে টেপ্পাকুলম আর রক টেম্পল। উঠতে নামতে কত সময় লাগবে বলুন? তারপরে যদি চানে বাজারে সওদা করেন—

আমি বললুম ঃ বাস বাস!

মনে মনে ভেবেছিলুম যে ভাড়া বেশ সস্তাই হয়েছে, কিন্তু মুখে বললুম ঃ বড্ড বেশি চাইছ!

এ আমাদের ভারতীয় রীতি। একবারে ঠিক দাম চাইবে, এ আমরা আশাই করি নে। আর তারাও আশা করে না যে যা চাইবে তাই পাবে। কাজেই খানিকটা দরাদরি অপরিহার্য। যে পক্ষ সাধুতা দেখাবে, সেই ঠকবে।

ড্রাইভার বলল ঃ পথের দূরত্ব ভেবে আপনিই বলুন, পেট্রলের খরচ বাদ দিয়ে আমার মজুরি কী থাকবে!

পথের আন্দাজ আমার নেই। তবে জানি যে শ্রীরঙ্গম নামে একটা স্টেশন আছে মাইল কয়েক দূরে। জম্বুকেশ্বরও স্টেশনের কাছে নয়। ভাবলুম যে দরাদরি করব না। তাই কিছু না বলে পিছন ফিরতেই লোকটি বলল ঃ দুটাকা কম দেবেন।

আমি হাসলুম তার কথা শুনে। এবারেও তাকে কিছু না বলে সবাইকে ডাকবার জন্যে আমি এগিয়ে গেলুম। লোকটা আমার পিছু পিছু এসে চুপি চুপি বলল ঃ কাউকে বলবেন না, আমি বারো টাকাতেই আপনাকে সব দেখাব।

আর আমি তাকে ঝুলিয়ে রাখলুম না, বললুম ঃ একটু অপেক্ষা করা আমরা আসছি।

রিটায়ারিং রূমের একখানা ইজিচেয়ারে মামা বসে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্যাক্সির ভাড়ার কথা শুনে বসে পড়লেন। বললেন ঃ আমার মাথার চুল তো এঁচড়ে পাকা নয় গোপাল, অভিজ্ঞতায় পেকেছে। তোমার ভাড়ার কথা শুনে আমি ভয়ই পাচ্ছি।

আমি বললুম ঃ আমি তো জোর করে রফা করি নি।

মামা বললেন ঃ ভয় তো সেই জন্যেই। যা দেশকাল হয়েছে, জম্বু-কেশ্বরের নামে যমপুরী না পৌঁছে দেয়।

মামী বললেন ঃ কী যে বল তার ঠিক নেই!

মামা বললেন ঃ বলি *ঠিকই*। যে জায়গা চিনি নে জানি নে সেখানে জম্বুকেশ্বর নিয়ে যাচ্ছি বলে যদি গুণ্ডার আড্ডাতেই নিয়ে যায়, তবে তখন আর সে কথা বুঝে লাভ কী!

মামীও ভয় পেলেন খানিকটা, বললেন ঃ জানা-শুনো ট্যাক্সি পাওয়া যায় না?

কথাটা বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বললেন ঃ জানা-শুনোই বা কোথায় পাবে এখানে!

মামা এ সুযোগ হারাতে রাজী নন। সহাস্যে বললেন ঃ বেরিয়ে দেখ না একবার, আমার কোন শালা সম্বন্ধীর গাড়ি আছে কিনা?

দরজায় টোকা দিয়ে ওয়েটিং রূমের বেয়ারা এল ভিতরে। একখানা কার্ড দিল মামার হাতে। মামা সেখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ ধরেছে *ঠিক* লোককে।

জ্ঞানপ্রকাশম ড্যানিয়েলের কার্ড। কাঞ্জিভরমের ডীলার ইন সাউথ ইণ্ডিয়ান সিল্ক অ্যাণ্ড লিনেন।

মামী বললেন ঃ কোনও চেনা লোক বুঝি!

মামা বললেন ঃ শাড়ি দেখবে?

এই কি শাড়ি দেখবার সময়!

বেয়ারা কী বুঝল সেই জানে, কার্ডখানা ফেরৎ নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই এল ফিরে। এবারে সেই কার্ডের ভীলার ইন সাউথ ইণ্ডিয়ান সিল্ক অ্যাণ্ড লিনেন কথাটা কালি দিয়ে কাটা।

স্বাতি যে এতক্ষণ ঘরে ছিল না আমি তা খেয়াল করি নি। স্নান করে এই বারে সে সামনে এল। বলল ঃ তোমার কোন বন্ধু নয় তো গোপালদা ?

বললুম ঃ দেখে আসি।

বাহিরে বেরিয়ে আমি নিতান্ত অপ্রস্তুত হলুম। নমস্কার করে বললুম ঃ আপনি এসেছেন ! কী ভুলই করেছিলুম দেখুন তো। আপনার নামটা জেনে নিই নি বলে পরে আমার খুব আফসোস হয়েছিল।

এ সেই তাঞ্জোরের ভদ্রলোক, মাদ্রাজ থেকে যাঁর সঙ্গে চিঙ্গলপেট এসেছি। এঁরই উৎসাহ না পেলে ভাল করে কাঞ্চী দেখবার কৌতূহল হত না। ভদ্রলোক বললেন ঃ আমি এই মাত্র এসে পৌছলুম।

বাধা দিয়ে আমি বললুম ঃ আমরাও তো এইমাত্র এলুম !

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কই, গাড়িতে আপনাদের দেখতে পাই নি তো !

ঠিক এই সময়ে মামারা দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের সঙ্গে আমি তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম। মামা বললেন ঃ বেশ হল, নতুন জায়গায় একজন জানা লোক পাওয়া গেল।

দরজায় তালা দিলেন মামী।

আমরা বেরচ্ছি দেখে ভদ্রলোক আর বসতে রাজী হলেন না, বললেন ঃ আপনাদের কথা আমার মনে ছিল। ভাবলুম যে নতুন জায়গায় আপনাদের যদি কিছু সাহায্য করতে পারি—

মামা বললেন ঃ সত্যিই আপনার বড় দয়া।

ড্যানিয়েল বললেন ঃ এ আপনি বেশি বলছেন। কত দূর থেকে এসেছেন আপনারা কত দেখবার আগ্রহ নিয়ে! কত চোর আপনাদের চুরি করবে, কত ঠক আপনাদের ঠকাবে, কত ব্যবসাদার গাইড আর পাণ্ডা আপনাদের সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়ে তার অ্যাড্‌ভাণ্টেজ নেবে। যা দেখবেন, তার

চেয়ে না-দেখাই থাকবে বেশি ; যত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করবেন, তার বদলে হয় তো তেমন কিছু নিয়ে যাবার মতো পাবেন না। তাই ভাবলুম, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি আপনাদের—

গাড়িতে এই একই কথা বলেছিলেন সুব্রহ্মণ্য। এঁরা সকলেই কি একই রকম চোখে দেখেন বিদেশীদের !

মামা তাঁর ভাবনার কথা বললেন। প্রশ্ন করলেন ঃ ত্রিচিনপল্লীর সব-কিছু দেখতে কী রকম ট্যাক্সি ভাড়া লাগে বলতে পারেন ?

ভদ্রলোক খবরটা সঠিক জানেন না। বললেন ঃ আমার ছোট ভাই এখানে পদস্থ কর্মচারী। তাবই গাড়িতে আমি বেড়াই। তবে যত দূর মনে হয়, দশ পনর টাকার বেশি নেবে না।

চলতে চলতেই বললেন ঃ চলুন না, আমি আপনাদের গাড়ি ঠিক কবে দিচ্ছি। আমার তো কোন কাজ নেই এখানে, আমি আপনাদের সব দেখিয়ে দেব।

প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগল, বোধ হয মামাবও। নিঃশব্দে আমরা তা অনুমোদন করলুম।

সেই ট্যাক্সির ড্রাইভার সামনেই অপেক্ষা করছিল। দেখবামাত্র আমাকে একটা ইশারা করে গাড়ি আনতে দৌড়ল।

মামা আমাকে বললেন ঃ একটু খোঁজ খবর নিলে ভাল হত না !

তাই নিচ্ছি।

বলে আমি কেটে পড়লুম।

এখানে আমার পরিচিতের ভিতর সেই রিজার্ভেশন ক্লার্কটি। ব্যবহার তাঁর ভাল। ভাবলুম, তাঁকেই জিজ্ঞেস করি।

সব শুনে ভদ্রলোক বললেন ঃ দাঁড়ান, ইনি আমাদের পুরনো লোক। এঁকে সঙ্গে নিয়ে আসি।

বলে এক বৃদ্ধ সহকর্মীকে সঙ্গে নিলেন।

ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলে নিচেই দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ো ভদ্রলোকটি তাকে দেখেই নিশ্চিন্ত হলেন, বললেন ঃ এ তো আমাদের জানা লোক, রোজ দু বেলা দেখি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

একটা পুলিস দাঁড়িয়ে ছিল পোর্টিকোর সামনে। মামা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিলেন। সেও সেই কথাই বলল। ড্রাইভার বেচারী বড় অপ্রস্তুত হয়েছে, অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন: কি রে, ভাল করে সব দেখাতে পারবি তো?

মাথা নেড়ে ড্রাইভার সম্মতি জানাল।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন: এঁরা বিদেশী লোক, যত্ন করে দেখাস সব কিছু।

এঁদের নিজেদের ভাষায় কথা। ড্যানিয়েল তার তর্জমা করবার সময় যোগ করলেন: এরা ডাকাতি গুণ্ডামি কখনও করেছে বলে শোনা যায় নি।

ঘটনাটি যে তিনি সম্পূর্ণ বুঝেছেন, তা বোঝা গেল তাঁর পরের কথায়: গরিব দেশ, তাই অল্পেই সকলে সন্তুষ্ট।

ড্যানিয়েল ও আমি ট্যাক্সির সামনে বসলুম।

ড্যানিয়েল বললেন: প্রথমে চল অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশনে। এখনও বোধ হয় স্টুডিও খোলা আছে।

এখানে যাবার কথা ছিল না, কিন্তু ড্রাইভার আপত্তি করল না।

ড্যানিয়েল বললেন: সেখানে সকলে আমাকে চেনেন। তাঁরা সব দেখিয়ে দেবেন ভাল করে। বেশ লাগবে আপনাদের এই স্টুডিও দেখতে।

পিছনে মামী বাঙলায় কথা বলছেন। বললেন: মন্দির দেখতে বেরিয়েছি, সোজা মন্দিরেই চল না।

স্বাতির বোধ হয় রেডিও স্টেশন দেখবার সাধ ছিল। বলল: চল না একবার ঘুরেই যাই।

মামী বললেন: এখন ঘোরাঘুরি করলে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে।

মামা বললেন: তা যা বলেছ। রঙ্গ দেখতে গিয়ে রঙ্গনাথের দরজা বন্ধ হয়ে গেলেই কেলেঙ্কারি।

রেডিও স্টেশন কাছেই। একটা সরু রাস্তায় দু পাক দিয়েই ট্যাক্সি একটা গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল। একখানা পুরনো বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি

ছায়াচ্ছন্ন অনেকখানি নিরিবিলি জমির উপরে। মনে হল, কোনও অবসরপ্রাপ্ত শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের বাড়ি এলুম।

মামী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন ঃ না না, নেমো না কেউ।

গাড়ি থামতেই ড্যানিয়েল নামতে যাচ্ছিলেন। মামা বললেন ঃ বুঝিয়ে বল না তুমি গোপাল।

আমি বুঝিয়ে বললুম। ড্যানিয়েল ক্ষুণ্ণ হয়ে আবার দরজা বন্ধ করলেন, বললেন ঃ বড় যত্ন করে সব দেখাতেন এঁরা।

তারপর ড্রাইভারকে নিজের ভাষায় কী নির্দেশ দিলেন। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার আবাব কী জিজ্ঞেস করল, ড্যানিয়েল আবার কী বোঝালেন তাকে। বোধ হয় আমরা কেন নামলুম না সেই কথা, কিংবা কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবে সেই নির্দেশ।

ড্যানিয়েলের পরনে একখানা খদ্দরের সাদা লুঙ্গি, আর গায়ে ছিটের শার্ট, পায়ে খাদির চটি দেখছি। হাতের অ্যাটাচি কেস আর চাদর-জড়ানো বালিশটা গাড়িব পিছনে তুলে দিয়েছেন। কোন কথা না বলে রিটায়ারিং রুমের দরজায় তালা দেওয়া দেখেই বুঝেছিলুম যে মামীর ভাল লাগে নি এই লোকটিকে। এইবারে সেই কথা প্রকাশ কবলেন, বললেন ঃ একা রামে রক্ষে নেই, লক্ষ্মণ দোসর। চেনা নেই শোনা নেই, কোথা থেকে কাকে জোটালে সঙ্গে!

মামা বললেন ঃ চেনা নেই মানে, গোপালের তো বন্ধু-লোক!

মামী উত্তর দিলেন ঃ এক গাড়িতে উঠলেই বন্ধু হয়ে গেল!

মামা বললেন ঃ বন্ধু তো এমনি করেই হয়।

মামীর কণ্ঠে একটু তিক্ততা প্রকাশ পেল, বললেন ঃ একটা পরামর্শ নেওয়া তো কুষ্ঠিতে লেখে নি, বিপদে পড়লে তখন পস্তিও না।

মামার দুর্বলতা দেখলুম এইখানে। বললেন ঃ তবে করি কী! নেমে যেতে তো বলতে পারি নে।

মামী বললেন ঃ তবে বিপদকেই ডাক।

মামা ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলেন তাঁর পাইপে। তারপর স্বগতোক্তি করলেন বিড়বিড় করে ঃ যত গণ্ডগোল এই মেয়েদের নিয়ে!

আবার তিনি পাইপ টানলেন জোরে জোরে। তারপর বাঙলাতেই বললেন ঃ তোমার মামীর কথা শুনছ তো গোপাল ?

বললুম ঃ আজ্ঞে।

যেমন বন্ধু জুটিয়েছ, এখন তার ব্যবস্থা কর।

আজ্ঞে।

মামা চটে উঠলেন, বললেন ঃ আজ্ঞে মানে! ভদ্রলোককে কি নামিয়ে দেবে!

বললুম ঃ তিনি নিজেই নেমে যাবেন।

এবারে আমি ড্যানিয়েলের সঙ্গে আলাপ শুরু করলুম ঘনিষ্ঠ ভাবে ঃ সত্যিই, আপনাকে আমরা খুব কষ্ট দিচ্ছি! এই ড্রাইভারটি তো ভাল লোক বলছেন, দেখছিও তাই, দিব্বি চালাচ্ছে গাড়ি। এবারে তো আমরা শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে যাবে। সেখানে শুনেছি জাতিভেদ এখনও মানে। মহাত্মাজী সব করলেন হরিজনদেব জন্যে, কিন্তু এ মন্দির এখনও সবার জন্যে খোলা হল না। হিন্দু না হলে নাকি একেবারে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বলুন তো কী অন্যায়! আপনি এত কষ্ট করছেন আমাদের জন্যে, আর শেষে কিনা আপনাকে ফেলে আমাদের ভেতরে ঢুকতে হবে! না না, সে আমরা পারব না। তার চেয়ে আপনি বরং আপনার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন। আমরা এই ভেবে আনন্দ পাব যে আমাদের উপকার করতে এসে আপনি লাঞ্ছিত হন নি।

ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ করলেন প্রথম দিকটায়। তারপরে ড্রাইভারকে নিজের ভাষায় কী নির্দেশ দিতেই সে সদর রাস্তা ছেড়ে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল।

পিছন ফিরে মামার উদ্বেগ দেখলুম মুখে, মামী বোধ হয় দুর্গানাম জপ করছেন।

ড্যানিয়েল বললেন ঃ আমার এক বন্ধু থাকেন এই গলিতে। তাঁর গাড়িতে করে ক্যাণ্টনমেণ্টে নিজের ভাইয়ের কাছে চলে যাব। আপনাদের অসুবিধে হবে না, এই গলিটা আবার বড় রাস্তায় পড়বে।

একটা বড় বাড়ির সামনে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। ড্রাইভার পিছনটা খুলে তাঁর অ্যাটাচি কেস আর বিছানাটা বার করে দিল।

খানিকটা এগিয়ে আবার সদর রাস্তায় পড়তেই স্বাতি প্রাণ খুলে হেসে উঠল। মামা বললেন ঃ তুমি চাকরি না নিয়ে দেশনেতা হলে না কেন গোপাল ?

বললুম ঃ মানুষটা যে ভদ্রলোক তাতে সন্দেহ নেই।

সে প্রমাণ পেয়েছিলুম ত্রিচি ছাড়বার আগেই। লজ্জায় ও দুঃখে ধিক্কার দিয়েছিলুম আমাদের প্রাণহীন সভ্যতাকে!

২৫

কাবেরী হঠাৎ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে বেষ্টন করে আছে শ্রীরঙ্গম। মাইল সাতেক পথ পেরিয়ে আর কাবেরীর পুল ডিঙিয়ে আমরা শ্রীরঙ্গমের মন্দির দ্বারে এসে নামলুম।

গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি বলল : জান গোপালদা, দু মাইল জায়গা জুড়ে এই মন্দির।

বললুম : এতে আয়তনটা ঠিক বোঝা গেল না। এর পরিধি দু মাইল হলে যত বড় ভাবব, তার চেয়ে ঢের বড় হবে এর আয়তন দু বর্গ মাইল হলে।

স্বাতি বলল : অত শত আমি জানি নে।

ইতিমধ্যেই এক ব্রাহ্মণ এসে মামা-মামীকে কবলস্থ করলেন এবং তাঁর সনাতন নিয়মে মন্দিরের ইতিহাস থেকে দ্রষ্টব্য সব-কিছুরই বর্ণনা শুরু করে দিলেন। আশ্চর্য এঁদের মানুষ চেনার ক্ষমতা! ভাঙা হিন্দীর ভিতর বাঙলার ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। যেখানে আটকে যাচ্ছেন তাঁর বর্ণনায়, সেখানে ইংরেজী দিয়ে সেই ফাঁকটুকু জুড়ে দিচ্ছেন। বললেন : শ্রীরঙ্গনাথজীর মূর্তি কে স্থাপন করেছেন জানেন? লঙ্কার রাজা বিভীষণ। মন্দিরের ভেতর বিভীষণের শ্রীরঙ্গনাথজীকে অর্চনার মূর্তি আপনাদের দেখিয়ে দেব। খ্রীষ্টের জন্মের ঢের আগে তৈরি হয়েছে এই মন্দির। নাভাজীর ভক্তমাল গ্রন্থে আছে যে শ্রীরঙ্গনাথজীর দুই ভক্ত মামা আর ভাগ্নে স্পর্শমণি চুরি করে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শ্রীরামানুজচরিতে এই বিবরণ অন্য রকম। অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গই আলোয়ার একজন ভক্তকবি নামে খ্যাতি লাভ করেন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে চারজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। একজন তর্কে সকলকে পরাস্ত করতে পারতেন, একজন ফুঁ দিয়ে তালা খুলতে পারতেন,

একজন পা দিয়ে ছায়া স্পর্শ করে লোকের গতিরোধ করতে পারতেন, আর একজন জলের ওপর ভ্রমণ করতে পারতেন। এই তিরুমঙ্গই শ্রীরঙ্গনাথজীর বনাকীর্ণ ভাঙা মন্দিরটি সংস্কারের জন্যে রাজা ও ধনীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যখন ব্যর্থ হলেন, তখন এই চারজন শিষ্য নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন।

বিজ্ঞের মতো ব্রাহ্মণ বললেনঃ জানেন, এই তিরুমঙ্গই ছিলেন সেদিনের সত্যিকার রাজা। নিজে ভিক্ষুক থেকেও দরিদ্রের পালন ও দুষ্টের দমন করে গেছেন। তাঁর পরের যুগে দক্ষিণের সমস্ত বংশের রাজারাই এই মন্দিবের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। তবে দু শো বছর আগে বিশ্বনাথ নায়ক এই মন্দিরের আমূল সংস্কার করে দেন।

চলতে চলতে ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমরাও দাঁড়ালুম। বললেনঃ এই গোপুরটি দেখুন। এই রকমেব সাতটি গোপুর পেরিয়ে মূল মন্দির। একুশ ফুট উঁচু এই প্রাকার, আর এর বেড় দু মাইলেরও বেশি। এক দিকে তিন হাজার আব অন্য ধারে আড়াই হাজার ফুট।

প্রথম গোপুরটি পার হয়ে আমরা হতবাক্ হয়ে গেলুম। এ যে একটি শহর! দিল্লীর আজমীরী গেটের কথা শুনেছি। নতুন দিল্লীর দিক থেকে এই গেট পেরিয়ে পুবনো দিল্লী দেখতে যেমন লাগে, কতকটা সেই বকম। তেমনই জমজমাট, ট্রাম বাস না থাক্, বড় বড় দু-তিনতলা বাড়ি না থাক্, কিন্তু লোক জন আছে, গাড়ি গরু আছে, আছে চওড়া রাস্তা আর বাজার হাট।

আমাদের বিস্ময় লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণ বললেনঃ আরও দুটি গোপুরের ভেতর এই রকম। হাজার হাজার লোক বসবাস করছে ভোগ দখলের অধিকার নিয়ে। প্রাকারের বেড় দেড় মাইল আর এক মাইল। মাঝখানে চওড়া রাস্তা, দুধারে ঘরবাড়ি দোকানপাট যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা, সবই আছে। এই তো শ্রীরঙ্গম শহর।

আমাদের বিস্ময় দেখে ব্রাহ্মণ সহাস্যে বললেনঃ এতেই অবাক হচ্ছেন! এখনও যে সবই পড়ে আছে।

একটা একটা করে তিনটে গোপুর পার হবার পর ব্রাহ্মণ আবার

দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন ঃ দেখুন এই গোপুরটি। এতক্ষণ চার ধারে চারটি গোপুর ছিল। এবারে তিনটি। কুম্ভকোনামের গোপুর দেখেছেন তো, এক শো আটাশ ফুট উঁচু! ওধারের ওই গোপুরটি তার চেয়েও বড়, এক শো পঞ্চাশ ফুট।

আমরা গোপুর দেখলুম, দেখলুম তার কারুকার্য। শেষশায়ী শ্রীরঙ্গ-নাথজী, তাঁর ভক্ত নম্মা আলোয়ার, রামসীতার মূর্তি, আরও কত কি!

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ এই পর্যন্ত সকলের জন্যে অবারিত। এর পর ম্লেচ্ছ আর অস্পৃশ্যের প্রবেশ নিষেধ।

আমরা আরও অনেক প্রাকার ডিঙোলুম, আরও অনেক গোপুরের নিচে দিয়ে এক জায়গায় এসে ব্রাহ্মণ আমাদের মূল মন্দিব দেখালেন। বললেন ঃ দেখুন, ওঁকার আকার এই মন্দিরের। এই যে চাবটি সোনার কলস দেখছেন, তা চার বেদের প্রতীক। বিমানং প্রণবাকারং বেদশৃঙ্গম্। আর ঠিক চূড়ার কাছে দেখুন, সোনার বিষ্ণুমূর্তি। আদি বিষ্ণু।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ এত বড় জায়গা জুড়ে মন্দির, এমন বিরাট সব গোপুর, তার ভেতর মন্দির হল এইটুকু?

আমি ঠিক মনে করতে পারলুম না, কোন একটা ইংরেজী বইয়ে দক্ষিণ-ভারতের মন্দির সম্বন্ধে পড়েছিলুম। এ দেশের স্বাধীন রাজাবা রাজ-প্রাসাদ তৈরি কবেন নি কোন কালে। তাঁরা দুর্গের মতো করে মন্দির তৈরি করতেন, আর পরিবারবর্গ নিয়ে তারই মধ্যে বসবাস করতেন। মন্দিরের ভিতরেই থাকত তাঁদের সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যবর্গ। যিনি যত বড় রাজা, তত বড় তাঁর মন্দির। আর রাজ্য যখন হস্তান্তর হত রাজায় রাজায় হার জিতের পর, তখন পুরনো মন্দিরের প্রাকার বাড়ত কিংবা নতুন মন্দির তৈরি হত। নতুন মন্দির গড়া না হলে নতুন রাজার বিজয় ঘোষণাই সম্পূর্ণ হত না। সে যুগের রাজারা তো নিজেকে রাজা ভাবতেন না, ভাবতেন দেবতার দাস, দেবতার হয়ে প্রজা পালন করছেন। এই রীতিটুকু ত্রিবাঙ্কুরে সেদিনও বজায় ছিল। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা পদ্মনাভস্বামীর সেবায়েত-রূপেই রাজ্য পরিচালনা করেছেন। দেশ স্বাধীন হয়ে রাজা এখন রাজ-প্রমুখ হয়েছেন, দেবতার বদলে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন

করছেন। আজ তাঁর পদ্মনাভজীর পূজোটা একটা পারিবারিক প্রথা মাত্র।

ব্রাহ্মণ মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি পাথরের গরুড়মূর্তি দেখালেন। কৃতাঞ্জলিপুটে একটি সৌম্য মূর্তি প্রভুর আদেশের জন্য অপেক্ষমাণ। দক্ষিণ-ভারতের আর সমস্ত মন্দিরের মত প্রাঙ্গণে একটি সোনার তালগাছও দেখলুম। এর সাধারণ নাম গরুড়-স্তম্ভ।

মন্দিরের ভিতর নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ রঙ্গনাথস্বামী দর্শন করালেন। এখানে বিজলীর আলো নেই। প্রদীপের আলোয় দেখলুম অনন্ত শয়নে শায়িত বিষ্ণুমূর্তি, তাঁর মাথার উপর শেষনাগ সপ্তফণা বিস্তার করে আছেন।

মামী বললেন ঃ পূজো দেব।

মামা বললেন ঃ তা হলে গোপাল—

কিন্তু আমাকে কিছুই করতে হল না। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত তৎপর ভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন।

স্বাতি বলল ঃ এস গোপালদা, ততক্ষণে আমরা খানকয়েক ছবি তুলে নিই।

আমরা ছবি তোলার নাম করে ঘুরে ঘুরে আরও সব জিনিস দেখতে লাগলুম। হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ, তার নিচে পাথরের বিরাট রথ, হাতি-শালা, গোশালা, আরও কত কি! কতকগুলো থাম স্বাতির ভারি পছন্দ হল। সামনের পা দুটো তোলা ঘোড়ার উপরে যোদ্ধা বসে আছে যুদ্ধের ভঙ্গিতে। স্বাতি বলল ঃ দাঁড়াও, এর একটা ছবি নিই।

ক্যামেরা ঠিক করে বলল ঃ পেছনের গোপুরটা পেলে ভাল হত।

কিন্তু দুটো আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। থামটা ভাল করে পেতে হলে গোপুরের মাথা কাটা যায়, আর গোপুরটা পুরো নিতে হলে থামটা বাদ দিতে হয়। শেষে বিরক্ত হয়ে স্বাতি বলল ঃ তার চেয়ে তুমি দাঁড়াও, তোমার একটা ছবি নিই এই থাম ব্যাকগ্রাউণ্ড করে।

বললুম ঃ আমি তো যোদ্ধা নই, ঘোড়াও নই, আমার আবার ছবি নেওয়া কেন?

স্বাতি বলল ঃ তুমি যে ঘোড়া নও তা দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু যোদ্ধা হতে ভয় কিসের?

শেষে যোদ্ধার মতোই প্যাঁচ কষে দাঁড়ালুম।

স্বাতি ক্লিক করে ছবি নিয়ে বলল ঃ থ্যাঙ্ক ইউ।

প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তের দরজা দিয়ে মামা-মামীকে আসতে দেখা গেল। কাছে এসেই মামী বললেন ঃ তোমরা কী রকমের ম্লেচ্ছ গো! পূজোর নাম শুনতেই পালিয়ে এলে!

মামীর হাতে ফুলচন্দন আর প্রসাদ ছিল। আমাদের নির্মাল্য আব প্রসাদ দিলেন। বললেন ঃ এইটে রঙ্গনাথস্বামীর, আর এইটে রঙ্গনায়কী লক্ষ্মীদেবীর।

ব্রাহ্মণ আমাদের বৈকুণ্ঠদ্বার দেখালেন। মন্দিব প্রাকারে একটা বন্ধ দরজা। বললেন ঃ মাঘ মাসের বৈকুণ্ঠ একাদশীতে রঙ্গনাথস্বামীর সব চেয়ে বড় উৎসব। সেদিন এই দরজা খোলা হবে, আর রঙ্গনাথস্বামী একা শোভাযাত্রা করে বৈকুণ্ঠধাম যাবেন। এই দেখুন হাজার স্তম্ভের সভামণ্ডপ, বৈকুণ্ঠ-একাদশীর উৎসবে শ্রীরঙ্গনাথজীকে এই মণ্ডপে আনা হবে। ওই হল বিভীষণের রথ।

বলে সেই স্থাবর পাথবের রথটি দেখালেন।

স্বাতি বলল ঃ রঙ্গনাথস্বামীর যে বিশাল পাথরের মূর্তি দেখলুম, তা কি তোলা যায় সেখান থেকে?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ মূল মূর্তি কেন তোলা হবে! আপনি দেখেন নি বুঝি রঙ্গনাথস্বামীর ভোগমূর্তি? সেই যে দেখালুম সেই দাঁড়ানো মূর্তিটি!

মামী বললেন ঃ স্বাতি তখন ছিল না।

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ দক্ষিণ ভারতের সব মন্দিরেই দেবতার একটি ভোগ-মূর্তি থাকে। উৎসবের দিন সেই ভোগমূর্তিটি নিয়েই যত উৎসব আর শোভাযাত্রা। মূল মূর্তিকে কোথাও নড়ানো হয় না।

আমাদের শ্রীবৈকুণ্ঠ দেখা হল। ব্রাহ্মণ বললেন ঃ বৈকুণ্ঠ এ দেশে চারটি। প্রথমটি চিদম্বরম থেকে চব্বিশ মাইল দূরে শ্রীমুষ্ণম্, দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বালাজীর ক্ষেত্র তিরুপতি, তৃতীয় এই শ্রীরঙ্গম, আর চতুর্থ তেনেভেল্লি জেলার তোতাদ্রি।

দেখা হল বিষ্ণু শ্রীদেবী ভূদেবী ও লীলাদেবীর মূর্তি, এক পাশে ঋষি-মণ্ডলী, অন্য দিকে গোদাদেবী।

ব্রাহ্মণ বললেনঃ গোদাদেবীর উপাখ্যান বড় সুন্দর। এই যে গোদাদেবী দেখছেন ইনি মাদুরার তিপ্পান্ন মাইল দূরে বিল্লিপুত্তুর শহরে বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত পেরিয়া আলোয়ারের কন্যারূপে লালিত হন। পেরিয়া অপুত্রক ছিলেন। একদিন তুলসীবনে এই কন্যাটি লাভ করেন ও তাঁর নাম রাখেন অণ্ডাল। পরে এই মিষ্টভাষী মেয়েটির নাম রাখা হল গোদা। গোদা মানে গো অর্থাৎ মিষ্টবাক্যের দাতা। গোদার নারায়ণে অসীম ভক্তি তাই বড় হয়ে বললেন যে নারায়ণ ভিন্ন আর কাউকে তিনি বিয়ে করবেন না। পেরিয়া উদ্বিগ্ন হলেন, কিন্তু তার পরেই স্বপ্নে নারায়ণের আদেশ পেলেন যে গোদা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তিনিই তাঁকে বিয়ে করবেন। এদিকে বিষ্ণু মন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণও স্বপ্নাদেশ পেলেন, গোদাকে বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত করে মন্দিরে আনবার জন্যে। এর পরের ঘটনা বড় অলৌকিক। শিবিকা থেকে নেমে গোদা যখন বিগ্রহের সম্মুখে এলেন, নারায়ণ দু হাত বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। আর গোদা অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই বিগ্রহমূর্তিতে। নারায়ণ পেরিয়া আলোয়ারকে দেখা দিয়ে বললেনঃ আজ থেকে তুমি বিষ্ণুর শ্বশুর নামে খ্যাত হবে।

মামী আর একবার গোদাদেবীকে প্রণাম করলেন।

স্বাতির মুখ দেখে মনে হল যে এ সব গল্প সে বিশ্বাস করে না। ব্রাহ্মণ দুঃখ পেলেন তার ভাবান্তর না দেখে। বললেনঃ আজ আমরা ধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছি, তাই আমাদের দুঃখের শেষ নেই।

নৃসিংহদেবের মূর্তি দেখলুম। ব্রাহ্মণ বললেনঃ আপনাদের চৈতন্য মহাপ্রভু এই মূর্তি দেখে পাগল হয়েছিলেন।

আমরা রাম লক্ষ্মণ সীতা ও হনুমানের মূর্তিও দেখলুম। ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রের গলায় শালগ্রামের মালা দেখিয়ে বললেনঃ এই মালা দিয়েছেন নেপালের রাজা।

চলতে চলতে ব্রাহ্মণ বলছিলেনঃ এ মন্দির দেখে শেষ হয় না। ষাট বছর ধরে যে মন্দির তৈরি হল সে কি আর ষাট মিনিটে দেখা হয়!

বলে আর এক জায়গায় থামলেন। বললেন : এই দেখুন, কবি কাম্বারের সমাধি। ইনিই লিখেছেন তামিল রামায়ণ। এই রামায়ণ ঘরে নেই এমন হিন্দু পাবেন না দক্ষিণ ভারতে।

আমরা তামিল জানি নে। রামায়ণের বাঙলা অনুবাদ পড়েই মুগ্ধ হই। যাঁরা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়েছেন তাঁবা বলেন যে সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। আর যাঁরা মূল সংস্কৃতের রস গ্রহণ করেন, তাঁরা তো বাল্মীকির রামায়ণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাল্মীকির অনুবাদ হতে পারে, এ কথা তাঁরা মানতেই রাজী নন।

মামী তখন অপ্‌লিঙ্গ জম্বুকেশ্বরের মাথায় ফুল জল চড়াবাব কথা ভাবছেন। বললেন : তোমরা যেমন খাওয়া শোবার কথাটি মনে রাখতে পার, তেমন যদি কাজের কথাটি মনে রাখতে পারতে তো অনেক সুবিধে হত।

মামা বললেন : কেন, ভুলে আবার কী গেলুম ?

মামী আবার মনে করিয়ে দিলেন যে আরও দুটি মন্দির দেখা এখনও বাকি আছে।

ব্রাহ্মণটি বাঙলা বোঝেন কিছু কিছু। বললেন : চলুন, তা হলে জম্বুকেশ্বরেই যাওয়া যাক।

মন্দির থেকে বেরবার সময় দু ধারের দোকানগুলো আবার দেখা গেল। নানা অপ্রয়োজনীয় শৌখিন জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। মন্দিরে যাবার সময় তারা কথা কয় না, ফেরার পথে দৃষ্টি তাবা আকর্ষণ করবেই। স্বাতির ভাল লাগল সূক্ষ্ম বেতের কাজ করা নানা আকারের ছোট ছোট ডালা। বলল : দেখছ মা, কী সুন্দব এই ট্রেগুলো ! ঠিক হরতন আর চিড়িতনের মতো।

মামী হনহন করে এগিয়ে চলেছিলেন। স্বাতি বলল : বুঝলে মা, লোককে দেবার মতো জিনিস। দেশে ফিরলে বন্ধুবান্ধব তো কী এনেছ কী এনেছ করে ছেঁকে ধরবে !

রাগত ভাবে মামী থামলেন, বললেন : পুজো করে আর কাজ নেই, এই সবই কিনি !

তারপর দোকান থেকে যখন সেই ডালা পছন্দ করে কিনতে লাগলেন, তখন মনে হল না যে তাঁর পূজোর তাড়া আছে। এইবার রহস্য করলেন মামা, বললেনঃ জিনিস কিনতে পূজোর সময় উত্তীর্ণ হলে আর দোষ নেই।

মামী বললেনঃ এমন সস্তার জিনিস তো দেশে পাওয়া যায় না, পাঁচজনের জন্যে কিছু নিয়ে গেলে তোমার অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হবে।

ব্রাহ্মণ বললেনঃ শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর অলঙ্কার দেখবেন না?

মামী বললেনঃ বাবার আবার অলঙ্কারও আছে নাকি!

স্বাতি বললঃ কেন, পড় নি সেই বইখানায়!

মামী বললেনঃ অলঙ্কার না দেখে ফিরে যাব!

স্বাতির পছন্দ হল প্রস্তাবটি। আর উত্তর দিলেন মামা, বললেনঃ না না, ফেবার আর দরকার কী! তোমারই তো তাড়া ছিল কিনা!

যথারীতি মন্দিব সমিতির দক্ষিণা দাখিল করে অলঙ্কার দেখা গেল। হীরা ও মণিমুক্তা খচিত সোনার নানা অলঙ্কার, বহু লক্ষ টাকার বসন ভূষণ ও তৈজসপত্র।

পরম কৌতুকে স্বাতি সব দেখছিল। দেখা শেষ হলে বললঃ বিয়ের সময় কোন রাজকন্যাও এত গয়না পায় না।

স্বাতির এই মন্তব্য শুনে আমার তিরুমঙ্গাই আলোয়ারের কথা আবার মনে পড়ল। দস্যুবৃত্তি করে তিনি এই মন্দিরের জন্য অনেক ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন। অদ্ভুত তাঁর জীবনের কথা। সে কথা শুনলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

গায়ের রঙ নীল ছিল বলে তাঁর নাম ছিল নীলন। যুদ্ধ ছিল তাঁর জাতের পেশা। আর নিজের বীরত্বের জন্য তিনি কোলা রাজার সেনাপতি হয়েছিলেন, পরে রাজা হয়েছিলেন একটি করদ রাজ্যের। দেশের আর দশজন ঐশ্বর্যবানের মতো তিনিও পার্থিব সুখে গা ভাসিয়ে দিলেন। সুন্দরী নারী ও নর্তকীরা তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকত। তখন তাঁর নাম হয়েছে তিরুমঙ্গাই!

একদিন তিনি কুমুদবল্লী নামে এক দেবদাসীকে দেখে মুগ্ধ হলেন।

তাকে তিনি বিবাহ করবেন বলে বদ্ধপরিকর হলেন। কুমুদবল্লীর পিতার কাছে গেলেন এই প্রস্তাব নিয়ে। রাজাকে জামাতা রূপে পাবেন বলে তিনি তো মহা খুশী, কিন্তু কন্যা রাজী নয়। বলল, আমি বিষ্ণুর দাসী, মানুষকে বিয়ে করব না।

অনেক সাধ্য সাধনায় সে রাজী হল, বলল—বিয়ে যদি করতেই হয় তো এমন বিষ্ণুভক্তকে করব যে প্রতিদিন হাজার আট বৈষ্ণবের সেবা করবে।

রাজা বললেন, তথাস্তু।

তিনি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হলেন, আর বিবাহ করলেন কুমুদবল্লীকে। কিন্তু তার দ্বিতীয় শর্ত রক্ষায় অল্প দিনেই নিঃস্ব হয়ে গেলেন। প্রতিদিন হাজার আট বৈষ্ণবের সেবা তো কম ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। প্রথমে ধার কর্জ করলেন, লুঠপাট করলেন, শেষে রাজার রাজস্ব পড়ল বাকি। সম্মুখ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন না, বন্দী হলেন কৌশলে।

তাঁর বৈষ্ণব সেবা বন্ধ হল বলে তিরুমঙ্গাইএর দুঃখের আর সীমা রইল না। তিনি বিষ্ণুর শরণ নিলেন। তারপরে গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখলেন রাতে। সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে মুক্তি পেলেন। কিন্তু একদিন সে অর্থও ফুরিয়ে গেল। রাজা তিরুমঙ্গাই হলেন দস্যু তিরুমঙ্গাই।

তারপরে তাঁর জীবনে সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটল। একদিন রাতে দস্যুবৃত্তি করতে ঢুকলেন এক রাজপ্রাসাদের ভিতর। প্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে বিষ্ণুর বিগ্রহ নানা অলঙ্কারে সজ্জিত। তিনি সেই সব অলঙ্কার খুলে একটি পুঁটুলি বাঁধলেন। বিগ্রহের আঙুলের একটি আংটি খোলবার জন্যে যেই দাঁত লাগিয়েছেন, অমনি তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল, চোখের জল গড়াল দুচোখ বেয়ে। অলঙ্কারের পুঁটুলি তাঁর পড়ে রইল, তাঁর কান্না হল গানে পরিণত। তিরুমঙ্গাই কবি হলেন, তীর্থ পবিক্রমা করলেন। ভক্তি দেখে অনেক শিষ্য হল তাঁর।

মন্দিরের ব্রাহ্মণ তাঁর চারজন শিষ্যের কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন। এদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল তিরুমঙ্গাইকে। কাবেরী নদীর তীরে যেদিন তিনি রঙ্গনাথের মন্দির দেখলেন, সেদিন দুঃখে তাঁর বুক ভরে

গেল। মন্দিরের ভগ্ন দশা, বন জঙ্গলে চারিদিক ছেয়ে গেছে, পূজার ভাল ব্যবস্থা নেই। তিরুমঙ্গাই বললেন, এই মন্দিরকে আবার মহিমান্বিত করতে হবে। তাঁরা অর্থসংগ্রহে বেরলেন। কিন্তু অর্থের বদলে পেলেন অপমান ও নিগ্রহ। তাঁর শিষ্যরা বলল, আমরা অর্থসংগ্রহ করব।

এই চার শিষ্য এক সঙ্গে যেতেন ধনীর গৃহে। যিনি তর্কবিদ্ তিনি গৃহস্বামীকে তর্কে নিযুক্ত রাখতেন। দ্বিতীয় শিষ্য ফুঁ দিয়ে তালা খুলতেন, তৃতীয় শিষ্য ছায়ায় পা দিয়ে সবাইকে আটকাতেন, আর চতুর্থ অপহরণ করতেন সব ধনরত্ন। এইভাবে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হলেন তাঁরা। নানা দেশ থেকে এল শিল্পী ও মজুর, যাট বৎসর ধরে এই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হল।

কিন্তু তারপরে এল বিপদ। লুণ্ঠনের আর প্রয়োজন নেই বলতেই পুরনো দস্যুরা বিদ্রোহী হল। তিরুমঙ্গাই প্রমাদ গণলেন। তাঁর যে শিষ্য জলের উপরে হাঁটতে পারেন তিনি বললেন, আমি এর ব্যবস্থা করছি।

বলে সমস্ত দস্যুদের এক নৌকোয় তুললেন। বললেন, কাবেরী নদীর যেখানে ধনরত্ন লুকনো আছে, সেইখানে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

বর্ষার কাবেরী তখন কূলে কূলে ফুলে আছে। আকাশে দুর্যোগের সঙ্কেত। তার উপরে সন্ধ্যার অন্ধকার এল ঘনিয়ে। দস্যুদের অনেকে ভয় পেল। কিন্তু নির্ভীক চিত্তে তিরুমঙ্গাইএর শিষ্য তাদের নিয়ে চললেন। দেখতে দেখতেই ঝড় উঠল প্রবল বেগে, উত্তাল জলে তোলপাড় করে নৌকো ডুবে গেল। একজন দস্যুও রক্ষা পেল না। শুধু সেই শিষ্য জলের উপর দিয়ে হেঁটে গুরুর কাছে ফিরে এলেন।

দস্যু তিরুমঙ্গাইএর কথা দক্ষিণ ভারতের লোক আজকাল ভুলে গেছে। তারা জানে যে তিরুমঙ্গাই আলোয়ার একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ভক্ত কবি, দরিদ্রের রাজা।

শ্রীরঙ্গমের ব্রাহ্মণও আমাদের সঙ্গে জম্বুকেশ্বর দেখাতে চললেন। এখানকার রীতিই নাকি এই। ব্রাহ্মণেরা একবার ধরলে জম্বুকেশ্বর দেখিয়ে তবে ছাড়েন।

স্বাতি বলল: দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি ও পড়েছি। শ্রীরঙ্গমের মন্দির দেখে নিরাশ হতে হল।

ব্রাহ্মণটি কি বাঙলা কথা বুঝতে পারেন! বললেন: শ্রীরঙ্গমের মন্দির দক্ষিণ ভারতের সব চেয়ে বড় মন্দির, তার পর মাদুরাই, তার পরে রামেশ্বরম। শ্রীরঙ্গম বড় ব্যাপ্তিতে, সৌন্দর্যে মাদুরাই, আর গাম্ভীর্যে রামেশ্বরম। আমরা জম্বুকেশ্বর যাচ্ছি। তার জাঁকজমক নেই, কিন্তু সৌন্দর্যে শ্রীরঙ্গমের অনেক ওপরে।

মামী একটি পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। বললেন: এখানে কোন্ লিঙ্গ?

ব্রাহ্মণ বললেন: অপ্‌পু লিঙ্গম্। শিব এখানে জলের ওপরে ভাসছেন। কাঞ্চীতে আপনারা পৃথিবী লিঙ্গ দেখেছেন তো, আর তিন লিঙ্গও বোধ হয় আপনাদের দেখা হয়েছে—তিরুবন্নমলয়ের তেজ লিঙ্গ, কালহস্তীর বায়ু লিঙ্গ, আর চিদম্বরমের আকাশ লিঙ্গ।

চিদম্বরমের নাম আমি শুনেছি, কালহস্তীর কথাও শুনেছি তিরুপতির পথে। গুডুর-রেনিগুণ্টা লাইনে কালহস্তী তিরুপতি থেকে মাইল কুড়ি পূর্বে। অনেকে এই কালহস্তীকে দক্ষিণ কৈলাস বলেন। পুরাণে নাকি আছে যে ব্রহ্মা তপস্যা করবার জন্য কৈলাস পর্বতের চূড়াকে কালহস্তীতে স্থাপন করেছিলেন। শিবের এখানে বায়ুমূর্তি, তার মানে কোন মূর্তিই নেই। মন্দিরের ভিতর লিঙ্গের স্থান নির্দেশ করবার জন্যে একটি প্রদীপ জ্বেলে

রাখা হয়। বাতাস নেই, অথচ শিখাটি থরথর করে কাঁপে। মামী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তিরুবন্নমলয় আবার কোন্ দিকে ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ খুব কাছে, ভিল্লুপুরম-কাটপাড়ি লাইনে এই তিরুবন্নমলয়। আগে আমি সেইখানেই ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, শালার কথায় লোভে পড়ে এখানে এসেছি। ব্রাঞ্চ লাইনের স্টেশন, যাত্রী বেশি হয় না। বছরে দুটো উৎসব। তার মধ্যে কার্তিক মাসের দীপম-উৎসবেই সারা বছরের কামাই। শালা ত্রিচিতে কাজ করে। বলল, ত্রিচিতে সারা বছর যাত্রীর ভিড়। দুটো পয়সা বেশি পেলে তার ভাগ্নেরা ভাল থাকবে বলে আমায় এখানে টেনে আনল। শহরে থেকে থেকে পয়সাটা তারা বেশি চিনেছে ! কিন্তু পয়সাই কি সব !

আমি প্রশ্ন করলুম ঃ তিরুবন্নমলয় বুঝি খুব ভাল জায়গা ?

ব্রাহ্মণ গদগদ ভাবে বললেন ঃ ভাল জায়গা নয়। পাহাড়ের নিচে অমন মন্দির এদেশে কটা আছে ? শুধু বড় হলেই তো হয় না ! যে দেবতার জন্যে মন্দির, সেই দেবতাই সেখানে বড় হওয়া দরকার। তিরুবন্নমলয়ে গিয়ে গোপুরমের বাইরে দাঁড়িয়েই আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। সামনে অরুণাচলের কী অপূর্ব দৃশ্য ! পাহাড়ের একটি চূড়া মনে হবে যেন শিবলিঙ্গের মতো মাথা উঁচু করে আছে। চারটি বড় বড় গোপুর আর প্রাকার দিয়ে ঘেরা মন্দির। তার ভিতর নাটমন্দির, সভামণ্ডপ, পার্বতী আর গণেশজীর মন্দির। হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ দেখলেন এখানে, সেখানেও দেখবেন। সেখানকার কার্তিগাই দীপম একবার দেখলে জীবনে আর ভুলবেন না। দশ দিন ধরে এই উৎসব, লক্ষ লক্ষ যাত্রী, কী সমারোহ ! আলোয় আলোয় উজ্জ্বল মন্দির, আগুনে আগুনে উজ্জ্বল পাহাড়, এর তুলনা দেখি না কোনখানে। শিবের জন্যে তপস্যা করে পার্বতী কার্তিকের এই পূর্ণিমা তিথিতে শিবের দর্শন পেয়েছিলেন একটা আগুনের শিখার মতো। সেই থেকে এই কার্তিগাই দীপম।

মামী বললেন ঃ শিবের জন্য তপস্যা তো পার্বতী হিমালয়ে করেছিলেন। এখানে এলেন কোন্ দুঃখে !

পার্বতীর তপস্যার গল্প শোনালেন ব্রাহ্মণ। কাঞ্চীপুরমের সেই গল্প।

খেলাচ্ছলে পার্বতী-শিবের দুচোখ চেপে ধরেছিলেন। একটি মাত্র মুহূর্ত। কিন্তু দেবতার একটি মুহূর্ত হল দীর্ঘ সময়। এই সময়ে ত্রিভুবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রইল, চন্দ্র সূর্যের উদয় হল না আকাশে। পার্বতীর খেলায় ত্রিভুবনের প্রাণীর দুঃখ জেনে শিব অসন্তুষ্ট হলেন, ত্যাগ করলেন পার্বতীকে। পার্বতী তপস্যা করতে এলেন পৃথিবীতে। শিবের আদেশেই তপস্যা আরম্ভ করলেন গঙ্গার তীরে। কিন্তু ফল হল না। একদিন আকাশবাণী হল, কাঞ্চীপুরমে গিয়ে তপস্যা কর। পার্বতী সেখানেও তপস্যা করলেন দীর্ঘকাল। তারপর আবার আকাশবাণী শুনলেন, অরুণাচলে যাও। এই অরুণাচলে তপস্যা করেই পার্বতী শিবের দর্শন পেলেন। অরুণাচল পাহাড়ের উপর থেকে তিনি জ্যোতির্ময় রূপে দর্শন দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণের কাছে এই উৎসবের কথাও শুনলুম। সুন্দর করে সাজিয়ে শিব ও পার্বতীর উৎসব মূর্তি আনা হয় মণ্ডপে। আর তখনই একটা হাউই-বাজী ছোঁড়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বলে ওঠে। তার জন্যে আগে থেকেই ব্যবস্থা থাকে। যে কুণ্ডের সামনে পার্বতী তপস্যা করেছিলেন, সেই কুণ্ডেই আগুন জ্বালানো হয়।

ব্রাহ্মণ বললেনঃ মন্দিরটিও ছোট নয়। এগারোতলা উঁচু এর গোপুর। সাড়ে তিন শো বছর আগে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় এর নির্মাণ শুরু করেছিলেন। শেষ হয়েছিল তাঞ্জোরের রাজা সেবাপ্পা নায়কের সময়। সেই হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ আর সরোবর এ দুইই নির্মাণ করিয়েছেন রাজা কৃষ্ণদেব রায়। চোল রাজারাও অজস্র ভাবে দান করেছেন এই মন্দিরে।

তিরুপ্পুগজ শুনেছেন? ভক্ত অরুণগিরিনাথরের লেখা ধর্মগান, তামিলনাদে সুব্রহ্মণ্যের ভক্তেরা যা শুনলে পাগল হয়? সেই অরুণগিরিনাথর এইখানে বাস করতেন। একদিন তিনি জীবনে বীতরাগ হয়ে মন্দিরের গোপুর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। নিচে দাঁড়িয়ে সুব্রহ্মণ্য তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁকে। এর পর তিনি ষোল হাজার গান লিখলেন, যার তেরো শো গান এখনও লোকের

মুখে মুখে শোনা যায়। সুব্রহ্মণ্যের সঙ্গে এই কবির একটি সুন্দর মূর্তি আছে পাহাড়ের পূর্ব দিকে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রাহ্মণ বললেন: আমি রমণ মহর্ষির আশ্রমে একটা কাজের চেষ্টা করেছিলুম। সেখানে কাজ পেলে এখানে কিছুতেই আসতুম না।

জম্বুকেশ্বরের মন্দির বেশি দূর নয়। মাইল খানেকের বেশি হবে না দূরত্ব। ড্রাইভার গাড়ি একেবারে ভিতরে নিয়ে এল। আমাদের ব্রাহ্মণ সম্বিৎ ফিরে পেয়েই নিজের কর্তব্য শুরু করলেন। বললেন: সাহেবরা বলেন, যে এই মন্দির সাড়ে তিন শো বছর আগের। কিন্তু সত্যি কথা তা নয়। চোল রাজারাই এই মন্দির তৈরি করেছিলেন।

দু ধারে দোকানপাটের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। এই মন্দিরটিও পাঁচটি উঁচু প্রাকার-বেষ্টিত। প্রথম প্রাকারের ভিতর রাস্তার দু ধারে অনেক ঘর বাড়ি। অন্য প্রাঙ্গণগুলি ছোট। প্রাঙ্গণের কোথাও মণ্ডপ, কোথাও বা মন্দির।

মামা মামী পূজো দিলেন। আমরা দূর থেকে প্রণাম জানালুম।

মামী বললেন: ভারি আশ্চর্য মন্দিরের ভেতরটা! সারাক্ষণ জল আসে কোথা থেকে! বাবার অপ্‌লিঙ্গ নাম সার্থক হয়েছে।

ব্রাহ্মণ বললেন: কাবেরীর স্রোতের সঙ্গে যুক্ত একটি কূপ আছে। এ সেই কূপের জল, প্রস্রবণের মতো সারাক্ষণ নির্গত হচ্ছে।

প্রাঙ্গণের পার্বতী-মন্দিরটিও দেখলুম। তার সামনের চাতালে মন্দিরের কাহিনী উৎকীর্ণ করা আছে চমৎকার ভাবে।

ব্রাহ্মণ মন্দিরের কাছে একটি প্রাচীন জামগাছ দেখালেন। বললেন: ত্রিপুরারি এই গাছের নিচে দীর্ঘ কাল তপস্যা করে নাম নিয়েছেন জম্বুকেশ্বর। অনেকে বলেন যে পার্বতী এখনও এখানে মহাদেবের জন্য তপস্যারত।

ভাল লাগল এই মন্দিরটি, ভাল লাগল এর শান্ত আবহাওয়াটি। গাড়িতে ওঠবার সময় ভিখারীরা এগিয়ে এল। যখন এসেছি, তখন

এরা কোথায় ছিল দেখি নি। ফেরার সময় সরু সরু হাত পেতে ঘেঁষে দাঁড়াল মেয়ে পুরুষ ছেলে মেয়ে। আসবার সময় লুকিয়ে থাকাই বোধ হয় এদের অভ্যাস। দেবদর্শনের পর পরিপূর্ণ অন্তরে ফেরবার সময় মানুষ বোধ হয় নিজেকেও বিলিয়ে দিতে চায়। মামীও দিলেন দু হাতে।

ব্রাহ্মণ বড় রাস্তার মোড়ে নেমে গেলেন। গোটা দুই টাকা হয়তো আশা করেছিলেন, কিন্তু মামা কিছু বেশিই দিলেন।

ফেরার পথে মামা বললেন: ব্রাহ্মণ যে রমণ মহর্ষির কথা বলল তাঁর সম্বন্ধে তুমি কিছু শুনেছ? বলে মামা আমাব দিকে তাকালেন।

বললুম: মহর্ষি তো এই শতাব্দীবই মানুষ। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে একাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ক্যান্সাব রোগে।

মামা বললেন: রামকৃষ্ণদেবেরও তো ক্যান্সার হয়েছিল!

মহাপুরুষদের কেন এই রোগ হয় জানি নে। সারাজীবন যিনি কষ্ট স্বীকার করেছেন, তিনিও শান্তিতে মরতে পারেন নি। মাদুরার কাছে তিরুচী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে। নাম ভেঙ্কট রমণ আয়ার, পিতা তাঁব আইনজীবি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুব পরে ভেঙ্কট রমণ কাকাব কাছে মানুষ। এই পরিবারের অনেক ছেলে সন্ন্যাসী হয়েছিল বলে মায়ের মনে সারাক্ষণ ভয় ছিল। একদিন সেই ভয় সত্যে পরিণত হল। ষোল বছর বয়সে ভেঙ্কট রমণ গৃহত্যাগ করে অরুণাচলে এসে উপস্থিত হলেন। কঠোর তপস্যা করেছেন তিনি। মৌনাবলম্বন করে অনাহারে দেবতার চরণামৃত পান করে তিনি দিন কাটিয়েছেন। তাঁর গুরু নেই, তাঁর সম্প্রদায় নেই, তাঁর ধর্মমত নেই। মানুষ তাঁর কাছে এসেছে, শিষ্য হয়েছে, আশ্রম গড়েছে তারা। মহর্ষির আশ্রম আজও তীর্থের মতো পবিত্র।

মহর্ষির মায়ের কথাও আমার মনে আছে। পুত্রকে তিনি সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। ব্যর্থ হয়ে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন পুত্রের আশ্রমে। সংসারী মানুষের মতো মহর্ষি তাঁর মায়ের সেবা করেছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত।

২৭

শ্রীরঙ্গম যাবার সময় আমরা টেপ্পাকুলম সরোবর আর গির্জাটা বাঁয়ে রেখে ত্রিচি শৈল দেখতে দেখতে গিয়েছিলুম। ফিরলুমও সেই পথে। এইবারে ওই পাহাড়ের উপরে ছোট মন্দিরটাতে উঠতে হবে। মধ্যাহ্নের সূর্য মাথার উপরে উঠেছে অনেকক্ষণ আগে। আকাশে মেঘও নেই আজ। এ কী পরিহাস! যেখানে রোদ চেয়েছি, সেখানে বৃষ্টি পড়েছে। আর আজ একটুখানি মেঘ পেলেই খুশী হতুম, তা নয় গরমে ঘেমে উঠছি সেই থেকে।

মামী বলেছিলেন ঃ থাক এ বেলা। খেয়ে দেয়ে এখন বিশ্রাম কর। ও বেলায় আবার দেখা যাবে।

কিন্তু মামা রাজী হন নি, বলেছিলেন ঃ এ বেলাতেই ল্যাটা চুকিয়ে নাও। ও বেলায় নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করা যাবে।

স্বাতি বলল ঃ জান গোপালদা, দু শো তিয়াত্তর ফুট উঁচু পাহাড়, শ পাঁচেক সিঁড়ি ভাঙলে মন্দিরে পৌঁছনো যাবে।

মামা বললেন ঃ সকালের খাবার তো হজম হয়ে গেছে। খালি পেটে পারবে অত দূর উঠতে ?

মামী বললেন ঃ খেয়েদেয়ে আবার মন্দিরে কে যায় ?

স্বাতি উত্তর দিল মামার কথার। বলল ঃ আমি পারব না! তর-তর করে উঠে গেলাম সাবিত্রী পাহাড়ে, আর এখানে এইটুকু পারব না!

মামা হেসে বললেন ঃ তখন বয়সটাও কম ছিল মা, হালকা শরীরের সুবিধে কত!

দুধারে ঘন বাজারের ভিতর দিয়ে গাড়ি এনে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার দরজা খুলে বলল, একটু পিছিয়ে মন্দিরে উঠবার সিঁড়ি।

মামা বললেন ঃ তোমরা না হয় ঘুরে এস, আমি গাড়িতেই একটু বসে থাকি।

মামী বললেন : সে কি, মন্দিরের দরজা থেকে কি ফিরে যেতে আছে!

ড্রাইভার কিছু একটা পরামর্শ দেবার কথা বোধ হয় ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই মামাকে নামতে দেখে ক্ষান্ত হল।

স্বাতি বলল : বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

তৃষ্ণা সকলেরই পেয়েছে। ড্রাইভারকে জলের কথা জিজ্ঞেস করতে বলল, পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ির নিচেই জল আছে।

জল আছে সত্যি, কিন্তু যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমন নয়। পাহাড়ের গা থেকে একটা নলে জল পড়ছিল, লোকে আঁজলা ভরে খাচ্ছে। মামা বললেন : অসম্ভব। এ জল খেলে নিশ্চয়ই অসুখ করবে।

আমি বললুম : তা হলে—

স্বাতি বলল : কফি খাবার কথা ভাবছ তো!

মামা বললেন : সেই ভাল। সে খেলে অসুখও করবে না, গায়েও খানিকটা জোর পাওয়া যাবে।

মামী আপত্তি করে ফল পেলেন না, কাছেই একটা দোকানে আমরা কফি খেয়ে নিলুম।

সিঁড়ির বহর দেখে ভয় যে হল না তা নয়—সিঁড়ির শেষ নেই। ধাপে ধাপে উঠে এক জায়গায় মনে হচ্ছে বুঝি শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সেখানে উঠে দেখি আবার ততগুলি সিঁড়ি। মেয়েরা আর স্থূলাঙ্গরা ধাপে বসে বিশ্রাম করছেন জায়গায় জায়গায়, যেখানটায় মণ্ডপের মতো। নিচে এখন মামা ও মামীকে দেখা যাচ্ছে না। একটুখানি দাঁড়াতেই স্বাতি আমাকে ধরে ফেলল। দম নিয়ে বলল : শ খানেক হল। আর কিছুটা উঠলেই একটা জানলা দিয়ে ত্রিচি শহরটা দেখা যাবে।

বললুম : তাই নাকি!

স্বাতি বিজ্ঞের মতো হাসল।

সেই জানলা দিয়ে দেখলুম ত্রিচি শহর। হুমড়ি খেয়ে স্বাতিও দেখল।

আবার ওঠা।

স্বাতি বলল ঃ আর কিছু সিঁড়ি ভাঙতে পারলে লক্ষ্মীর মন্দির।

বললুম ঃ তাই নাকি!

স্বাতি আবার হাসল।

লক্ষ্মীর মন্দিরও দেখলুম। যতটা দেখবার জন্যে, তার চেয়ে বেশি দম নেবার জন্যে।

আবার ওঠা।

স্বাতি বলল ঃ আর একত্রিশটি সিঁড়ি ভাঙলে কার্তিক আর দুর্গার মন্দির।

বললুম ঃ তাই নাকি!

এবারেও স্বাতি হাসল বিজ্ঞের মতো।

কার্তিক আর দুর্গার মূর্তিও দেখলুম।

স্বাতি বলল ঃ এবারে ভাল করে জিরিয়ে নাও গোপালদা, একটানা অনেকটা উঠতে হবে। এক শো ছেচল্লিশটা সিঁড়ি, তবেই পাবে শিবের মন্দির।

বললুম ঃ সেখানেই বিশ্রাম নেব তা হলে।

আবার ওঠা।

বললুম ঃ কত সিঁড়ি ওঠা হল?

স্বাতি বলল ঃ দু শো ষোলটা হয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ কোথায় জানলে এত কথা?

স্বাতি এই প্রশ্নের অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। খুশী হয়ে বলল ঃ কিছু জানতে নেই বুঝি আমাদের!

বললুম ঃ তার পরেও যদি কিছু জানবার থাকে তো আমাকে জিজ্ঞেস কোরো।

স্বাতি বলল ঃ ভারি অহঙ্কার দেখছি!

বললুম ঃ মেয়েদের চেয়ে বেশি জানি, এইটুকুই অহঙ্কার।

স্বাতি বলল ঃ আপত্তিকর কথা।

মনে মনে আমি তার কথা মেনে নিলুম, কিন্তু মুখে কোন কথা বললুম না।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে স্বাতিই আবার বলল ঃ বল দেখি এখানকার কোন নতুন কথা।

তার আগে তোমার জানা কথা সব শুনিয়ে দাও।

স্বাতি বলল ঃ সকলের ওপরে গণেশের মন্দির।

বাস্?

স্বাতি একটা ধাপের উপরে বসে বলল ঃ বাস্।

আমিও বসলুম। সত্যিই আমাদের বসবার দরকার হয়েছিল অনেক আগেই। জেদ করেই এতক্ষণ বসি নি।

স্বাতি বলল ঃ এবারে তোমার নতুন কথা বল।

আমি ইতিহাসের গল্প বললুম। একাদশ শতাব্দীতে পল্লব রাজারা এই শৈল-মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই মন্দিরের মূল দেবতা তায়ুমানবর নামে একজন ভক্তকবি ছিলেন এ দেশে। তিনি ছিলেন বিজয়নগর বংশের। আর এ দেশ শাসনের ভার ছিল তাঁর ওপর। আধুনিক কালে এই মন্দিরটি ব্যবহার করা হয়েছে একটা দুর্গের মতো। আর দক্ষিণ দেশের দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ হয়েছে এই মন্দির অধিকার উপলক্ষ নিয়ে।

আমি পুরনো গল্প শোনাচ্ছি বলে স্বাতি প্রতিবাদ করল না। তাই বাকিটুকুও শোনালুম।

তখন দুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখছেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাধল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ আর দৌহিত্র মুজফ্ফর জঙ্গের মধ্যে। দুপ্লে দৌহিত্রের পক্ষ নিলেন আর চাঁদা সাহেব নামে একজনকে দাঁড় করালেন কর্ণাটের নবাব আন্ওয়ার উদ্দীনের বিরুদ্ধে। এই দুটি দাবিদার দুপ্লের সহায়তায় এক বছরের মধ্যে আন্ওয়ার উদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করলেন। দুপ্লের অধীনে চাঁদা সাহেব হলেন কর্ণাটের নবাব, আর আন্ওয়ারের পুত্র মুহম্মদ আলি ত্রিচিতে পালিয়ে এসে এই মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। সিংহাসনের কাঁটা রেখে চাঁদা সাহেব ক্ষান্ত হলেন না। বিরাট সৈন্যদল নিয়ে এই দুর্গটি অবরোধ করে বসে রইলেন। এখন আর একে দুর্গ বলা সঙ্গত নয়। কেন না যে বিরাট দেওয়াল দিয়ে এই শহর ঘেরা ছিল,

সে দেওয়াল ভেঙে গেছে। তবু দুর্গ নামটি এখনও বেঁচে আছে। চারিদিকের এই শহর অঞ্চলটা এখনও ফোর্ট নামে পরিচিত।

স্বাতি মন দিয়ে গল্প শুনছিল। বললুম: মুহম্মদ আলি মুক্তি পেল কখন জান? ১৭৫২-র গ্রীষ্মে, তার মানে প্রায় বছর তিনেক পরে। আর সে আমাদের বাঙলা-বিজয়ী রবার্ট ক্লাইভের মরণপণে। সণ্ডার্স তখন মাদ্রাজের শাসনকর্তা। ক্লাইভ বললেন, দুপ্লের আধিপত্য আর সহ্য হয় না, আপনি আদেশ করলেই আমি তার দাঁত ভেঙে দিই। সণ্ডার্স সম্মত হলেন ক্লাইভের যুক্তিতে। ক্লাইভ তখুনি তিন শো দিশী আর দু শো ইংরেজ সেপাই নিয়ে চাঁদা সাহেবের রাজধানী আর্কট অধিকার করলেন অতর্কিতে। উদ্দেশ্য ছিল যে খবর পেয়ে চাঁদা সাহেব এ-মুখো হলেই মুহম্মদ আলিকে উদ্ধার করবেন। হলও তাই। চাঁদা সাহেব চার হাজার সৈন্য পাঠালেন আর্কট উদ্ধারের জন্যে। তিপ্পান্ন দিন অবরোধ করে থাকবার পর নবাবের সৈন্যেরা যখন ফিরছে, ক্লাইভ পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। ক্লাইভের চেষ্টায় চাঁদা সাহেবকে ত্রিচির অবরোধ পরিত্যাগ করতে হল, আর মুহম্মদ আলি মুক্ত হয়ে কর্ণাটের নবাব হলেন। ক্লাইভ যে বাড়িতে বাস করতেন, সে বাড়িটিও নিচে আছে।

সহাস্যে স্বাতি বলল: হার মানলাম তোমার কাছে। আমাদের বইয়ে আছে সিঁড়ির হিসেব আর ঠাকুরের ঠিকুজি।

আবার সিঁড়ি ভাঙার পর্ব। বললুম: ওই দুটোই তোমার সত্য স্বাতি। ওই সিঁড়ি আর ঠাকুর। ঠাকুরের টানেই এই সিঁড়ি ভাঙবার সাহস পাচ্ছি।

স্বাতি বলল: মিথ্যে কথা। ঠাকুরের জন্যে তুমি সিঁড়ি ভাঙছ না, সিঁড়ি ভাঙছ সিঁড়ি ভাঙবার জন্যেই।

বললুম: বেশ কথা তো!

স্বাতি বলল: বেশ কথা নয়, সত্যি কথা। কিন্তু আমি কেন উঠছি জান? আমি উঠছি একেবারে মাথায় উঠে ত্রিচি শহর দেখব বলে। নিচে থেকে মন্দির দেখেছি, এবারে মন্দিরে দাঁড়িয়ে নিচেটা দেখব।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়ল। বাইরে থেকে মানী লোক ত্রিচিতে এলে নাকি এখনও এই দুর্গ মন্দিরে সম্বর্ধনা সভা হয়। নিচের হাজার স্তম্ভের মণ্ডপটি এখন ভেঙে গেছে, কিন্তু উপরে যে শত স্তম্ভের মণ্ডপ আছে সেইখানেই সভা হয়। এ যে আকর্ষণীয় আয়োজন তাতে সন্দেহ নেই।

এক সময় আমরা মূল মন্দিরে এসে পৌঁছলুম। বাঁ হাতে মন্দির। কিন্তু দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি বললুমঃ এই বন্ধ দরজার সামনেই মামাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করা যাক।

স্বাতি বললঃ তার চেয়ে ঘুরে ফিরে সব দেখি এস। কতক্ষণে উঠবেন ওঁরা তার তো ঠিক নেই।

কিন্তু দেখব কী! সবই যে এখন বন্ধ!

স্বাতি বললঃ তায়ুমানবর মানে যে মা-ও হয়েছে। এই শিবের নাম কেন তায়ুমানবর হল, সেই কাহিনীটি নাকি মন্দিরের দেয়ালে আঁকা আছে। প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রত্নাবলী ভগবানকে ডাকছে আকুল হয়ে। কাবেরীর পরপারে তার মা থাকেন। তাঁকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। কখন তিনি আসবেন তারই অধীর প্রতীক্ষা। মা এলেন, সারা রাত সেবা যত্ন করে কন্যা ও নবজাতককে সুস্থ রেখে সকালে বিদায় নিলেন। খানিকক্ষণ পরে মা আবার ছুটে এলেন ঝড়ের মতো। আশ্চর্য হয়ে রত্নাবলী বলল, আবার ফিরলে কেন মা? মা বললেন, কাল সারা রাত কাবেরীর তীরে দাঁড়িয়ে কাটালাম, তুফানের জন্যে পার হতে পারলাম না নদী। মায়ের কথা শুনে রত্নাবলীর চোখে জলের ধারা নামল। বলল, তবে কি কাল রাতে শিব এসেছিলেন পার্বতীকে নিয়ে? তাই এখানে শিবের নাম তায়ুমানবর। নিষ্ঠার সঙ্গে লোকে এই গল্প আজও বিশ্বাস করে।

আমি বললুমঃ তোমার গাইড বইএ আমি শিবের নাম দেখেছি মাতৃ-ভূতেশ্বর।

স্বাতি বললঃ আমি একটা বাঙলা বইএ এই গল্প পড়েছি।

ব্রাহ্মণেরা ধরেছিলেন আমাদের, কিন্তু আমরা ধরা দিলুম না কিছুতেই। বললুমঃ পেছনে আসছেন মামা মামী। তাঁদের ধোরো ভাল করে ।

কিন্তু মামা-মামীর জন্যে আমার দুঃখ হল। এত সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন এত কষ্ট করে! আর শেষে বন্ধ দরজা দেখেই ফিরবেন! নিচে নামবার শক্তিটুকু তাঁদের থাকবে তো! বললুমঃ কলকাতার শেঠজী আসছেন মাইজীকে সঙ্গে করে। প্রচুর পয়সা ছড়াবেন এখানে।

উজ্জ্বল হল ব্রাহ্মণদেব চোখ, বললেনঃ তাই নাকি!

একজন ছুটে গেলেন ফটকের কাছে, বললেনঃ দেখি কী করা যায়!

উপরে উঠে মামী মেঝের উপরেই বসে পড়লেন। আর নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে মামা কোন রকমে শেষ সিঁড়িটা ভেঙে মণ্ডপে পা দিলেন।

স্বাতি বললঃ তোমরা বিশ্রাম কর মা, আমরা উপরে গিয়ে গণেশজীকে দেখে আসি।

প্রহরী বাধা দিল, বলল, এই বাক্সে কয়েকটা পয়সা ফেলতে হবে, তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।

ঝনাৎ করে দুটো আনি ফেলে দিয়ে তরতর করে আমরা উপরে উঠতে লাগলুম।

করুণ নয়নে তাকালেন মামা। নিজের যৌবনটি কি তাঁর মনে পড়ল!

স্বাতি বললঃ মন্দির যে দুপুরে বন্ধ হয়ে যায়, একথা আমাদের মনে থাকা উচিত ছিল।

অপরাধীর মতো আমি বললুমঃ সত্যি।

মামা ও মামীর জন্যে স্বাতি দুঃখ পেয়েছে জানি। তাইতেই এমনি করে পালিয়ে এল। বললঃ ব্রাহ্মণেরা কি মন্দির খুলে দেখাবে না?

পাহাড়ের গায়ে একটা গাছের ছায়ায় বসে ছিল ছবিওয়ালা। ত্রিচি আর শ্রীরঙ্গমের ফটো বিক্রি করছে, তাঞ্জোর আর মাদুরার ছবিও আছে কিছু। জিজ্ঞাসা করলঃ ছবি চাই না কিছু?

স্বাতি নিজের ক্যামেরাটা দেখিয়ে পেরিয়ে এল তাকে।

আর বেশিদূর উঠতে হল না। একটা বিরাট অখণ্ড পাথর চেঁচে-ছুলে ছোট ছোট ধাপ কেটে সোজা পৌঁছে দিয়েছে মন্দিরে।

উপরে উঠে স্বাতি বলল ঃ নামতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না গোপালদা। এমন মিষ্টি হাওয়া, এমন সুন্দর পরিবেশ।

আর এমন ভাল সঙ্গী!

দৃষ্টি দিয়ে স্বাতি আমাকে ভর্ৎসনা করল, কিন্তু তার প্রসন্ন হাসি হল না অন্তর্হিত।

সত্যিই অপূর্ব জায়গা। মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সারা ত্রিচিনপল্লী শহর দেখতে পাচ্ছি। এক দিকে কাবেরীব ক্ষীণ ধারা রূপোর হারের মতো চিক চিক করছে, অন্য দিকে জনবহুল শহর ঘন হয়ে আছে বিরাট বস্তির মতো।

স্বাতি বলল ঃ একবার প্লেনে চড়েছিলাম, তখন নিচের দেশটা দেখেছি ঠিক এই রকম।

এবার নামবার পালা। শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যখন ক্লান্তি এল স্বাতির, তখনই সে নামতে রাজী হল। বলল ঃ একটু সাবধানে নেমো গোপালদা, রাস্তাটা তেমন সুবিধের নয়। পাথরে পা হড়কে পড়লে প্রাণ যাবে না, কিন্তু চোট লাগবে বেজায়।

আমি নিঃশব্দে নামতে লাগলুম।

স্বাতি বলল ঃ ওই যে এক জোড়া পায়ের ছাপ দেখলাম, ওটা কি বিভীষণের? কোথায় যেন পড়েছিলাম সেই রকম।

বললুম ঃ মুসলমানেরা বলে, ও পীরের পা। মুহম্মদ আলি যখন আটক ছিলেন এইখানে, পীরেরা আসতেন তাঁকে দেখতে। তিনিই এক জোড়া পায়ের ছাপ যোগাড় করে রেখেছিলেন।

কথাটা স্বাতির বিশ্বাস হল না।

বললুম ঃ এ দেশে সরস্বতীর কোন কদর নেই দেখছি।

স্বাতি বলল ঃ কেন বল তো?

বললুম ঃ দেখলে না, এই পাহাড়ে শিব আছেন, দুর্গা আছেন, আছেন কার্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী। সরস্বতী তো দেখলুম না!

স্বাতি বলল ঃ সত্যিই তো!

বললুম ঃ চল, খোঁজ নেওয়া যাক কারও কাছে।

স্বাতির মুখ বড় করুণ দেখাল। বলল ঃ ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে গোপালদা, এখন লক্ষ্মীকেই বেশি ভাল লাগছে।

নামতে তেমন কষ্ট হল না। মামা মামীকে দেখতে পেলুম একেবারে নিচের দিকে। মামা বললেন ঃ প্রাণ নিয়ে যে নামতে পেরেছি, এই আমার ভাগ্যি গোপাল। আব কোনখানে নয়, এবাবে সোজা একটা হোটেলে চল।

ফেরার পথে দু ধারে চাইতে চাইতে ফিরলুম। কোন ভাল হোটেল চোখে পড়ল না। মামা বললেন ঃ স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমেই তাহলে চল।

স্টেশনে পৌঁছে মামা একখানা দশ আর একখানা পাঁচ টাকার নোট দিলেন ড্রাইভারকে। লোকটা পকেট হাতড়ে তিনটি টাকা ফেরত দিচ্ছিল। মামা বললেন ঃ ও তুমিই রাখ।

ড্রাইভারটি যেন গলে গেল, এমনি গদগদ ভাবে নমস্কার করল সবাইকে।

২৮

দুপুরের আহার সেরেই মামী একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন: গাড়িতে আমাব ঘুম হয় না, আমি একদণ্ড চোখ বুজে নিই।

মামা বললেন: এসব ব্যাপারে তোমার দণ্ড তো আবার দেবতাদের মতো! সন্ধ্যে পর্যন্ত তা হলে নির্বিবাদেই কাটবে।

আমি ও স্বাতি দুখানা চেয়ার দখল করেছিলুম। মামা খাটে বসে পাইপ ধরাচ্ছিলেন। স্বাতির হাসির উত্তরে বললেন: তোমরা ছেলেমানুষ, বসে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ঘেরেই কাটিয়ে দাও দুপুরটা।

আমাদের তাতে আপত্তি নেই।

মামাই আবার বললেন: বয়েস তো হয়েছে, একটু না গড়ালে কোমরের ব্যথা মরে না।

আমি বললুম: আমার আবার উল্টো। দুপুরে শুলেই সন্ধ্যেবেলায় গা ম্যাজম্যাজ করবে।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: সেদিন কি আমাদের ছিল না গোপাল! আমরাও এক সময় তোমাদের মতো হালকা ছিলুম।

পাইপ মুখে মামার গল্প করতে ভাল লাগে। খানিকক্ষণ গভীর ভাবে ধোঁয়া টানবার পরে বললেন: কোথাও পড়েছিলুম কিংবা কারও কাছে কোথাও শুনেছি, দক্ষিণের বৈষ্ণবরা সব রামানুজ-সম্প্রদায়ের, আর এই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরই ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। কিন্তু এত বড় মন্দিরের ভেতর তাঁর কোন মূর্তি বা সমাধি দেখলুম না তো!

বললুম: নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিন্তু ভাগ্যে জুটল অরুণাচলের পাণ্ডা। সে নিজেই জানে না ত্রিচির খবর।

স্বাতি বলল : বৈষ্ণবদেরও কি আবার সম্প্রদায় আছে! তারাই তো হিন্দুর একটা সম্প্রদায়।

বললুম : কেন থাকবে না! খ্রীষ্টানের সম্প্রদায় আছে, মুসলমানের সম্প্রদায় আছে, বৌদ্ধদের আছে, আর বৈষ্ণবদের থাকবে না! সম্প্রদায়ের সম্প্রদায় না থাকলে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বাড়বে কী করে! তবে মজার কথা কী জান? দক্ষিণ দেশে যে সব আচার্য জন্মালেন, তাঁদের মধ্যে এক রামানুজ ছাড়া আর কেউ এ দেশে ধোপে টিকলেন না। তাঁরা কলকে পেলেন গৌড়ে আর ব্রজধামে।

মামা কৌতূহলী হয়ে বললেন : তার মানে?

আমি একটু নড়ে-চড়ে আমার জ্ঞানের পরিচয় দিতে বসলুম।

ভারতবর্ষে বৈষ্ণবদের চারটি সম্প্রদায় আছে বলে আমি জানি। প্রথম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়, প্রাচীন নাম চতুঃসন বা ঋষি সম্প্রদায়। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক সনঙ্গ সনাতন ও সনৎকুমার এদের আদি আচার্য। দ্বিতীয় রামানুজ বা আচারী সম্প্রদায়, প্রাচীন নাম শ্রী সম্প্রদায়। এরই এক শাখা অযোধ্যায় রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এঁরা সীতারামের উপাসনা করেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ের নাম মাধ্বী সম্প্রদায়, প্রাচীন নাম ব্রহ্ম সম্প্রদায়। আর চতুর্থ হচ্ছে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়, প্রাচীন নাম রুদ্র সম্প্রদায়। বিষ্ণুস্বামীর কথা আজকাল আর জানা যায় না, আচার্য বল্লভের নামেই এর খ্যাতি।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে এই চারজন আচার্যই দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। নিম্বার্কাচার্যের জন্ম হয়েছিল তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ-কুলে। তাঁর জন্মের সন তারিখ নিয়েই একটু গণ্ডগোল। ডক্টর ভাণ্ডারকার বলেন যে নিম্বার্কভাষ্য শঙ্করভাষ্যের পরবর্তী। কিন্তু এ কথা সকলে মানেন না। যে যুগে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা শিষ্যদের অধিকারভেদে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন, আর শিষ্যেরাও গুরুদত্ত উপদেশ শাস্ত্রসম্মত ও অভ্রান্ত বলে মেনে নিতেন, সেই বিশ্বাসের যুগেই আচার্য নিম্বার্ক ও তাঁর শিষ্য শ্রীনিবাস উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রকাশ করেন। দক্ষিণে এঁর সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করে নি। এঁর প্রধান কেন্দ্র আজ ব্রজমণ্ডল।

বাঙলা দেশেও যে এঁর প্রভাব ছিল তার সাক্ষী ভক্তকবি জয়দেব নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য বলে তাঁকে আমরা চিনি না, তাঁর গীতগোবিন্দ আমাদের হৃদয় জয় করে আছে।

পরবর্তী কালে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যখন ভারতবর্ষ অবিশ্বাস আর নাস্তিকতায় ভরে গেল, সেই অবিশ্বাসের যুগে শঙ্করের আবির্ভাব। প্রচুর যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দ্বৈতাদ্বৈতবাদেব পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল সেই অনাচারের যুগে।

স্বাতি বাধা দিল, বলল: আমি এই বাদানুবাদের নামই শুনেছি গোপালদা, কিন্তু মানে বোঝবার চেষ্টা করি নি কোন দিন। এ আলোচনা কখনও উঠলে আমি ভাবতুম—ওই রে দাদা, অঙ্ক শেখাচ্ছে বুঝি! আজ মনে হচ্ছে বোধহয় ভুলই করেছি এত দিন।

বললুম: তাই হয়। জলে লাফাবাব মাচাটার ওপর দাঁড়িয়ে নিচের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহস আসে দেরিতে। কিন্তু একবার কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে বাবে বাবে লাফাতে ইচ্ছে করবে।

স্বাতি বলল: চেষ্টা করলে কি কিছু বুঝব না আমি?

বললুম: চেষ্টার অসাধ্য তো কিছু নেই। দার্শনিক না হলেও দর্শনের ভূমিকাটুকু তো জানা যাবে! যেমন গল্প লেখেন একজন, আর পড়ে আনন্দ পান অনেকে। কেউ যদি ভাবেন যে গল্প লিখতে যখন পারি নে তখন গল্প পড়বও না, তা হলে তিনি ভুলই করবেন।

স্বাতি মেনে নিল আমার কথা, আব আমি চেষ্টা করলুম সোজা কথায় শঙ্করের মত বোঝাবার।—

এই সমস্ত আচার্যের দার্শনিক মতবাদ ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ বর্ণনা নয়, দেশকালোপযোগী সাধনার প্রণালী মাত্র। শঙ্কর বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন, আর জগৎ সম্বন্ধে লৌকিক সংস্কার মিথ্যা। জাগতিক ভেদানুভূতি বর্জিত অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—এই ধ্যান আমাদের ভেদ সংস্কার আর দেহাত্মবুদ্ধি দূর করে সত্যস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মানুভূতির জাগরণ আনবে। এই তাঁর মায়াবাদ। সাধনার এই প্রণালী যে উৎকৃষ্ট তাতে

সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ লোকে ভাবল যে জীব মাত্রেই পূর্ণ ব্রহ্ম আর জগৎ একান্ত মিথ্যা। শঙ্করের মায়াবাদে ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তির নিত্যত্বের স্বীকার ছিল, আর দ্বৈত ভাবে ভগবানের উপাসনারও ব্যবস্থা ছিল।

রামানুজ এই শঙ্কর-মতাশ্রিত ভ্রান্ত মানুষের নাস্তিকতা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। আর এই অনর্থ দূর করবার জন্যই তাঁর বিশেষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করলেন। এই হল সাধারণ মানুষের উপযোগী বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার। রামানুজ কাশ্মীরের সারদা পীঠে অলৌকিক ভাবে ব্রহ্মসূত্রের বোধায়নবৃত্তি পেয়েছিলেন। সারদা পীঠের পণ্ডিতরা জোর করে এ বই কেড়ে নিলেন। শিষ্য কুরেশ স্বামী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। তিনি সেই বৃত্তি কণ্ঠস্থ করে আবার লিখে ফেললেন। এই হল শ্রীভাষ্যের রচনা কাহিনী।

রামানুজ ষোল বছর বয়সে বিবাহ করেন। কিন্তু পারিবারিক জীবনে শান্তি না পেয়ে স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নানা বিপদ আপদের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে। তাঁর বেদান্ত শিক্ষার গুরু যাদবপ্রকাশ ঈর্ষা বশত তাঁকে তীর্থ যাত্রার পথে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। রামানুজ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। শ্রীরঙ্গমে যখন তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করছিলেন তখন ত্রিচিনপল্লীর চোল শাসনকর্তাও তাঁকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে রামানুজ শ্রীরঙ্গম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন যাদবপুরীতে। জৈন রাজা বল্লাল তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রামানুজের সম্বন্ধে অনেক দৈব গল্প প্রচলিত আছে। কাঞ্চীপুরমে তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়, নানা তীর্থ তিনি পর্যটন করেন। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন দীর্ঘকাল এবং একশো কুড়ি বছর বয়সে সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। সে প্রায় সাড়ে আটশো বছর আগের কথা।

ভারতের ধর্মজীবনে রামানুজের দানের কোন হিসাব হয় না। তিনি বলেছিলেন, ঈশ্বর তর্কের জিনিস নন, তিনি মর্মের। বুদ্ধি দিয়ে তাঁর দর্শন নেই, হৃদয় দিয়ে তাঁর উপলব্ধি। ভক্তি ও প্রেম দিয়ে তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা করতে হয়। হে শরণ্য, আমি অবিচল ও অনন্যগতি হয়ে তোমার পাদমূলে শরণ নিচ্ছি।

মাধ্বাচার্যের জন্ম দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালাবার উপকূলে উডুপি থেকে মাইল ছয়েক দূরে বেলিগ্রামে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি অচ্যুতপ্রকাশ নামে এক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে দেখেন যে এই অদ্বৈতবাদের দুর্বোধ্য তত্ত্বালোচনা সাধারণের উপযোগী নয়। বয়স্ক লোক এতে কাজ ও উপাসনা ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। অদ্বৈত তত্ত্ব ভগবৎ প্রেমের চরম পরিণতির স্বাভাবিক ফল। কাজেই ভক্তিমার্গে এ আলোচনার প্রয়োজন কম। তিনি বিশ্বাস করলেন যে সাধারণের সাধনার জন্যে দ্বৈতবাদই উৎকৃষ্ট, আর শ্রুতি-স্মৃতির চেয়ে পুবাণের প্রয়োজনই বেশি।

রামানুজের বৈষ্ণব ধর্মে ধার ছিল না, মাধ্বাচার্য সেই ধার আনলেন তাঁর দ্বৈত মতে। আমাদের গৌরাঙ্গদেবের জীবনে এই মাধ্বাচার্যের প্রভাব স্পষ্ট। শঙ্করকে তিনি নাস্তিক বলেছিলেন আর বলেছিলেন জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।

আচার্য বল্লভের জন্ম ষোড়শ শতাব্দীতে তৈলঙ্গ দেশে। ইনি বাস করতেন মথুবার কাছে গোকুলে, বৈঠক বা মঠ স্থাপন করেন মথুরা আর উজ্জয়িনীতে, আর দেহরক্ষা করেন কাশীধামে। লোকে বলে, ইনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান আর কাশীর হনুমানঘাটে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

আচার্য বল্লভ তাঁর অনুভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁর উপাসনার প্রণালীর নাম পুষ্টিমার্গ। এর নতুনত্ব এই যে ভগবানের উপাসনার জন্যে উপবাস বা কোন শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের দরকার নেই। ভোগবিলাস আর ভগবানের সেবা একই সঙ্গে চলতে পারে।

এই আলোচনাটুকু ভাল লাগল মামার। বললেনঃ গোপাল, তোমাকে তো আমি নাস্তিক বলেই জানতুম। মন্দিরে ঢুকে একবার হাত দুটো জুড়লে না দেবতার সামনে, তুমি এত কথা জানলে কোথা থেকে?

এ কথার উত্তর নেই? ধর্মে জ্ঞান ও অন্ধ বিশ্বাস তো এক কথা নয়। ধর্ম সম্বন্ধে কিছু না জেনে যেমন লোক নাস্তিক হয়, তেমনি ভাল করে জেনেও তো লোকে তা প্রত্যাখ্যান করে। আর সত্যিকার নাস্তিক কে? ধর্মাচরণ না করলেই কি সে নাস্তিক?

মামা মুখের দিকে চেয়ে আছেন দেখে বললুম ঃ কলেজে ইতিহাসের সঙ্গে দর্শনও পড়েছিলুম।

স্বাতি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল ঃ আজ আমার একটা ভয় দূর হল। এবারে দেশে ফিরে আমিও কিছু পড়ব।

আমি বললুম ঃ বড় বড় বইএ হাত দিয়ে পিছিয়ে এস না। বিশ্ব-ভারতীর চটি বইএ সাদা কথায় অল্পে যা লেখা আছে, সেই আমাদের জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট।

মামার তামাক কখন শেষ হয়েছিল টের পান নি। বার কয়েক টেনে নিরাশ হয়ে ঝেড়ে ফেললেন। চোখের পাতা ভারী হয়েছিল তাঁর, বললেন ঃ এইবারে একটু গড়িয়ে নিই।

স্বাতি বলল ঃ ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দাও বাবা, আমরা নিশ্চিন্ত মনে প্ল্যাটফর্মে একটু ঘুরে বেড়াই। নতুন জায়গা, তোমাদের ঘুমোতে দেখে বাক্স-বিছানাই হয়তো কেউ টেনে নিয়ে যাবে।

মামা উঠে দাঁড়ালেন।

আমরা বেরিয়ে এলুম।

২৮

বাইরে এসে স্বাতি বলল : এখন কোথায় যাওয়া যায় বল তো গোপালদা ?

বললুম : স্টেশনের বাইরে যাওয়া যাবে না। আকাশ থেকে এখন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে।

নতুন স্টেশন, নতুন ধবনে তৈরি। সামনে অনেকখানি জায়গা বাঁধানো। আর বাঁ হাতে বেলওয়ের বিরাট অফিস। ভিতরের বাগানটিও বেশ মানিয়ে করেছে। রৌদ্রে ও পরিচ্ছন্নতায় চারি দিক ঝকঝক করছে।

ক্লোক রুম ডিঙিয়ে আমবা ফলেব দোকানগুলো পরীক্ষা করলুম। কলা আব মোসাম্বি আছে, আছে কোডাইকানালেব কমলালেবু। আঙুরের থোকা দেখেই সন্দেহ হচ্ছিল যে ভীষণ টক হবে। অসময়ের আমও আছে কিছু। লোকটা শপথ নিয়ে বলল, মিষ্টি না হলে ফেরত দেবে পয়সা। স্বাতি বলল : মাকে এ খববটা দিতে হবে।

আমরা আবার ভিতরে চলে এলুম। টিকিট-কালেক্টরটিও বুঝি আমাদের চিনে ফেলেছে। আমাদের আগেব লোকটির কাছে টিকিট চাইল আর আমাদের পথ ছেড়ে দিল নির্বিবাদে।

আমরা হিগিনবথামেব বইএর দোকান খানাতল্লাশি শুরু করলুম। স্বাতি চাইল, দক্ষিণ ভারতের উপব লেখা বই। এরা কি খদ্দের দেখলেই চিনতে পারে! নির্বিকার ভাবে বলল, এ সব বই তারা রাখে না।

প্ল্যাটফর্মের শেষ পর্যন্ত আমরা এগিয়ে গেলুম। সেইখানেই আমিষ ভোজনালয়। স্টেশনের নাম লেখা হলদে বোর্ড দেখে স্বাতি বলল : স্টেশনের নামের ওপর আলকাতরা মাখিয়েছে কেন গোপালদা ?

ঘটনাটা আমি শুনেছিলুম, বললুম : কর্তৃপক্ষ হিন্দীতে স্টেশনের নাম লিখবে জোর করে, আর বাইরের লোকেরা কিছুতেই তা দেবে না।

কেন?

মাতৃভাষার লাঞ্ছনা তারা সইবে কেন?

স্বাতি বলল: সত্যিই তো।

ফেরার পথে আমি বললুম: চল, একবার তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং হলটা দেখে আসি।

স্বাতি বলল: বড় নোঙরা ও-ধারটা।

হেসে বললুম: সভ্য হয়ে আমরা দেশকে ঘৃণা করতেই তো শিখলুম!

দেশকে কোথায় ঘৃণা করেছি, নোঙরাকে নোঙরা বলব না!

আমি হেসে বললুম: চল, তা হলে প্রথম শ্রেণীর দিকেই যাই।

কোন কাজ আছে নাকি?

দেখি, কোন বন্ধুব দেখা পাই কি না!

এখানে তোমার আরও বন্ধু আছে?

সকৌতুকে বললুম: এক আধ জন!

মৈত্র আর হালদার, দীক্ষিত আব জোগলেকর, ড্যানিয়েল আর সুব্রহ্মণ্য!

ড্যানিয়েলের নামে স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল: জান গোপালদা, আমার তখন মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক নিতান্ত অপমান বোধ করে নেমে গেছেন। ড্যানিয়েল বাঙলা বোঝেন না তো!

বললুম: বিচিত্র নয়। এ দেশের লোকেরা এমনি সাদাসিধে যে কে রাজা আর কে উর্জার, তা বোঝবার কোন উপায নেই। সেদিন দেখনি, সাদা লুঙ্গির ওপর ছিটের শার্ট আব টাই বেঁধে চটি পায়ে চলে-ছিল অফিস করতে। এদের কে কেরানী আর কে সাহেব বলতে পার?

স্বাতি প্রাণ ভরে আবাব হাসল সেই অদ্ভুত পোশাকের কথা স্মরণ করে। তারপরেই বলল: আচ্ছা গোপালদা, সেই ভদ্রলোকের খোঁজ নেওয়া যায় না?

বললুম: খোঁজ আর নিই কী করে! একজন পদস্থ কর্মচারীর বড় ভাই, এইটুকুই তো বলেছিলেন।

স্বাতি বলল ঃ সেই পদস্থ কর্মচারীর নামও নিশ্চয়ই ড্যানিয়েল হবে। একটা টেলিফোন করা যায় না স্টেশন থেকে ?

যদি পাওয়া যায় তো কী বলবে ?

সেইটেই মুশকিল। আবার ডেকেছি দেখলে মা মেরে ফেলবেন।

বললুম ঃ এক কাজ করব টেলিফোন ছেড়ে দেব সঙ্গে সঙ্গে।

উৎসাহ পেয়ে স্বাতি বলল ঃ সেই ভাল।

এন্‌কোয়ারি অফিস থেকে খুব সহজেই ড্যানিয়েলকে পাওয়া গেল, তারা সবাই তাঁকে চেনে। ছোট ভাইএর সঙ্গে কথা কইতে হল তাঁর অফিসে। দাদার সম্বন্ধে কোন কথার জবাব দেবার আগেই আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বললুম ঃ আমি তাঁর বন্ধু, তবে আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আজ হঠাৎ এখানে এসেছেন শুনে তিনি এখনও আছেন কি না তাই জানতে চাইছি।

ভদ্রলোক দুঃখ করে বললেন ঃ না, তিনি বারোটার গাড়িতেই ফিরে গেছেন। কাল নাকি তাঁর একটা জরুরি কাজ আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ হঠাৎ এখানে এসেছিলেন কেন জানেন কি ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ সেইটেই কেমন রহস্য মনে হল। বললেন, এক বাঙালী পরিবাব ত্রিচি বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের দেখাশুনো ও থাকবার একটা ব্যবস্থা কবে দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

বললুম ঃ তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ আছে বইকি। দাদার স্বভাব তো এই নয় যে দেখাশুনো আর থাকবার ব্যবস্থা করেই ফিরে যাবেন। নিজের সমস্ত কাজকর্ম ফেলে তাঁদের সব-কিছু করতে না পেলে যে তাঁর আনন্দ হয় না। হয়তো আরও দুটো স্টেশন এগিয়ে দিয়ে আসতেন, আর সত্যিই তো, অমোদের মতো তো গোলাম নন, পয়সারও তাঁর অভাব নেই। কেন করবেন না !

আর শুনতে ইচ্ছে হল না। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সেখানেই একটা টুলে বসে পড়লুম। স্বাতি বলল ঃ কী হল গোপালদা ?

নিজেকে সামলাতে একটু সময় লাগল, বললুম ঃ চল, বলছি।

স্বাতিও আঘাত পেল আমারই মতন।

এন্‌কোয়ারি অফিস থেকে বেরবার' সময় বললুম: চল, এইবার সুব্রহ্মণ্যকে খুঁজি। সে লোকটা আবার ফিরে না যায়!

ওয়েটিং রুমে তাঁর সাক্ষাৎ পেলুম। ভদ্রলোক একটা চেয়ারে মাথা রেখে ঝিমচ্ছিলেন। আমার সাড়া পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। নমস্কার করে বললেন: এই যে, আপনারা ফিরেছেন দেখছি!

আমরাও নমস্কার করলুম।

বসবার জায়গা করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের ভারি কষ্ট হল দেখছি, একখানা মাত্র ঘর পেয়েছেন। একটু গড়িয়ে নেবেন কি ওই ডিভানটায়? বলব ওঁকে ছেড়ে দিতে?

বললুম: না না, দিব্বি ঘুমচ্ছেন ভদ্রলোক, কেন ওঁকে উঠতে বলবেন?

সুব্রহ্মণ্য বললেন: তাতে কী হয়েছে! আপনাদের দরকার যে আরও বেশি। এ কথা সকলের বোঝা উচিত।

ততক্ষণে আমরা বসে পড়েছি। স্বাতির সঙ্গে সুব্রহ্মণ্যের পরিচয় করিয়ে দিলুম। সুব্রহ্মণ্য বললেন: আপনার যে বোন তা চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। বেশ মিল আছে তুজনের চেহারায়।

স্বাতি রুষ্ট ভাবে তাকাল আমার দিকে। ভাবখানা এই যে আমার চেহারার সঙ্গে মিল থাকলে তার রূপের প্রশংসা করা হয় কি!

সুব্রহ্মণ্য এবারে নিজের কথা কইলেন, বললেন: তীর্থযাত্রীর মুখ দেখেছি ভোর বেলায়, তু দণ্ডে আমাব কাজটা হয়ে গেল। ভাবলুম, ফিরে যাই দিনে দিনেই। তার পরেই আপনার কথা মনে এল। আমায় খুঁজে না পেয়ে কী ভাববেন আমার সম্বন্ধে! ছি ছি!

বললুম: বড় অত্যাচার হল তো আপনার ওপর!

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের ফুরসত আছে তো এখন? তা হলে চলুন না একটু কফি খাওয়া যাক।

স্বাতি একটু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। সুব্রহ্মণ্য বললেন: কফি

খুব ভাল জিনিস। আপনাদের দেশে ভাল তৈরি হয় না বলে আপনারা চা বেশি ভালবাসেন। আমাদের দেশে ভাল চা-ও হয়। তবু আমরা কফি পেলে অন্য কিছুই খেতে চাই নে।

ভদ্রলোক জোর করেই স্টেশনের রেস্তোরাঁয় আনলেন। বেয়ারাকে ডেকে নিজের ভাষায় বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে উপদেশ দিলেন। বেয়ারাটা অদ্ভুত ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল, কাঁধের এ পাশ থেকে আর এক পাশ সমস্ত মুণ্ডুটা, আমাদের মতো শুধু মুখটুকু উঁচু-নিচু বা এপাশ-ওপাশ নয় অল্প-স্বল্প। এ যেন কীর্তনের সময় সমস্ত শরীর দুলিয়ে মাথা নাড়া। এর মানে হল, বুঝতে পেরেছে। পরে এটি ভাল করে লক্ষ্য করে শিখে নিয়েছিলুম।

সুব্রহ্মণ্য বললেন ঃ গাড়িতে আপনি ভারতীর নাম করতেই বুঝেছি যে আপনি সত্যিকারের রসবেত্তা।

স্বাতিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ইনি তামিল সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিলেন, তখন সময় ছিল না বলে বলতে পারি নি।

স্বাতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। ভাবখানা এই রকম যে এঁদের কাছে জেনে শুনে আমি চাল দিচ্ছি তাদের কাছে।

সুব্রহ্মণ্য বললেন ঃ সব চেয়ে আমার কাছে যা আশ্চর্য লাগে তা হয়তো আপনাদের কাছেও লাগবে। তামিল পৃথিবীর একটি প্রাচীন ভাষা। কিন্তু এ ভাষাটি যেন অমর। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কোন একটি ভাষা বেশিদিন বাঁচে না। পাশ্চাত্ত্যের লাটিন আর ভারতবর্ষের সংস্কৃত—এদের মতো সমৃদ্ধ আর বনেদী ভাষা এক সময় ছিল না। কিন্তু তাও তো মরে গেল। মানুষ যেমন সন্তান-সন্ততি রেখে মরে, ভাষাও তেমনি। সংস্কৃত নিজে মরে গেছে, কিন্তু উত্তর-ভারতের সংস্কৃতানুগ নানা ভাষার মধ্যে সেই মরা প্রাণটুকু তার এখনও ধুকধুক করছে। আপনারা সংস্কৃত পড়েন সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের রস সংগ্রহের জন্যে। তামিল ভাষার জন্মের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে বিবরণ আমরা আজ পাই, তাতেও দেখি সেই তামিল ভাষা, আর সেই তামিল বর্ণমালা। আর্য-

সভ্যতা এল দক্ষিণে, আমরা তা আত্মসাৎ করলুম। নানা ধর্ম ও কৃষ্টির সংবাদ এল এখানে. আমরা সবই গ্রহণ করলুম নিজের মতো করে। আমাদের রক্ষণশী বলে বিদ্রূপ করতে পারেন, কিন্তু উদার নই বলে ঘৃণা করতে পারবেন । আপনাদের প্রাচীন সাহিত্য বলতে কিছু নেই, কেন না সে সময় ভাষার অন্য নাম ছিল। কিন্তু আমাদের তা আছে। কাম্বারামায়ণম বাল্মীকি রামায়ণের মতো প্রাচীন না হলেও তাকে পৌরাণিক যুগের বলেই আমাদেব মনে হয়। তিরুক্কুরল, সিলপ্পতিকারমও কম প্রাচীন নয়।

আধুনিক যুগের সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে আপনি জানেন। তাঁকে আমরা আপনাদের রবীন্দ্রনাথের মতো কিংবা তাঁর চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করি। তিনি তো শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। মুক্তির সংগ্রামে তিনি জনগণকে জাগ্রত করেছিলেন। বাঙলায় যখন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন, ভারতী তখন তামিল সাহিত্যে আলোড়ন এনেছেন। সারা দেশ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। কিন্তু দুঃখ হয় কেন জানেন? ভারতীকে সেদিন আমরা চিনতে পারি নি। আজ তাঁব মৃত্যুর পরে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করছি। এত্তিয়াপুরমে তাঁর স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হয়েছে, আর তাঁর জন্মদিন আজ জাতীয় উৎসবের দিন। আজ কেন তাঁকে আমাদের জাতীয় কবি বলি জানেন? তামিলনাদ ধর্ম আর দেবতার নামে চিরকালই অন্ধ। ভারতীর লেখাতেই আমরা প্রথম জানলুম যে ধর্মের চেয়েও যা বড় তা হল দেশপ্রেম, আর মানুষও যোগ্য হতে পারে দেবতার আসনে বসবার। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা কী জানেন? ভারতী বেঁচেছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর।

বেয়ারার ট্রেতে কফি এল। সুব্রহ্মণ্য বিমর্ষ হয়েছিলেন, সামলে নিয়ে বললেন: দিন, আমি আপনাদের কফি ঢেলে দিই।

ভদ্রলোকের নিজের বয়সও বেশি নয়। তবে দেহটা ক্ষীণ, আর চোখে পুরু কাচের চশমা। হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন: জানেন, আমার স্ত্রীর বড় দুঃখ যে আমি ভালবাসি শুধু দুটি জিনিস। প্রথম ভারতীর কবিতা আর দ্বিতীয় ভাল কফি। এ দুটোর কোন একটার

মতো যদি ভালবাসতুম ওকালতিকে, তা হলে সংসারে লক্ষ্মী আসতেন অনেক আগে।

প্রথমে স্বাতিকে এক পেয়ালা কফি এগিয়ে দিলেন, তারপর আমাকে দিয়ে নিজে নিলেন। বললেনঃ ভারতীর পাঞ্চালীশপথম পড়েছেন বললেন, আর কোন অনুবাদ পড়েন নি তাঁর ?

খানিকটা ভেবে বললুমঃ চরকা নামে একটা কবিতার অনুবাদ পড়েছিলুম। কিন্তু সেটি কি ভারতীর লেখা ?

সুব্রহ্মণ্য বললেনঃ খুব জনপ্রিয় কবিতা সেটা, কিন্তু ভারতীর লেখা নয়। মাদ্রাজের রাজকবি রামলিঙ্গম পিল্লেইএর লেখা। সঙ্গীত-ধর্ম ও কল্পনা-বিলাসের জন্য রামলিঙ্গম জনপ্রিয। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কবি দেশিকবিনায়কম পিল্লেই শক্তিশালী ও সত্যিকার ক্ল্যাসিকাল-রুচিসম্পন্ন। রাজকবি হবার সম্মান ইনি গ্রহণ করেন নি। আধুনিক যুগে আরও কবি আছেন—ভারতী দাসন, কম্ব দাসন, কোথমঙ্গলম সুব্ব—

এতক্ষণ চামচে দিয়ে কফি ঘাঁটছিলেন, এবারে একটা চুমুক দিযে বললেনঃ এঃ, টিনের কফিই চালিয়েছে ! বললুম তাজা কফি দিতে, শুধু ঘাড় নেড়েই গেল !

স্বাতি বললঃ বেশ তো লাগছে এই কফিটা !

সুব্রহ্মণ্য খুশী হয়ে বললেনঃ আমার নিজের বাড়ির কফি খাওয়াতে পারলে সত্যিই খুশী হতুম। আমরা ফল কিনে বাড়িতে গুঁড়িয়ে নিই। তার স্বাদই আলাদা।

তারপর বললেনঃ নাট্য সাহিত্যে আমাদের সত্যিকার দুর্বলতা। দেবদেবীর মহিমাকীর্তন আর ভাঁড়ামি ছাড়া সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে আমরা আজও শিখি নি। আর এইজন্যেই বোধ হয় অনুবাদ সাহিত্য এত সমৃদ্ধ। সকল দেশের ধর্মগ্রন্থ ও ক্ল্যাসিক রচনা, এমন কি এ যুগের আধুনিকতম লেখাকেও আমরা অনুবাদ করে ফেলেছি।

কথাসাহিত্য আমার ভাল লাগে। বললুমঃ কল্কি নামে এক সাহিত্যিকের নাম শুনেছি।

কথাটা লুফে নিয়ে ভদ্রলোক বললেনঃ শুনেছেন তো ! কৃষ্ণমূর্তি

এঁর আসল নাম। আধুনিক কালের ইনিই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। সহানুভূতির গভীরতায় ভাব ও বিষয়ের বৈচিত্র্যে আর নির্মল হাস্যরসে এঁর উপন্যাস আর ছোটগল্পগুলি মনোরম। ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা তাঁর রচনাগুলির একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তামিল সাহিত্যে ভারতীর পূর্বেই কথাসাহিত্যের শুরু হয়। রাজম আইয়ারের কমলম্বল চরিত্রম লোকে আজও পড়ছে। রোমান্টিক উপন্যাস-লেখক কুপ্পুস্বামী মুদালিয়রের দিন এখন ফুরিয়ে গেছে। রঙ্গরাজু প্রথম চরিত্র সৃষ্টি করেন, আর উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব আনেন শ্রীমতী কোথা নায়কা। নির্যাতিতেরা প্রাণ পেল শঙ্কররামের কলমে আর এস. ভি. ভি. নাম কিনলেন তাঁর রিয়ালিজম আব টেকনিকের গুণে। এ যুগে লেখক কি কম? করুণানিধি, আন্নাথুবাই, রামাইয়া, বালকৃষ্ণন, মহাদেবন—

আমাদের কফি খাওয়া শেষ হয়েছিল, আর এক পেয়ালা নিতে আমরা রাজী হলুম না। সুব্রহ্মণ্য নিজে নিলেন, তাবপর ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই বললেন: সোয়া চারটে এখন। রাত্রি দশটায় যে গাড়িটা পৌঁছয় চিদম্বরমে সেটা তো সাড়ে চারটের পরে ছাড়ে শুনেছি।

হাঁকলেন: বেযারা!

ঘন ঘন কফিতে চুমুক দিলেন কয়েকটা।

বেয়ারা কাছেই কোথাও বিল নিয়ে লুকিয়ে ছিল, সাড়া পেতেই সামনে আনল বিলটা। ভদ্রলোক পয়সা বার করতে পকেটে হাত দিলেন।

আমি বিলটা নেবার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক গভীর ভাবে বললেন: তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পাব। আমি আপনাদের ডেকে এনেছি কিনা!

আমি নিরস্ত হলুম।

ভদ্রলোক পয়সা দিয়ে বললেন: আমাদের গল্প তো ফুরিয়েছে, শুধু শুধু আপনাদের বসিয়ে রেখে আর লাভ কী! আপনারা শহরটা ঘুরে দেখুন, আমিও ফিরে যাই।

আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। ভদ্রলোক বললেন: ওয়েটিং রুমে আমার অ্যাটাচি কেস আর বিছানা আছে, সেটা তুলে নিতে হবে।

বললুম : চলুন, আপনাকে গাড়িতে পৌঁছে দিই।

বেয়ারা চেঞ্জ এনেছিল। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে তার কিছু তুলে নিয়ে বললেন : দেবেন পৌঁছে ?

যেন খুশী হলেন একটা মস্ত কিছু পাওয়ার মতো।

ওয়েটিং রুমে আসবার পথে ভদ্রলোক বললেন : আমাদের তামিলনাদে সাহিত্যপত্রের প্রচার খুব বেশি। জেমিনির ভাসানের নাম শুনেছেন কি ? আনন্দ বিকটন নামে তাঁর একটা পত্রিকা আছে, মহাদেবন এই কাগজটি এক রকম সম্পাদনাই করেন। কল্কিরও কল্কি নামে একখানা কাগজ আছে। এই দুখানি কাগজের কাটতি প্রায় এক এক লক্ষ। এ ছাড়াও প্রায় শ পাঁচেক সাময়িক পত্র আছে।

স্বাতিই শুধু আশ্চর্য হল না, আমিও হলুম। বাঙলায় একখানা কাগজ চালানো কী শক্ত কাজ, তা পাঠকেরাও জানেন। বিচিত্রার মতো ভাল কাগজও উঠে গেল।

সুব্রহ্মণ্য বললেন : আমাদের এক বন্ধু গিয়েছিল কলকাতায়, ফিরে এসে বলল যে সেখানকার খবরের কাগজে শুধু খবরই থাকে, কাগজের হেডলাইনগুলো পড়েই তা ফেলে দিতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম : আপনাদের কাগজে খবর ছাড়াও আরও কিছু থাকে নাকি ?

সুব্রহ্মণ্য বললেন : থাকবে না! প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস সবই তো সংবাদপত্রে থাকবে। সংবাদপত্র কি শুধু সংবাদ আর বিজ্ঞাপন পড়বার জন্যে ?

সাড়ে চারটের পরে ছাড়ল সুব্রহ্মণ্যের গাড়ি। সরু পাট-করা গলার চাদরখানা দু হাতে টেনে হাত জুড়ে নমস্কার করতে করতে ভদ্রলোক চলে গেলেন। কী সরল, কি বিনীত ভঙ্গিটি! আমরা তাঁর ভদ্রতার জবাব দিতে পারলুম না। বাঙলা দেশে আমরা পাঁচজনের কাজের সমালোচনা করতে শিখেছি, শিখি নি শুধু শেখবার জিনিসটুকুই। দৃষ্টিতে আর হাসিতে যেন সুব্রহ্মণ্য আমাদের এই কথাটিই আজ মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন।

৩০

ধনুষ্কোডি প্যাসেঞ্জার আসে রাত সাড়ে নটার পরে। আমরা সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে জাঁকিয়ে বসলুম। মামী আর স্বাতি হোল্‌ডল আর বাক্স দখল করে বসে পড়লেন, মামা আর আমি পায়চারি করতে লাগলুম।

একটা থামের সঙ্গে দেখলুম, গোটাকয়েক কাঠের হাতল ঝুলছে। তাব নিচের দিকটা হাতের মুঠোর মতো ও তর্জনীটা বার করা। কখন এক সময় একটা হাতল কে যেন বার করে দিয়ে গেল। তাতে লেখা— ধনুষ্কোডি প্যাসেঞ্জার। মানেটা এই যে ধনুষ্কোডি প্যাসেঞ্জার আসবে যেদিকে আঙুলের সঙ্কেত। ঠিক এমনটি কোথাও দেখেছি কি না সহসা মনে পড়ল না।

ফলওয়ালা এল মামীব কাছে। এরা খদ্দের চেনে। ভিড়ের ভিতর ঠিক খদ্দেরটি কী করে চিনে বার করে, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। আমি কাছে যেতেই স্বাতি বলল : একবার ভুল করেছিল তো, এইবারে ঠিক লোককে পাকড়েছে। সেই আম দেখছ তো গোপালদা!

মামী টাকায় চারটে করে কিনলেন। টক হতে পারে বলে গোটা আষ্টেক নিলেন। পরে বলেছিলেন : ওর ঝুড়ি-শুদ্ধ কিনলেই ছিল ভাল। কলকাতায় সময়ের আমও এমন মিষ্টি হয় না।

তকমা-আঁটা টিকিট-কালেক্টার এল মামার কাছে। বলল : কিছু ব্যস্ত হবেন না আপনারা, খবর পেয়েছি যে গাড়িতে অনেক জায়গা আছে।

মামা তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেলেন। ফিরলেন হাসিমুখে। বললেন : তোমার টিকিটটা এবারে আগেভাগেই বদ' .তরে নিয়েছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

আমি কিছু বলবার অবকাশ পেলুম না। হুড়মুড় দুড়দাড় করে ট্রেণ এসে গেল।

জন কয়েক কালো কালো লোক অনেকক্ষণ থেকে ঘোরাফেরা করছিল আশেপাশে। কথা কয় নি, শুধু নজর রেখেছিল আমাদের উপরে। মামীও তাদের দেখছিলেন, আর সন্দেহ করছিলেন তাদের চলাফেরায়। চোর ছ্যাচড় নয় তো! যা দেশকাল, রাতে হামলা করাও বিচিত্র নয়।

গাড়িতে উঠে দেখলুম, এরাও নিঃশব্দে সাহায্য করছে কুলিদের। সমস্ত গোছগাছ করে দিয়ে যে যার মতো নেমে গেল। মামী এ সব ভাল চোখে দেখছিলেন না, বললেন: এবা এমন পেছু নিয়েছে কেন বল তো!

মামা বললেন: এরা কারা গোপাল?

বললুম: পাণ্ডা বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। স্বরূপটা পরে প্রকাশ করবে।

মামী বললেন: এ দেশেও পাণ্ডা আছে নাকি! কোথাও তো ছেঁকে ধরল না আজ অবধি!

মামা বললেন: কেন, মন্দির দেখাল কারা?

মামী আশ্চয হয়ে বললেন: ওরা পাণ্ডা বুঝি! টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করল না, নিজেদের মধ্যে গালমন্দ লড়াই ঝগড়া করল না, যা দিলে হাত পেতে খুশী হয়ে নিল, ও কেমন পাণ্ডা!

মামা বললেন: মন্দির কমিটি হযে ওদের ব্যবসা নষ্ট হয়েছে বোধ হয়। দুঃখ হয় ওদের দেখে। এমন ধর্মের দেশে দাপট নেই এতটুকু। গাইডের মতো মন্দির ঘুরিয়ে হাত পাতে ভিখিরীর মতো।

স্বাতি বলল: আমাদের দেশে ওদের ট্রেনিং নেওয়া দরকার।

মামী বললেন: কিন্তু তোমরা যাই বল গোপাল, আমার এমনিতেই গাড়িতে ঘুম হয় না, আজ আবার এই লক্ষ্মীছাড়াদের ভাবনা মাথায় ঢুকল।

বললুম: আপনি ভাববেন না মামীমা, আমি এদের খবর নিয়ে নিচ্ছি।

মামা বললেন: সময় তো আছে এখনও, তাই নিয়ে নাও।

গেকে, খবর নিয়ে জানলুম যে তারা রামেশ্বরের পাণ্ডার লোক। আমাদের

সব খবর তারা রাখে। আমরা বাঙালী এবং ধনুষ্কোডি যাচ্ছি প্রথমে। তাই বাঙালী পাণ্ডার লোকেরাই আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। বাঙালী পাণ্ডা মানে পাণ্ডাটি বাঙালী নন. বাঙালী যাত্রীর পাণ্ডা তিনি। তাঁর এক শো লোক যাত্রী ধরবার জন্য চারি দিকে ঘোরে। এরা মাইনে করা চাকর, জাতে সকলে ব্রাহ্মণও নয়। যাত্রীদের পাণ্ডার বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোলাই এদের কাজ। আরও অনেক পাণ্ডা আছেন রামেশ্বরে, তাঁদের মধ্যে জনা তিনেক এই রকম প্রতিপত্তিশালী। তাদেরও শ খানেক করে লোক আছে। কারও মাড়ওয়ারী যাত্রী, কারও পাঞ্জাবী বা মহারাষ্ট্রী। যাত্রী নিয়ে বিবাদ এদের কম। তাই বাঙালী জেনে একই পাণ্ডার অনেকগুলো লোক আমাদের পিছনে লেগেছে।

মামী আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু মামা খুশী হলেন না। বললেন ঃ এত দূর থেকে পেছু নিয়েছে, কড়ায় গণ্ডায় উসুল করবে তো!

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছাড়ল।

মামী তখন শোবার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন, বললেন ঃ শোবে না তোমরা?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম ঃ আজ একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটেছে।

কী?

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম ঃ স্বাতি আজ আমার উপরে খুব চটেছে। আমার চেহারা নিয়ে তো খুব ঠাট্টা করে, আজ আমার এক বন্ধু কী বলেছে জিজ্ঞেস করুন।

স্বাতি নিজেই জিজ্ঞাসা করল ঃ কী বলেছে?

বলেছে যে চেহারা দেখেই আমার বোন বলে চেনা যায়।

মামী হাসলেন আমার কথা শুনে। কিন্তু মামা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

আজকাল আমার কী হয়েছে জানি নে, শুলে ঘুমও যেমন তাড়াতাড়ি আসে, ভাঙেও তেমনি অন্ধকার থাকতে। রাতে উপরে উঠেই অকাতরে

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কে কখন ঘুমলেন টের পাই নি। জেগে দেখলুম যে সবাই তখনও গভীর ভাবে ঘুমচ্ছেন।

জানলার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। এ নিশ্চয়ই চাঁদের আলো নয়। গাড়ি একটা স্টেশনে থেমেছিল, ছাড়বার দোলাতেই বোধহয় ঘুম ভেঙেছিল। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে হাতঘড়িটা দেখলুম, মণ্ডপম ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

এ দিকের দৃশ্যটি শুনেছি অপরূপ। ইচ্ছে হল যে স্বাতিকে জাগিয়ে তা দেখতে বলি।

মামী গাড়িতে ঘুমতে পাবেন না বলেন, এখন দেখল্ম যে সবাব সঙ্গে তিনিও সমানে ঘুমচ্ছেন।

গাড়িটা একটা পুলের উপর উঠল কি! তেমনি শব্দ হচ্ছে যেন! কিন্তু লোহালক্কড় তো দেখতে পাচ্ছি নে। এই তো, দু ধারে অনন্ত জলরাশি দেখা যাচ্ছে। এ জলের কূল কিনারা কি নেই!

স্বাতির পায়ে একটা নাড়া দিলুম। চমকে জেগে উঠল সে। চাপা গলায় বললুম ঃ চট করে নেমে এস।

স্বাতির ঘোর তখনও কাটে নি। নামতে গিয়ে অসাবধানতায় মামীকে জাগিয়ে দিল। মামাকে জাগালেন মামী নিজে, বললেন ঃ শুনছ, দেখবার জিনিস সব পেরিয়ে গেলে জাগবে?

সত্যিই দেখবার জিনিস। সমুদ্রের উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে! লাইনের ধারে জলের উপর এক-একখানা বড পাথর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হযে আছে। সূর্যোদয় এখনও হয় নি, কিন্তু বাঁ দিকের আকাশ স্বচ্ছ ও রঞ্জিত হয়ে সেই জ্যোতির্ময়ের আগমন ঘোষণা করছে।

স্বাতি স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

মামী বললেন ঃ এই কি রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ!

বললুম ঃ অনেকেই তো তাই বলেন।

স্বাতি বলল ঃ রেল কোম্পানি নাকি রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধের ওপরেই পুল তৈরি করেছে। দর্ভশয়নম থেকে এই সেতুর আরম্ভ, আর শেষ হয়েছে ধনুষ্কোডি পেরিয়ে একেবারে লঙ্কায়।

বললুম ঃ সকলে এ কথা মানেন না। অনেকের মতে রামেশ্বর আগে দ্বীপ ছিল না, ভারতের সঙ্গে পাম্বান যোজক দিয়ে যুক্ত ছিল। আজ যে পাথরগুলি আমরা দু পাশে দেখতে পাচ্ছি, তা পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণম নায়কের প্রথম সেতু, পরবর্তী কালে ঝড়ে আবার তা ভেঙে যায়।

মামী বললেন ঃ গাড়িতে সেদিন স্বাতি দেখাল যে হনুমানের আনা গন্ধমাদন পাহাড়টাই হল রামেশ্বর দ্বীপ। সেদিন অপ্রয়োজনীয় বলে সমুদ্রের ভেতর যা তাঁরা ফেলে দিয়েছিলেন তাই আজ দেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়েছে।

পুল পেরিয়ে গাড়ি এল পাম্বান স্টেশনে। ছোট স্টেশন, মাঝখানে একটা কফির স্টল। লোভ হল, গাড়ি থামতেই ছুটে গিয়ে ফ্লাস্ক ভরে কফি নিয়ে এলুম। মামী গেলাসে আর ফ্লাস্কের ঢাকনায় দিলেন ভাগ করে।

মামার এই কফিটুকু ভাল লাগল। এক চুমুক মুখে নিয়েই বললেন ঃ এ না হলে আর ভাগনে।

আমার সমালোচনা না করে স্বাতি আজকাল জলগ্রহণ করে না। ফ্লাস্কের ঢাকনায় খানিকটা কফি পেতেই বলল ঃ জান বাবা, গোপালদার ভারি অহংকার যে সব কথাতেই নাকি নতুন কিছু বলতে পারে।

আমার দিকে ফিরে বলল ঃ বল তো রামেশ্বর সম্বন্ধে কোন নতুন কথা।

আমার হাসি পেল। বললুম ঃ মাণিক কবিতা লিখত। আমি তাকে বলেছিলুম যে এমন কোন কথা যদি বলতে পারিস যা কেউ কোন দিন কল্পনা করতেও পারে নি, তবেই বুঝব তোর কবি হবার আশা আছে। দিন কয়েক পরে এক দিন সে জানিয়ে গেল যে কবিতা আর সে লিখবে না। জিজ্ঞেস করলুম, সে কি রে? মাণিক সহজ ভাবে উত্তর দিল যে নতুন কথা সে ভাবতে পারে না। পুরনো কথাই মনে আসে নতুন ভাবে।

মামা হাসলেন।

স্বাতি বলল ঃ তবে তোমার কিসের অহংকার ?

বললুম ঃ পুরনো মদ নতুন পাত্রে বিলোবার।

আশেপাশের গাড়ি থেকে যাত্রী নামল যত, তত উঠল না। সেই পাণ্ডারা একজনকে এগিয়ে দিয়ে বাকি সব পিছিয়ে গেল। বলল ঃ ধনুস্কোডিতে সব-কিছু দেখাবার জন্যে একজনই যথেষ্ট।

পিছন থেকে একজন বলে উঠল ঃ না না, একজন যথেষ্ট নয়। দামী মালপত্র সঙ্গে আছে, সেগুলো আগলাবার জন্যে আর একজনেব দরকার।

শেষ পর্যন্ত দুজন চলল সঙ্গে। বাকি সকলে প্ল্যাটফর্মের ওধারে রামেশ্বরের গাড়িতে গিয়ে চাপল। আমরা এগলুম ধনুস্কোডির দিকে।

স্বাতি বলল ঃ তা হলে পাবলে না তো নতুন কিছু বলতে !

বললুম ঃ এই রামেশ্বর দ্বীপের আয়তন কত জান ?

স্বাতি স্বীকার করল, জানে না।

বললুম ঃ পূর্ব-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল আর উত্তব-দক্ষিণে ছ মাইলের বেশি কোথাও নেই। বিষ্ণুর শঙ্খের আকৃতি এই দ্বীপের। হাজার চল্লিশ লোকের বাস এখানে, তার ভেতর ব্রাহ্মণ সব চেয়ে কম। অব্রাহ্মণ আছে নানা বর্ণের, মুসলমানও আছে—প্রাচীন ভাবতে আরব বণিকের বংশধর, যারা আজ পানের আবাদ আর ছুটকো কেনা-বেচা করে দিনপাত করে। এখানকাব আসল অধিবাসী হল জেলে, তাদের ভেতর ক্রিশ্চানই বেশি। তারা বলে, এই উপসাগবে শঙ্খের সঙ্গে প্রবালও পাওয়া যায়, তবে সে নিতান্ত নোঙরা ব্রাউন রঙেব প্রবাল। ক্বচিৎ কদাচিৎ সমুদ্রবেলায় নির্মল প্রবালও পাওয়া যায়। যা অপর্যাপ্ত পাওযা যায়, তা হল নানা জাতের শাঁখ, ঝিনুক আর কড়ি।

গাড়ি মিনিট খানেকের জন্য দাঁড়াল রামেশ্বর রোড স্টেশনে। তাব পব আবার চলা। দু ধারে বালির চর। দুরন্ত হাওয়ায় পাহাড় তৈরি হয় আজ এখানে, কাল সেখানে। মাঝে এক-একটা তালগাছ কিংবা কাঁটার ঝোপ। এক সময় সকালের রোদ ঝিকমিক কবে উঠল বালির বিস্তারের উপর।

মামী মুখ হাত ধুতে গেছেন। ও-ধারের কামরাটিও খালি ছিল। আমি সেদিকে গেলুম। ধনুষ্কোডিতে সময় কম। মামা বললেনঃ তোমরা এলে আমরাও তৈরি হয়ে নেব।

ধনুষ্কোডি পৌঁছলুম সকাল সাতটায়। স্টেশনে ঢোকবার কিছু আগে আর একটা লাইন বাঁয়ে ঘুরে পিয়ার স্টেশনে জাহাজের মুখোমুখি গিয়ে ঠেকেছে। সিংহলযাত্রী জাহাজও দাঁড়িয়ে আছে একখানা। বাইশ মাইল জল দু ঘণ্টায় পেরিয়ে তালাই মান্নার পিয়ারে পৌঁছে দেয়। সিংহল আজ ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য। সেখানে যেতে হলে ছাড়পত্র চাই। মণ্ডপম ক্যাম্প স্টেশনে আধ ঘণ্টা গাড়ি দাঁড় করিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে।

ধনুষ্কোডির স্টেশন আর পিয়ারের দূরত্ব বেশি নয়। যাঁরা সিংহলে যাবেন, তাঁরা ইণ্ডো-সিলোন এক্সপ্রেসে চেপে সোজা পিয়ারে গিয়ে নামেন, আর তীর্থযাত্রীরা এই সব প্যাসেঞ্জারে এসে আমাদের মতো স্টেশনে নামেন। সমুদ্রের জল এসে রেল-লাইনের ধার পর্যন্ত দোলা দিচ্ছে। তারই ধারে ধারে ভিজে বালি ও মাটির উপর দিয়ে সোজা চলে গেলে হয়তো মিনিট দশেকও লাগবে না পিয়ার পৌঁছতে। মাঝে একটা দ্বীপের মতো জেলেদের কুঁড়েঘরগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে ছায়া ঘনিয়ে রেখেছে। উপরে তাল আর নারকেল পাতার ছাউনি। মাথায় বড় বড় ঘড়া নিয়ে ছপছপ করে জল পেরিয়ে মেয়েরা আসছে স্টেশনের দিকে। পরে শুনেছিলুম যে এই গাড়ির সাড়া পেয়ে চারিদিক থেকে মেয়েরা আসে ছুটে, মাথায় কাঁকালে ঘড়া আর হাতে বালতি। ধনুষ্কোডির জল মুখে দেওয়া যায় না, এমনি নুন তাতে। তাই মণ্ডপম স্টেশন থেকে আসে জলভর্তি কয়েকটা ট্যাঙ্ক ওয়াগন—একখানা জাহাজের জলের জন্য, আর গোটা দুই এখানকার লোকদের জন্য। এ তাদের খাবার জল। অন্য সব কাজ করতে হয় সমুদ্রের জলের মতো নোনা জলে।

ছোট ওয়েটিং রুম। একখানা টেবিল, আর খানকয়েক চেয়ার। ঘরের এক কোণে জিনিসপত্র রেখে আমরা সমুদ্রের দিকে চললুম।

পাহারা রইল পাণ্ডাদের একজন আর একজন চলল সঙ্গে। বলল: একখানা গরুর গাড়ি নেব কি মাইল দেড়েক পথ, চলতে কষ্ট হবে আপনাদের।

প্ল্যাটফর্ম যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকেই বালির রাজ্য। রাস্তার নিশানা পাওয়া যায় গরুর গাড়ির চাকার দাগে। তাড়াতাড়ি হাঁটবার জো নেই, খালি পায়ে এলে হয়তো বেপরোয়া পা চালানো যেত।

মামা তাকালেন মামীর দিকে। মামী তাঁর ভারী তোয়ালের ভারটা পাণ্ডার লোকের কাঁধে চাপিয়ে হালকা হয়েছেন। বললেন: তোমার দরকার থাকে, তুমি ওঠ গরুর গাড়িতে। আমার পা আছে।

নিরাসক্ত ভাবে মামা চললেন পিছনে পিছনে। বললেন: আজকেই আবার ফিরতে হবে কিনা, শেষে ফিবে এসে শুয়ে পোড়ো না।

রেলের সাইডিংগুলো তখনও শেষ হয় নি। বালির পাহাড়ে অর্ধেক ঢাকা পড়েছে একটা ট্রেন। অনেকগুলো মেয়ে পুরুষ সেই বালি কেটে ঝুড়িতে করে সরিয়ে নিয়ে দূরে ফেলছে। একটু নজর দিয়ে দেখলুম যে ট্রেনখানা ঢাকা পড়ে নি। চেঁচে ছুলে লাইনটা পরিষ্কারই রেখেছে। দু ধারের পাহাড় এগিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে, একটুখানি অবহেলা করলেই ঢেকে ফেলবে।

পাণ্ডার লোকটি গল্প জুড়েছে মামীব সঙ্গে। বলল: সমুদ্র দিনে দিনে এগিয়ে আসছে। যখন ছোট ছিলাম, তখন এই সমুদ্র ছিল মাইল পাঁচেক দূরে। স্টেশনের দক্ষিণেও তাই, কত বস্তি ছিল সেদিকে। এখন একেবারে স্টেশনের ঘাড়ে এসে উঠেছে সব। এই দেখুন না, কোথায় এসেছে সমুদ্র!

স্বাতি বলল: একদিন হয়তো এ-ও থাকবে না।

পাণ্ডার লোকটি মেনে নিল তার কথা। বলল: লোকে তাই ভাবছে।

কিন্তু স্বাতির এই মন্তব্য যে অল্প দিন পরেই সত্যে পরিণত হবে, আমরা তা স্বপ্নেও ভাবি নি। কিছু দিন পরে খবরের কাগজে দেখেছিলুম যে সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পাম্বানের পুল ভেঙে গেছে, আর নিশ্চিহ্ন

হয়েছে ধনুষ্কোডি। একদিন রেলের পুল মেরামত হল, কিন্তু ভারতের মানচিত্রে ধনুষ্কোডির নাম আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ডান দিকে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল, ফেনায় সাদা হয়ে যাচ্ছিল সমস্ত জায়গাটুকু। স্বাতির পা দুটো নিশপিশ করে উঠল। বলল ঃ এই ধারে এস না গোপালদা, একটুখানি ফেনা দেখে নিই জলের।

ততক্ষণে সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমিও গেলুম তার পিছনে। মামা বললেন ঃ দেরি কোরো না বেশি। দুপুরের গাড়িতেই ফিরতে হবে তো!

জলের ধারে পৌঁছে স্বাতি যেন হারিয়ে ফেলল নিজেকে। ছুটোছুটি করে ঝিনুক কুড়তে লাগল বালির উপর থেকে। বলল ঃ কত ঝিনুক দেখেছ গোপালদা! কত রঙের, কত রকমের! পুরীর সমুদ্রে কি এ রকম দেখেছ!

আমিও বেছে বেছে ভাল ঝিনুক কুড়লুম তার জন্যে, যেমনটি সে পায় নি। তাই দেখে স্বাতি বলল ঃ কি আশ্চর্য কপাল তোমার গোপালদা! ভাল সব-কিছু কি তোমার হাতেই পড়ছে!

হেসে বললুম ঃ আমার কপালে শুধু ঝিনুকই আছে।

স্বাতি একটা ঢেউয়ের তাড়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পা দুটো ভিজেছে, ভিজেছে শাড়ির তলাটাও। পেছুতে পেছুতে বালির ওপরেই বসে পড়ল। হাসিতে ভরে গেছে তার সারা মুখখানা।

আমিও বসলুম একটু তফাতে।

স্বাতি বলল ঃ তীর্থস্থান যে এমন সুন্দর হয়, আগে জানতুম না। তীর্থের নাম শুনলে গায়ে আমার জ্বর আসত।

বললুম ঃ আমাদের পূর্বপুরুষরা যে রসিক ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাই বেছে বেছে তীর্থস্থান করেছেন সমুদ্রতীরে আর হিমালয়ে। এক দিকে পুরী দ্বারকা রামেশ্বর আর কন্যাকুমারী, অন্য দিকে কেদার-বদরী অমরনাথ আর পশুপতিনাথ। আকর্ষণ কি শুধু দেবতারই!

স্বাতি বলল ঃ কিন্তু পাহাড়ের ভয় আমার আজও যায় নি। সে তো রেলে বা মোটরে যাওয়া নয়, কাঁধে বোঁচকা নিয়ে দিনের পর দিন

পায়ে হেঁটে একটু একটু করে ওঠা। মশা মাছি বর্ষা আর বরফ। পেটে ক্ষিধে, পায়ে ঘা, আর চোখে ঘুম। ভাবলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

বললুম ঃ তবু তো লোকে যায় দলে দলে, কাতারে কাতারে, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। খবর এসেছে, গ্লেসিয়ারে এবার ঢল নামবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অমরনাথের সব যাত্রী। কিন্তু কেউ তো ফেরে না সেই ভয়ে! কদিন থেকে ঝড় উঠছে আরব সাগরে, মাঝিরা ভয় পাচ্ছে বেটদ্বারকাব নামে। যাত্রীরা তবু নৌকোয় এসে বসে পরম নিশ্চিন্তে। বলতো কোথা থেকে আসে এই সাহস!

স্বাতি বলল ঃ আমার বিশ্বাসের গণ্ডি বড় ছোট গোপালদা। লেখাপড়া শিখে আজ পাপপুণ্যের ওজন করি যুক্তির দাঁড়িপাল্লায়।

মামা মামীকে আর চেনা যাচ্ছে না, আর সব যাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেছেন তাঁরা। বললুম ঃ এবারে ওঠা যাক স্বাতি।

স্বাতি উঠল, চলতে চলতে বলল ঃ অত দূরে যাবার ইচ্ছে আমার আর নেই গোপালদা, আমার যা কুড়োবার তা কুড়িয়েছি।

বলে আঁচল ভর্তি ঝিনুক দেখাল আমাকে।

সেতুবন্ধে পৌঁছতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। যজুর্বেদে এই সেতুব উল্লেখ আছে। মাতৃগর্ভে শিশুর পদদ্বয়ের মতো দুই সমুদ্রের সংঘর্ষ। কূল দেখা যায় না এমন সমুদ্রকেও বন্ধন করেছে।

মামা মামীর তীর্থকৃত্য তখন সমাধা হয়ে গেছে। পাণ্ডার সুষ্ঠু তদারকে বত্নাকর নামে ভারতমহাসাগব সংলগ্ন একটি ছোট জলাশয়ে মল-বিমোচন স্নান কবেছেন। বালি ও পাতার অলঙ্কাব কৃত্যার কাছে নিবেদন করে সমুদ্র-স্নানের অনুমতি নিয়েছেন। এখানে এক মাস ধরে ছত্রিশবাব সমুদ্র স্নানের প্রথা। তিন দিনেও ছত্রিশ স্নানের অনুমতি আছে। মামা মামী এক দিনেই ছত্রিশটা ডুব দিয়ে উঠেছেন। পূর্বপুরুষের নামে পিণ্ডদানও মামার শেষ হয়েছে।

আমরা পৌঁছতেই মামা বললেন ঃ কেমন দেখছ গোপাল?

বললুম ঃ গোবিন্দদাস যে কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সমুদ্রের ধারে পৌঁছে তিনি বলেছিলেন—

দেখিবার কিছু নাই, তথাপি শোভন।
এখানে সৌন্দর্য দেখে যার শুদ্ধ মন ॥

হাজার কথাতেও এর চেয়ে বেশি বলা যায় না।

আমাদের বিশ্রাম করতে দেখে পাণ্ডার লোকটি বলল ঃ স্টেশন থেকে ঘাটে আসার এই পথশ্রম এড়াবার জন্যে নৌকো পাওয়া যায়। রামেশ্বর থেকে সোজা এই ঘাটে এসে লাগে। এই উপসাগরে জল তত গভীর নয় তো।

ঘাটে নৌকো ছিল না একটাও। স্বাতি বলল ঃ বেশ লাগত কিন্তু নৌকোয় যেতে।

লোকটা কিছু বোঝে, কিছু অনুমান করে। বলল ঃ কদিন থেকে ঝড় উঠছে সমুদ্রে, তাই আজ নৌকো বন্ধ আছে। কটা দিন গেলেই আবার চলবে।

৩১

আমরা রামেশ্বরে পৌঁছলুম দুপুর দুটোর আগে। মামার বড় কষ্ট হয়েছে। মামীও ক্লান্ত, তবে মুখে বলছেন ঃ বাবার কৃপায় চার ধামের দুটো ধাম দেখা হল—পুরী আর রামেশ্বর। বাকি রইল দ্বারকা আর বদরীনারায়ণ। ভাগ্যে থাকলে—

ধনুষ্কোডি পিয়ার থেকে ইণ্ডো-সিলোন এক্সপ্রেস ধরে ফিরেছি। পাম্বানে গাড়ি বদল। পাণ্ডা তাঁর লোকজন নিয়ে স্বয়ং এসেছিলেন অভ্যর্থনা করতে। নিজের বাড়িতেই আমাদের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মামা এক রকম জোর করে ধর্মশালায় উঠলেন। বললেন ঃ ওঁরা দূরেই থাকুন, একবার খপ্পরে পড়লে আর ফিরতে হবে না।

বললুম ঃ এ দিকের পাণ্ডা শুনেছি বড় ভদ্র।

মামা বললেন ঃ পাণ্ডা পাণ্ডাই।

হাসতে হাসতে স্বাতি বলল ঃ খ্রীষ্টান পাণ্ডার গল্প পড় নি আলি সাহেবের লেখায় ?

আমরা মাত্র একটি দিন থাকব জেনে পাণ্ডা বড় ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন ঃ এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে এত দূরে এসে থাকবেন মোটে একটি দিন ! এখানে যত দ্রষ্টব্য, এক দিনে তো সব দেখা হবে না !

মামা বললেন ঃ বাবার দর্শনের জন্যে আসা, তাঁর দর্শন হলেই সব দেখা হবে।

পাণ্ডা মেনে নিলেন, বললেন ঃ তা বটে। বাবার দর্শনেই সমস্ত তীর্থ দর্শনের পুণ্য।

আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ আপনারা ইচ্ছে করলে আরও কিছু দেখতে পারেন। গন্ধমাদন পর্বতে রামঝরকা মাইল দেড়েক পথ, একান্ত রামেশ্বরম তিন মাইল, নাম্বিনায়কী আম্মন দু মাইল, সীতাকুণ্ডম আর

ভিল্লুবনি তীর্থম মাইল পাঁচেক। ভৈরব তীর্থম পাম্বানে, সেখানকার রোলিং রেলওয়ে লিফ্‌ট্ ব্রীজ আর জাহাজ-মেরামতের কারখানাও দেখবার জিনিস। এধারে ধনুষ্কোডির দিকে কোদণ্ডরমন কইল্।

কী না দেখলে আপসোস করতে হবে ?

স্বাতি জিজ্ঞেস করল।

পাণ্ডাকে ভাবতে হল না এতটুকু, বললেন ঃ রামঝরকা একটি দোতলা মন্দিরে শুধু রামচন্দ্রের চরণকমলই দেখবেন না, দেখবেন ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন গোটা রামেশ্বর দ্বীপ। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বে অসীম জলরাশি, পশ্চিমে একটি ছোট পুল দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদের ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। স্বাতি বলল ঃ বাবা মা একটু বিশ্রাম করুন, এই ফাঁকে আমরা একটা তীর্থ সেরে আসি। কী বল গোপালদা ?

মামীর হয়তো ভাল লাগে নি এই প্রস্তাবটি, কিন্তু মামা প্রশ্রয় দিলেন। বললেন ঃ সেই ভাল, আমরা ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিই, কোমর আজ ভেঙে গেছে। মন্দির খুললে আমরা মন্দিরেই যাব।

পাণ্ডা তবু বললেন ঃ বালির রাস্তায় ঝটকা চলে না। তবে ভাল গরুর গাড়ি পাওয়া যায়। আপনাদেরও বিশেষ কষ্ট হত না।

দু হাত জুড়ে মামা বললেন ঃ রামচন্দ্রের পায়ে এইখান থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি।

পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে একজন লোক দিলেন।

বাজারের রাস্তা দিয়ে চলবার সময় কফির দোকান দেখলুম অনেক। বললুম ঃ দক্ষিণে এসে কফির একটু নেশা ধরেছে। অনেক হাঁটতে হবে তো, এক ভাঁড় খেয়ে নিলে মন্দ হত না।

স্বাতি বলল ঃ গরম বড়াও ভাজছে বেশ।

বসা গেল একটা দোকানে।

স্বাতি বলল ঃ এরা আলু-কাবলি খায় না ? ঘুগনি আর ফুচকা ?

বললুম ঃ তোমার মতো পার্টনার পেলে তারই একটা দোকান খুলতুম এখানে।

আড়চোখে চেয়ে স্বাতি জবাব দিল ঃ রাস্তার মতো আস্বাদ ঘরে কিছুতেই হয় না।

পাথরের পথ ছেড়ে বালির পথ ধরলুম আমরা। মেঘে মেঘে আকাশ ভারী হয়ে আছে। মাঝে মাঝে সিরসির করে হাওয়া বইছে। স্বাতি বলল ঃ ভিজতে ভারি মজা লাগবে আজ।

রাস্তাব ধারে ধারে বাবুলকাঁটার গাছ আব সজনে। মোটা মোটা সজনে ঝুলছে ডালে। লোকটি বলল ঃ এ সজনে বারোমেসে। বাবার দয়ায় তরকারির অভাব নেই আমাদের।

স্বাতি বলল ঃ এই যে কেটে কেটে রেখেছে বাবুলের কাঁটা, এ দিয়ে কী হবে ?

লোকটি বলল ঃ চালান যাবে মাতুরায়।

স্বাতি বলল ঃ ধান চাল বুঝি হয় না ?

লোকটি হেসে বলল ঃ আপনাদের দয়ায় আমাদের অনেক পয়সা। সবই এখানে চালান আসে, আমরা কিনে খাই।

লোকটি তার কর্তব্যে ত্রুটি করছে না। পথে যত তীর্থ পড়ছে, সবই দেখাতে দেখাতে চলেছে। সুগ্রীব জাম্বুবান অঙ্গদ পাণ্ডব ধর্ম ভীম অর্জুন নকুল সহদেব—সকলের নামে নামে তীর্থম, মানে কুণ্ড। কোথাও জল আছে একটুখানি, কোথাও নেই। লোকটি বলল ঃ দ্রৌপদী তীর্থম ভদ্রকালী আম্মন মন্দিরের কাছে।

স্বাতি বলল ঃ দ্রৌপদীর এ কী রকম আচরণ ! পঞ্চস্বামীকে ফেলে নিজে গেছেন ভদ্রকালীর কাছে !

আমি বললুম ঃ বোধহয় আধুনিকা হবার চেষ্টায় আছেন।

রোষ ভরে স্বাতি বলল ঃ পঞ্চস্বামী আছে বলে শুনি নি কোন আধুনিকার।

এবারে বালির রাস্তা ওপরের দিকে উঠেছে। লাল বালি। লোকটি

গল্প শুরু করল। বলল ঃ বালি এমন লাল হল কী করে জানেন? সে অনেক দিনের কথা। রামচন্দ্র রাবণ বধ করে ফিরে এসে শিব প্রতিষ্ঠা করে পূজো করবেন। হনুমান কাশী থেকে শিবলিঙ্গ আনতে গেলেন। তাঁর দেরি দেখে রামচন্দ্র বালির লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। হনুমান এসে ক্ষেপে গেলেন, তাঁর সকল শ্রম তা হলে ব্যর্থ হল! রামচন্দ্র বললেন, তুমি এই লিঙ্গ তুলে ফেলে নিজের আনা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর। আদেশ পেয়ে হনুমান তাঁর লেজ দিয়ে বালির শিবলিঙ্গ জড়িয়ে সকল শক্তি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু শিবের মায়ায় রক্তাক্ত কলেবরে ছিটকে পড়লেন সমুদ্রের ধারে। সেই দিনই হনুমানের রক্তে রাঙিয়ে গেছে রামেশ্বরের বালি।

আমরা তখন বালির পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি। সামনে সেই দোতলা রামঝরকা দেখতে পেলুম।

লোকটি বাঁ দিকের একটি ভগ্ন প্রাসাদ আর দুর্গ দেখিয়ে বলল ঃ রামনাদের এক সেতুপতি এটি নির্মাণ করেন।

সিঁড়ি ভেঙে আমরা উপরে উঠলুম। মন্দিরের দরজা বন্ধ, ভিতরে বদ্ধ অন্ধকার। লোকটি বলল ঃ পূজারী এলেন বলে।

ছাদে উঠে আর এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। সমুদ্রের কী উদার বিস্তার! পাণ্ডা ঠিকই বলেছেন, এ দৃশ্য না দেখলে রামেশ্বর দেখা সম্পূর্ণ হত না।

লোকটি বলল ঃ ওই যে ধোঁয়া দেখছেন অল্প অল্প, ওই হচ্ছে ধনুষ্কোডির জাহাজের ধোঁয়া। ওই পাম্বানের পুল। এই হচ্ছে মন্দিরের গোপুর আর এই বঙ্গোপসাগর, যা পেরিয়ে আপনাদের বাঙলা দেশ।

আমরা চোখ জুড়িয়ে দেখছি সব কিছু, আর লোকটি বলে যাচ্ছে ঃ এইখানে দাঁড়িয়ে এক দিন রামচন্দ্র তাঁর সেতু নির্মাণ দেখতেন, দেখতেন তাঁর সৈন্যচালনা। লঙ্কা জয়ের মন্ত্রণা করেছেন এইখানে বসে।

রামচন্দ্র! আমি বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি আজ। এত দিন যাঁকে দেখেছি একখানা মহাকাব্যের নায়ক রূপে, আজ যেন স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছি তাঁকে—চোখের সামনে সারা রামায়ণখানা বুঝি ভেসে উঠল !

নাসিকের পঞ্চবটী বন থেকে সীতা অপহৃতা হলেন। সীতা-অন্বেষণে বেরিয়ে রাম লক্ষ্মণ এলেন কিষ্কিন্ধ্যায়। ঋষ্যমূক পর্বতের সম্মুখে পম্পাতীরে হনুমানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। সুগ্রীব তখন অগ্রজ বালীর ভয়ে এই মতঙ্গারণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। হনুমান তাঁদের সুগ্রীবের নিকটে আনলেন। তাঁদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। বালী বধ করে রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। বর্ষা তখন সমাগত। সুগ্রীব বিশ্বস্ত বানর পাঠালেন চারি দিকে। আর রাম মাল্যবান গিরিতে চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করলেন। সীতার সংবাদ আনলেন হনুমান। লঙ্কার অশোক বনে সীতা বন্দিনী। বানর বাহিনী সঙ্গে নিয়ে রাম লক্ষ্মণ ভদ্রাচলের পথে এলেন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে। রামনাদ স্টেশন থেকে সাত মাইল দক্ষিণে দর্ভশয়নমে পৌঁছে তৈরি হল সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা। দর্ভ বা কুশের উপর শয়ন করে রাম বরুণের উপাসনা করে সমুদ্র বন্ধনের অনুমতি নিলেন। আরও খানিকটা দূরে দেবীপত্তনমে আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা করলেন। আজও সমুদ্র তীরে জলের ভিতর নয়টি প্রস্তরখণ্ড জেগে আছে। আদি সেতুর নির্মাণ শুরু হল দর্ভশয়নম থেকে।

স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কালিদাসের রঘুবংশম্ পড়েছ ?

স্বাতি বলল ঃ সংস্কৃত হরফকে চিরকাল ভয় পেয়েছি।

বললুম ঃ রাবণবধ করে রাম অযোধ্যায় ফিরছেন কুবেরের পুষ্পক রথে। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভোগের দিন ফুরিয়ে গেছে। নিচের এই সমুদ্র-বেলা দেখলেন নতুন চোখে—

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥

কবি কালিদাসও কি এক দিন পুষ্পক রথে চড়ে এই দৃশ্য দেখে গেছেন !

রসভঙ্গ করল পাণ্ডার সেই লোকটি। বলল ঃ পূজারী মন্দিরের দরজা খুলেছেন। চলুন এবারে নিচে

স্বাতিও খুশী হল না। বলল: রামচন্দ্র যদি এইখান থেকে সেতু নির্মাণ করিয়ে থাকেন তো এই পাহাড়টা গন্ধমাদন নয়। আর পাহাড় গন্ধমাদন হলে রাবণ বধ করে রাম এসেছেন এখানে।

এ কথার জবাব দিতে পারল না লোকটি। নিচে নেমে মন্দিরের ভিতর একখানা পাথরের উপর রামের পায়ের চিহ্ন দেখিয়ে প্রণাম করতে বলল।

৩২

বেলা থাকতেই আমরা রামেশ্বরের মন্দিরে এলুম। মোড়ের মাথাতেই একজন লোক খবর দিল যে মামা-মামী ঝটকায় চেপে এই দিকেই আসছেন, আর আমাদের ধর্মশালায় ফেরবাব দবকার নেই।

স্বাতি বলল : কতক্ষণ এখানে দাঁড়াতে হবে গোপালদা ?

পাণ্ডার লোকটি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, বলল : আসুন, এই দোকানেব চাতালে একটু বসা যাক।

স্বাতিকে দুবার বলতে হল না। চাতালটা দেখতে পেয়েই উঠে বসল। আমিও বসলুম। লোকটি গল্প বলতে লাগল : ভাবছেন যে এই মন্দির বুঝি অনেক পুরনো! পুরনো নিশ্চয়ই, তবে যত পুবনো ভাবছেন তত নয়। শোনা যায় যে এক কুঁড়ের নিচে ছিল রামেশ্ববের লিঙ্গ, আর এক সন্ন্যাসী তাঁব পূজো করতেন। কাণ্ডিব ববরাজশেখর প্রথম তৈরি করলেন কালো শক্ত পাথরের গর্ভগৃহ, সিংহল থেকে কেটে পালিশ করে এনেছিলেন পাথর। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহু এই মন্দির নির্মাণ কবেন। বামনাদেব সেতুপতিবা শুধু মন্দির সংস্কাবই করেন নি, এর ভেতর নানা প্রাকার ও গোপুব যোজনা করেছেন। মন্দিরটি কোন একটি প্ল্যান অনুসারে এক দিনেব তৈরি নয়। কয়েক শো বছর ধরে ধীরে ধীরে এটি গড়ে উঠেছে ও এখনও বাড়ছে।

স্বাতি বলল : এখনও কি সম্পূর্ণ হয় নি ?

লোকটি হেসে বলল : ঢুকলেই দেখতে পাবেন, কিছুদিন আগেও কাজ হচ্ছিল ভেতরে। রামনাদের রাজাদের বৈষয়িক গণ্ডগোলে কাজ এখন বন্ধ আছে। আর ভেতরে কেন, বাইরেও তো দুটো গোপুর অসমাপ্ত আছে—উত্তর আর দক্ষিণ গোপুর। এই যে সামনের এই গোপুর, এটি পশ্চিম দ্বার। মাথায় নিচু বটে, কিন্তু বয়সে প্রাচীন। আমার ঠাকুরদা

বলতেন যে ওধারের ঐ পূর্ব গোপুরটি তাঁদের চোখের সামনেই নির্মিত হয়েছে বছর পঞ্চাশেক আগে।

আমি স্বাতিকে বললুম: ওরিয়েণ্টালিস্ট ফার্গুসন সাহেবের একটা কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে এমন একটি মন্দিরের উল্লেখ যদি করতে হয় যা দ্রাবিড় শিল্পের সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর তারই সঙ্গে এই স্থাপত্যের শ্রেণীগত ত্রুটিও প্রকাশ করছে, তবে রামেশ্বরমের নামই করতে হবে। এই মন্দিরের বয়স তিন শো বছর বলে আজ অনুমান করা হয়।

একখানা ঝটকা এসে সামনে দাঁড়াল। ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি। এর আগে গরুতে টানা গাড়িও দেখেছি। এ দেশে কত রকমের গাড়ি দেখলুম। নিজের দেশে দেখেছি জুড়িগাড়ি ব্রুহাম ল্যাণ্ডো ফিটন টমটম, পশ্চিমে একা টাঙ্গা, আর এ দেশে এসে দেখছি ঝটকা আর বাণ্ডি। এ মোটরের ক্রাইসলার ক্যাডিল্যাক নাম নয়। এদের একখানা গাড়ির সঙ্গে আর একখানার মিল নেই কোনখানে।

মামা নামলেন পিছন থেকে, আর মামী বসে ছিলেন ভিতরে ঢুকে। ফ্লাস্ক হাতে তিনিও নামলেন। বললেন: সেই সাত সকালে খেয়েছ, এই নাও একটু চা আর বিস্কুট এনেছি তোমাদের জন্যে।

স্বাতি হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্কটা নিল, কিন্তু নিজেদের কফি খাবার গল্পটা গেল চেপে। ততক্ষণে পাণ্ডাও এসে গেছেন।

আমরা ফুল-চন্দনের দোকানে জুতো চটি রেখে মন্দিরে প্রবেশ করলুম। কী বিরাট প্রশস্ত মন্দির! চওড়া করিডরের দু ধারে নানা দোকানপাট বসেছে। তার ভিতরে জাঁকিয়ে আছে শাঁখ আর শামুকের দোকান। আরও আছে নারকেলের পাতায় বোনা বিচিত্র বর্ণে উজ্জ্বল বাক্স ব্যাগ আর ঝুড়ি।

স্বাতি চেঁচিয়ে উঠল। বলল: দেখেছ মা, কত রকমের শাঁখ!

ফেরার পথে এই শাঁখ দেখা হয়েছিল, কেনাও হয়েছিল কিছু। সত্যিই, কত রকমেরই বটে! পছন্দ করে মামী পঞ্চমুখ শাঁখ আর জটায়ু শাঁখ কিনলেন বড় বড়। আর এক রকমের শাঁখ কিনলেন ঠিক

পদ্মকোরকের মতো, তার ভিতরে বাল্‌ব্‌ লাগিয়ে টেবিল-ল্যাম্প করা যায়। সিংহলের শাঁখ কিনলেন পেপার-ওয়েট করবার জন্য। দক্ষিণাবর্ত শাঁখের শখ ছিল মামার। তাঁর সেই ব্যবসায়ী বন্ধু এখান থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন কয়েক আনা দামে। শাঁখের পাঁজার ভিতর লুকিয়ে ছিল সেই শাঁখটি। তাঁর সেই বন্ধুর বিশ্বাস যে এই শাঁখ তাঁর সৌভাগ্য এনেছে। মামা সেই শাঁখটি দেখে এসেছেন। বললেন ঃ রোজকার ব্যবহারের শাঁখের আবর্ত বামে, দক্ষিণাবর্ত শাঁখ লাখেও একটা মেলে না।

দোকানী বলল ঃ আমার বাড়িতে আছে একটা—পাঁচ শো টাকা দাম লাগবে।

লোক পাঠাচ্ছিল সেই শাঁখটা আনবার জন্যে। কিন্তু মামা নকল শাঁখের গল্পও শুনে এসেছেন। দ্বিধায় পড়ে পাণ্ডার শরণ নিলেন। পাণ্ডা সহজ ভাবে জবাব দিল ঃ আসল নকল আমি চিনি নে। কেন না আসল আমরা দেখি নি। এখানে তো লোকে এ সব জানত না, বাঙালীরাই শিখিয়েছে এই ব্যবসা।

দোকানী বলল ঃ এর আবার নকল কী।

কিন্তু মনের সন্দেহের উপর যুক্তির হাত নেই। মামা বললেন ঃ এত পয়সা দিয়ে কি শেষে যা আছে তাও খোয়াব!

পছন্দ করে মামী একটা বামাবর্ত শাঁখই কিনলেন, বললেন ঃ স্বাতির বিয়েয় লাগবে।

মাদ্রাজেই জেনেছিলুম যে অগ্রহায়ণে স্বাতির বিয়ে। ত্রিচিতে বাকী খবরটুকুও দিয়েছিলেন মামী। বড় ভাল পাত্র, রূপে গুণে তার তুলনা হয় না। আট বছর বিলেতে টেক্সটাইল পড়ে দেশে ফিরেছে। মোটা মাইনের চাকরি পাবে দেশে। যেমন বিনয়, তেমনি আদবকায়দা। মামীর নাকি হাঁফ ধরে তার সঙ্গে তাল রাখতে। কিন্তু মামার মুখে এই পাত্রের গুণের কথা শুনি নি। নিতান্ত নিরাসক্ত ভাবে তিনি শুধ্‌ পাইপে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করেছেন।

পাণ্ডার সঙ্গে আমরা এগিয়ে গেলুম। সেই করিডর, চার হাজার ফুট লম্বা আর সতের থেকে চব্বিশ ফুট প্রশস্ত। দু ধারে বড় বড় থামের

উপর ছাদ। সেই থামের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য নেই কাঞ্চীর মতো, নেই দেবদেবীর মূর্তি বা অশ্বারোহী যোদ্ধা। থামের নিচের চেয়ে উপরটা চওড়া বেশি, উপরের ছাদকে আরও একটু বেশি কাঁধ দেবার চেষ্টা। দেওয়ালের রঙে আর জৌলুস নেই, হলদে খয়েরি আর লালের একটা মিশ্রণ. তাতে অজন্তার মতো শিল্পীর হাত পড়ে নি কোনখানে। সমগ্র ভাবে একটা বিরাট কীর্তির মহিমা আছে, নেই সূক্ষ্ম রসানুভূতির আবেদন। মনে হল যে ফার্গুসন সাহেব ঠিকই বলেছেন।

দ্রাবিড় মন্দিব তো একজনের তৈরি নয়। বনের ভিতর শিবলিঙ্গ দেখে সন্ন্যাসী পূজো করলেন, চাষী এসে নারকেলপাতার ছাদ বেঁধে দিল, শ্রেষ্ঠী তুলল গর্ভগৃহ, আর রাজা নির্মাণ করলেন মন্দির। তারপর দূর-দূরান্ত থেকে আসে পুণ্যার্থী, তাদের জন্যে চাই ঘাটবাঁধানো বিরাট সরোবর আব বিশ্রামের জন্য হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ। আরও যাত্রী আসে, আবও বাড়ে মন্দির। প্রথম প্রাকারের পব দ্বিতীয় প্রাকার, তাবপর তৃতীয়। এমনি করে সাতটি প্রাকার হয়েছে শ্রীরঙ্গমে। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের শিল্পপ্রীতিব এই তো পবম নিদর্শন। জৈনদেব মতো ঐশ্বর্যে আর অলঙ্কারে পীড়িত করে নি পুণ্যার্থীর দৃষ্টি. মূর্তি আর স্তূপের বিশালতায বিহ্বল করে নি বৌদ্ধদের মতো, দুর্গ আর প্রাসাদেব জৌলুসে জর্জর কবে নি মুসলমানদের মতো। কীর্তি এখানে বড় নয, বড় দেবতা। আর সেই দেবদর্শনে ধন্য হতে যারা আসে, তাদের বিশ্রামের জন্য এই বিরাট আয়োজন। পাথর আবিষ্কার করেছে গ্রীস, আর সেই পাথরে প্রাণ দিয়েছে ভারত।

প্রদীপের আলোয় আমরা রামেশ্বর দর্শন করলুম দূর থেকে। মন্দিরের সর্বত্র বিদ্যুতের আলো, শুধু ভিতরে ঘৃতের প্রদীপ। কী স্নিগ্ধ, কী মিষ্টি এই আলোটুকু

কর্পূরের আলোয় আরও ভাল করে দেখলুম দেবতাকে। গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন পাষাণদেবতা। কী কঠোর তপস্যায় সেই ধ্যান ভঙ্গ হবে তিনিই জানেন! পূজারী উদাত্ত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, যাত্রীরা করজোড়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

মামী বললেন ঃ কাছে যেতে পাব না আমরা ? এমনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাবাকে দেখতে হবে ?

জানা গেল, এই এখানকার রীতি। এখানকার কেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারতেই দেবদর্শনের এই নিয়ম। পরে অবশ্য জেনেছিলুম, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নিয়ম ভঙ্গও করা হয়।

মামী বললেন ঃ চোখ জুড়িয়ে দেখেছি বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ, দু হাতে জড়িয়ে বাবার পায়ে মাথা ঠুকেছি প্রাণ ভরে। কেউ তো বারণ করে নি সেখানে !

মামীর কণ্ঠে যেন অভিমান ধরা পড়ল। মনে হল যে এমনি অভিমান আছে আমাদের অস্পৃশ্যদেরও।

মামী বললেন ঃ এত কষ্ট করে এত দূরে এসে এমনি দূর থেকে দেখেই ফিরতে হবে ! স্পর্শ করতে পাব না একটিবারও !

কেদারনাথে শুনেছি, বাবার বিরাট দেহের উপর যাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে চোখের জলে ভেসে যায়। মৃত্যুপণ করে সেই পাহাড়ে ওঠাব সকল জ্বালা যেন জুড়িয়ে যায় সেই হিমস্পর্শে। জল ঝড় তুষারপাত উপেক্ষা করে ক্ষুধাতৃষ্ণা রোগভোগ ভুলে সেই যে সংগ্রাম সকলের, তার পুরস্কার পায় হাতে নাতে। সেই পাথর জড়িয়ে মনে হয় যে জীবনের সব চাওয়া সবাই সেই দিনেই পেয়েছে। চাইবার বুঝি আর কিছু বাকি থাকে না।

কিন্তু আজ এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে মনে হল যে চাইবার জিনিস আজ দেখতে পেয়েছি চোখের সামনে। জীবন পূর্ণ হবে তাকে পেলে। উমা কি আজও তপস্যা করছেন !

এখানে নিজের হাতে বাবার মাথায় ফুল গঙ্গাজল চড়াবার অধিকার নেই কারও। এই দেবস্থানম পরিচালনার জন্য পাঁচজনের একটি কমিটি আছে। একজন বেতনভোগী ট্রাস্টি মাদুরায় থেকে মন্দিরের জমিদারি দেখাশুনা করেন। আর রামেশ্বরে তাঁর সহায়তা করেন একজন কোষাধ্যক্ষ আর একজন পেশকার। পূজারীরা বেতনভোগী ব্রাহ্মণ। বাবার পূজার্চনা অভিষেকাদি করবার রীতি পেশকারের কাছে নানা মূল্যের টিকিট কিনে—

তার রেট নির্দিষ্ট আছে। মামা মামী সেই টিকিট সমেত উপচার পূজারীর হাতে দিতেই আমাদের চোখের সামনে তা উৎসর্গ করে প্রসাদ ও নির্মাল্য ফিরিয়ে দিলে।

অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের পূজো হল। বাইশটি তীর্থম আছে শুনলুম মন্দিরের প্রাকারের ভিতর। তার মধ্যে কোটিতীর্থম আর সর্বতীর্থমের জল ছেটালুম মাথায়। যাত্রীরা দড়ি নামিয়ে কুণ্ডের জল তুলে মাথায় ঢালছেন।

পূর্ব গোপুর দিয়ে বেরিয়ে আমরা অগ্নিতীর্থমে এলুম। সমুদ্রের এই স্থানটিতেও স্নানের বিধি আছে। যাত্রীরা স্নানও করছেন অনেকে। আমাদের সঙ্গে কাপড় গামছা নেই, অবেলায় মামার সম্মতিও ছিল না স্বাতি শুধু আগ্রহ জানিয়েই নিরস্ত হল।

৩৩

রাত তখনও বেশি হয় নি। আমরা ক্লান্তির জন্যই একটু সকালে শোবার আয়োজন করছিলুম। পাণ্ডার এক লোক এসে খবর দিল যে রামেশ্বর আজ রূপোর রথে শোভাযাত্রা করে বেরিয়েছেন। কয়েকজন যাত্রী পাঁচ শো টাকা জমা দিয়ে এই উৎসব করাচ্ছেন। পাণ্ডা ভুলে গিয়েছিলেন এই সংবাদটুকু দিতে।

মামা তখন শুয়েই পড়েছিলেন। মামীও মুখে পান দিয়ে শোব শোব করছিলেন। স্বাতি উঠে বসল ধড়মড় করে। মামী চমকে উঠে বললেন ঃ যাবি নাকি এত রাত্তিরে ?

স্বাতি বলল ঃ এত রাত কোথায় মা !

মামা শুয়ে শুয়েই ব্যস্ত হলেন।

আমাকে দরকার স্বাতির। বলল ঃ ভয় পেলে নাকি গোপালদা ?

বললুম ঃ কোন ভয় থাকলে কি আর এত দূরে আসতুম !

মামা বললেন ঃ বেশি রাত কোরো না যেন !

স্বাতি বলল ঃ এখুনি ফিরে আসব বাবা।

তখন আমি জানতুম না যে এই যাওয়ার জন্যেই আমাদের আনন্দের মুহূর্তের উপর একটা কঠিন ছেদ পড়বে।

স্বল্পালোকিত রামেশ্বরের পথ তখনও প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে আছে। একটি মন্দির নিয়ে শহর। সেই মন্দিরে যখন উৎসব, তখন শহর ঘুমবে কোন্ লজ্জায় !

মন্দিরের দরজায় এসে আর এগনো গেল না। রূপোর রথ বেরিয়েছে পথে, তার ভিতর রামেশ্বরের সোনার ভোগমূর্তি। ফুলে মালায় আলোকে ও সজ্জায় উজ্জ্বল রথ। পথে পুণ্যার্থীর ঠেলাঠেলি, উল্লাস আর জয়ধ্বনি।

ভিড়ের তরঙ্গের ভিতর আমরাও মিলে গেলুম। অশান্ত অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ, বেরিয়ে আসবার পথ আর রইল না।

এক সময় মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ হল। রূপোর পাল্কীতে ব্রাহ্মণের কাঁধে চড়ে রামেশ্বর আবার মন্দিরে ফিরে এলেন। যাত্রীর ধাক্কায় কী ভাবে কোথা দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে এলুম জানি নে। নিজেকে দেখবার অবকাশ পেলুম, যখন বাবার শয়নারতি আরম্ভ হল। যাত্রীর স্রোতে তখন ভাঁটা পড়েছে। ভিড়ের ভিতর আমাদের ঠেলে দিয়েই পাণ্ডার লোক সরে পড়েছিল দেখেছিলুম। এবারে স্বাতিকেও নিজের পাশে খুঁজে পেলুম না। ওধারে মেয়েরা জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়, হয়তো তাদের সঙ্গেই সে ভিড়ে গেছে। ফেরার সময় খুঁজে নিলেই হবে।

এমন শয়নারতি কোথাও দেখি নি আমরা। ধূপে ধুনোয় বাদ্যে ও উদাত্ত স্বরে মন্দির-প্রাঙ্গণ ভরে গেল। চাতালের ওপর একটু স্থান পেয়েছিলুম। একটা থামে হেলান দিয়ে দেবতার মাহাত্ম্যে সারা দিনের ক্লান্তি আমি ভুলে গেলুম।

এক সময় আরতি শেষ হল। ব্রাহ্মণেরা বাবার ভোগমূর্তি পার্বতীর কাছে নিয়ে চললেন। বাজনার বিরাম নেই, ত্রুটি নেই আয়োজনের, আর কৌতূহলেরও সীমা নেই সমবেত যাত্রীর। প্রাঙ্গণের এক ধারে দোলায়মান মঞ্চের উপর পার্বতীর ভোগমূর্তি বিরাজ করছেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁরই পাশে রামেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করলেন।

এইটুকুর যেন নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। সারা দিন দেবতা ভক্তের পূজো নিয়েছেন। পার্বতীর দিকে তাকাবার অবসর ছিল না তাঁর। এইবারে কর্মক্লান্ত দেহে বিশ্রাম নিতে এলেন পার্বতীর কাছে। দেবতারও এই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কী প্রশান্ত পরিতৃপ্তি! দেহ মন যেন জুড়িয়ে গেল।

বাদ্যভাণ্ডের প্রবল সমারোহে সকালে ঘুম ভাঙল। চমকে জেগে উঠে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ক্লান্ত দেহে মন্দিরের চাতালেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মনে পড়ল যে শয়নারতি দেখবার জন্য এইখানে আশ্রয়

নিয়েছিলুম। আরও মনে পড়ল যে রাতে কারা যেন ঠেলাঠেলি করেছিল জাগাবার জন্য। ঘুমের ঘোরে তখন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। তারপর মনে পড়ল স্বাতির কথা। একা একা পথ চিনে হয়তো বেচারা ফিরে গেছে। আর মামা মামী আমার দায়িত্বহীনতার জন্য নির্মম ভাবে আমায় ভর্ৎসনা করেছেন। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল। তাড়াতাড়ি আমি উঠে পড়লুম।

ব্রাহ্মণেরা তেমনি সমারোহ করে রামেশ্বরের ভোগমূর্তি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন মূল মন্দিরে। যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি। এবারে আবার সারা দিন ধরে ভক্তের পূজো নেবার জন্য তাঁকে তৈরি হতে হবে।

আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হল না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ধর্মশালার উদ্দেশে পা বাড়িয়ে দিলুম।

মন্দিরে তখন যাত্রীর ভীড় হয় নি। দু ধারের দোকানও সব বন্ধ। রাস্তায় রোদ নেই, প্রভাতের আলোক স্পর্শে অন্ধকার দূর হয়েছে মাত্র।

মোড়ের মাথাতেই পাণ্ডার লোকেরা আমাকে ঘেরাও করে ফেলল এবং তাদের সম্মিলিত অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে গেলুম। উত্তরের যেন দরকার নেই কারও, প্রশ্ন করেই তাদের কর্তব্য শেষ। আর তাদের প্রশ্নেই পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা স্পষ্ট হয়ে গেল।

মামী অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে মামাকে ঠেলে তুললেন। সলা পরামর্শে আরও খানিকক্ষণ কাটল। শেষটায় মামা খুঁজে খুঁজে এলেন পাণ্ডার বাড়ি। যে লোকটি আমাদের নিয়ে এসেছিল তাকে ধরে আনা হল। পাণ্ডা বিচক্ষণ লোক। নিজে তদন্তের ভার নিয়ে মামাকে ধর্ম-শালায় পৌঁছে দিলেন, আশ্বস্ত হতে বললেন মামীকে। দেবতার স্থান এই রামেশ্বর এখানে চুরি ডাকাতি গুণ্ডামি নেই, নেই পাপাচারের ভয়। গভীর রাতে স্বাতিকে তারা ধর্মশালার কাছাকাছি পেয়েছিল, একই রাস্তায় ঘুরে মরছিল। আমার হদিশ পায় নি কোনখানে।

ভয়ে কাঠ হয়ে আছে সেই লোকটি, যে আমাদের ভিড়ের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল। সবাই এক মত হয়ে গেছে যে তার

রামেশ্বরের পাট এবারে উঠল। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন পাপিষ্ঠকে দেবস্থানমে থাকতে দিলে নাকি দেবতার অসম্মান করা হবে।

বারান্দাতেই অপেক্ষা করছিলেন মামা আর মামী। পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছেন পাণ্ডা নিজে। আমাকে দেখতে পেয়ে হাসি ফুটল পাণ্ডার মুখে, আকর্ণ দন্ত বিকাশ করে কী একটা নিবেদন করলেন গদগদ ভাবে। মামী উঠে গেলেন ঘরের ভিতরে।

খানিকটা এগোতেই খপ্ করে হাত ধরে যিনি আমায় ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন, ধাক্কাটা সামলে দেখলুম যে, তিনি আমাদের কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার। ইনি আমাদের গাড়িতে উঠেছিলেন গোদাবরী স্টেশনে। বিজয়ওয়াডা পর্যন্ত এক সঙ্গে এসেছিলুম। ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন ঃ বাঘের মুখে যাচ্ছেন অবলীলাক্রমে, প্রাণের মায়া নেই এতটুকু ?

বাঘের কানেও বোধ হয় সেই চাপা গর্জন পৌঁছল। বললেন ঃ বসুন এইখেনে।

এবারে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন ঃ কোথায় ছিলেন রাত্তিরে ?

পুরু পুরু ঠোঁটের ফাঁকে তাঁর নোংরা দন্তপাটিও যেন দেখতে পেলুম। কী একটা অভদ্র ইঙ্গিত ! ইচ্ছে হল একটা চড় কষে দিই তাঁর ওই খোঁচা-দাড়িওয়ালা ফুলো গালে।

দেখলুম উত্তরের প্রয়োজন নেই তাঁরও, সেটা যেন তাঁর জানাই আছে। বললেন ঃ বসুন একটু, আমি এখুনি আসছি।

বলে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বুঝতে পারি যে তিনি মামা মামীর মন্তব্য শুনতে গেলেন আড়াল থেকে, কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করবার উৎসাহ পেলুম না।

অল্পক্ষণেই ভদ্রলোক ফিরে এলেন। চোখে মুখে আনন্দের রেশটুকু তখনও লেগে আছে। তারপর তাঁর সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রথায় গল্প ফাঁদলেন। বললেন ঃ বিচিত্তির লোক মশাই আপনাদের সেই মৈত্তির।

ভদ্রলোক রেলের চাকর, সগুষ্টি পাস পায়, বেড়ায় কিনা একা একা! বলল, দ্বারকা গেছে, কামাখ্যা গেছে, গেছে কাশী বৃন্দাবন হরিদ্বার। রেল যায় অথচ যায় নি, এমন জায়গা নেই। কিন্তু সর্বত্র একা একা। বাড়িতে অগুনতি এঁড়িগেঁড়ি, তাদের পাহারায় রেখে আসে বউটাকে। সে বেচারীর শখ সাধ এ জীবনে কিছু মিটল না।

আমি অনাসক্ত, জীবনের প্রয়োজন যেন আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে।

হালদার বললেন ঃ গোপালবাবু ওই মৈত্তিরকে যদি আমি আগে থেকে চিনতুম তো ওর ওই পাসে আমার চোদ্দটা ছেলেমেয়ে সুদ্ধু পরিবারকেও নিয়ে আসতুম। বিচার নেই ভগবানেব, তাই অপাত্রে সুযোগ দেন।

একটা বিড়ি বাব করে দাঁতে কেটে আগুন ধরালেন। বললেন ঃ খাবার সুখও নেই পোড়া দেশে। সেই শেষ রাত্তিরে উঠে বসে আছি; এক ভাঁড় চায়েব অভাবে প্রাতঃকৃত্যের তাড়া পাচ্ছি না।

তারপর আবার বললেন মৈত্র মশায়েব কথা ঃ লোকটা ছুটি ফুরোবার ভয়ে ছুট দিল। বললুম এত কবে, তেরাত্তির বাস করবার রীতি এইখেনে, তার ওপর একটা না একটা উৎসব লেগেই আছে। বলল, বাবা মাথায় থাকুন, কন্যাকুমারী তাকে দেখতেই হবে। আরে বাবা, সব জায়গায় খাব্লাখাব্লি না করে একটা জায়গাই ভাল করে দেখ্।

বিরক্তি লাগছিল আমার, তবু আমি মেঝের উপরেই বসে পড়লুম দেওয়ালে হেলান দিয়ে। হা[illegible]ার যেন আরও একটু উৎসাহ পেলেন, বললেন ঃ কী নোংরা জাত মশাই এই মাদ্রাজীরা! চান করবে হপ্তায় একটি ছুটি দিন, কিন্তু পিট্‌পিটিনি আছে ষোল আনা। শুচিবায়ের মতো ছোঁয়ালেপা মশাই, মেয়ে পুরুষে তফাত নেই এতটুকু।

তারপর হাসলেন প্রাণ ভরে। মনে হল যে পাণ্ডাদের জনকয়েক লোক এসে দেখেও গেল আমাদের। বললেন ঃ নারকেলের তাড়ি শুনেছেন?

নিজেই উত্তর দিলেন ঃ শুনবেন কোথা থেকে! আপনারা ভদ্দরলোক, ছোটলোকদের সঙ্গে তো মিশতে লজ্জা করে আপনাদের! আমাদের বাপ ঠাকুরদা ইংরিজী পড়েন নি, ঘেন্না করতেন ম্লেচ্ছের ভাষা। বাইরের

লোকে কেউ ইংরিজী বললে কানে আঙুল দিতেন, আর ঘরের ছেলে-ছোকরা কেউ এ বি সি পড়লে প্রায়শ্চিত্তির করাতেন। তাইতেই আমরা ছোটলোকে আর বড়লোকে তফাত করতে এখনও শিখি নি।

পড়পড় করে কয়েকটা টান দিলেন বিড়িতে, তারপর বললেন ঃ এ দেশের লোকেরা নারকেলের তাড়ি খায়, আর রাতে জুয়ো না খেলে ঘরে ফেরে না।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ডাব খেয়েছেন এ দেশে ?

উত্তর চান না, বললেন ঃ কোথায় পাবেন ! নারকেলের গাছই আছে, তার মাথাগুলো কেটে কেটে হাঁড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে।

আমি তা দেখি নি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল না।

হালদার বললেন ঃ ব্যাটারা গরিব বড়। কিন্তু তাড়িও খাবে আর জুয়োও খেলবে। কিন্তু হ্যাঁ, মেয়েগুলো বেশ মন্দ। পর্দার ধার তো ধারেই না, বেপরোয়া চলে রাস্তা দিয়ে। কাছা দেয় পুরুষের মতো, আর কাছাহীন পুরুষগুলোকে ধাক্কা দিয়ে চলে। লেখাপড়াও নাকি জানে এরা।

আবার হাসলেন হালদার, এবারে বয়ে রয়ে রসিয়ে বসিয়ে। কী একটা পরম রসিকতার কথা মনে পড়েছে বুঝি !

মামার ঘর থেকে তলব আসে নি। বিচার হয়ে গেলে হয়তো হালকা লাগবে মনটা। চুপ করে সেই ক্ষণটির অপেক্ষা করতে লাগলুম।

হালদার বললেন ঃ এদিকে ন্যাড়ানেড়ীর নাচ দেখেছেন ?

নিজেই উত্তর দিলেন ঃ দেখবেন কোথা থেকে !

আবার হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। বললেন ঃ এক দল বোষ্টম বোষ্টমী চলেছেন বালাজীদর্শনে, পথে ভিক্ষে করতে করতে। ত্রিচির ছত্রে তাদের দেখলুম।

হালদারের হাসি যেন ফুরতেই চায় না। বললেন ঃ জড়াজড়ি করে সে কী নাচ ! সাহেব মেম হার মেনে যাবে তাদের কাছে। পুরুষদের মুণ্ডুর সামনেটা কামানো, গলায় মোটা তুলসীর মালা। মেয়েগুলোর খোঁপায় জড়ানো গোড়ের মালা, চন্দনে আর রঙে কী বিচিত্র মুখ ! ঘুরে ঘুরে

কোমর দুলিয়ে নাচছে ন্যাড়ানেড়ী, আর আনি দুআনি সিকি আধুলি পড়ছে ঝনঝন করে। ধন্যি এদের ভক্তিরস!

কতক্ষণে পরিত্রাণ পাব ভাবছিলুম। এর চেয়ে মামার বকুনি ছিল ভাল।

হঠাৎ বাহিরে পায়ের শব্দ পেলুম অনেকগুলি। একটু উঁচু হয়ে দেখলুম যে মামা মামী বেরিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে স্বাতি। সদলবলে পাণ্ডাও চলেছেন। একজন আমার খোঁজ করতে এল, জানতে চাইল আমিও মন্দিরে যাব কি না! বললুমঃ শরীর আর চলছে না।

হালদার উঠে গিয়ে তাঁদেব পিছন থেকে দেখলেন, তারপব ফিরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বসলেন বেশ ঘন হয়ে। গলাটা আবার নামিযে বললেনঃ ছেলেমানষি কবে নিজের ইহকালটি ঝরঝরে করলেন! অমন পয়সাওলা মামা, কোথায় আখেবে গুছোবেন, তা নয় সুন্দর মুখ দেখেই সব ভুললেন! ভদ্রলোক দুঃখ কবে বলছিলেন, ওই একটি মাত্র মেয়ে, সেও পব হয়ে যাচ্ছে অঘ্রান মাসে। ইচ্ছে ছিল যে ভাগনেকে নিজের ব্যবসায় লাগিয়ে কাছে এনে রাখবেন, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া সে কথা বুঝল না!

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব না'মিয়ে বললেনঃ আরে মশাই, নিজেব ভবিষ্যৎটা আগে গুছিয়ে নিন। সঙ্গতি থাকলে মেয়ে অনেক জুটবে বাঙলা দেশে।

কী ইতর অভদ্র ইঙ্গিত! ইচ্ছে হল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সত্যিই একটা চড় কষিয়ে দিই। কিন্তু কী আশ্চর্য! খোলা বিস্কুটের মতো মিইয়ে গেছে মনেব ভিতরটা। যেমন বসে ছিলুম, তেমনি বসেই রইলুম।

হালদার বললেনঃ পাত্রের খবর রাখেন কোন?

তাতে আমার প্রয়োজন কী!

হালদার বললেনঃ কথাটা বুড়ো চেপে গেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলুম যে কোথাও একটু গণ্ডগোল আছে। বিলেত-ফেরতা সাহেব পাত্তর, গায়ে বোধ হয় মেমের গন্ধ লেগে আছে। মনে হল যে বিয়ে পাকা করেছেন বুড়ী নিজে, কিন্তু বুড়োর মন যেন খচখচ করছে।

আমি চোখ বুজেছি কড়া করে, হালদার না থামলে আর খুলব না।

কী মশাই, ঘুমুলেন নাকি ?

আমি সাড়া দিলুম না। বুঝতে পারলুম যে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং প্রাতঃকৃত্যে যাবার আয়োজন করছেন। বেরবার আগে আর একটা কদর্য ইঙ্গিত করে গেলেন : সারা রাত্তির রাসলীলা করেছেন কেষ্ট ঠাকুর, ঘুমের আর দোষ কি !

৩৪

দুপুর বারোটার পরের গাড়িতে আমরা রামেশ্বর ত্যাগ করলুম। মামা আমাকেই টিকিট কাটতে দিয়েছিলেন। আমি তৃতীয় শ্রেণীরই টিকিট কেটেছি আমার নিজের জন্য। এবারে কেউ অসন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল না।

তবু বড় আশ্চর্য লেগেছে মামার ব্যবহার। তাঁর দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা দেখলুম না এতটুকু। মামী একটিও কথা বলেন নি।

মনমাদুরায় চা এসেছিল। স্বাতি সেই চা ঢালতে গিযে হেসেই আকুল, বলল ঃ কী কাণ্ড দেখ মা!

বলে টী-পটগুলো দেখাল। বড় বড় দুটো পটে দুধ, আর ছোট পটে কড়া লিকর। খানিকটা লিকর ঢেলে দুধ দিয়ে ভরতে হল সব পেয়ালা।

মামা বললেন ঃ এই এদের স্পেশাল চা! এ জানলে না হয় অর্ডিনারি চায়ের কথাই বলতুম।

দুধের কফি খেয়েছি, এ যেন দুধের চা খেলুম। ওয়ার্ধার চায়ের কথা মনে পড়ল। অনেক দিন আগে মহাত্মাজীর আশ্রম থেকে ফিরে এসে স্টেশনে চা খেয়েছিলুম। ছোট ছোট কফির পেয়ালায় চা। শুনেছিলুম যে তারা দুধের ভিতরে চায়ের পাতা ভিজিয়ে চিনি ঢেলে ছেঁকে দেয়। সেখানে দু আনার চায়ে গলা ভেজে না। এখানে সব চা আমবা শেষ করতে পারলুম না।

সন্ধ্যে ছটার পরে নামলুম মাদুরায়। এখানেও মাদ্রাজের মতো রিটায়ারিং রুম পাওয়া গেল দুটো। মামা বললেন ঃ তোমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। এই বেলা মন্দিরটা দেখে নেওয়া যাক।

মামী রুষ্ট হলেন, বললেন ঃ মন্দির দেখতে আমরা আসি নি, এসেছি ঠাকুর দেখতে।

মামা বললেন ঃ ওই হল, মন্দিরে না গেলে তো আর ঠাকুর দেখা হবে না।

সারা দিনের চেষ্টায় আমি একটু সহজ হবার চেষ্টা করেছি। স্বাতির মতো মনের জোর আমার নেই, তবু স্বাতির অনুকরণ করে খানিকটা বল সঞ্চয় করেছি। অপরাধ হয়েছে কর্তব্যে অবহেলার, তার বেশি কিছু নয়। মামা কিছু না বলেই যেন পরিস্থিতিটা ঘোরালো করে তুলেছেন।

রাগ হল হালদারের উপর। লক্ষ্মীছাড়া অমন ছিনিয়ে নিয়ে না গেলে সকালেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। বুকে কান্না নিয়ে মুখে যে হাসি ফোটে না।

ট্রেন থেকে নামবার সময় এক ছোকরা আমাদের সাহায্য করেছিল। কুলি ধরে মালপত্র উঠিয়ে দিয়েছে মাথায়। রিটায়ারিং রুমে উঠব জেনে তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মামা তাকে তাড়া দিয়েছেন বার কয়েক। লোকটা নাছোড়বান্দা। অসম্মানজ্ঞান তো নেইই, কতকটা বেহায়ার মতন। রেলের কর্মচারী ডেকে তাকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবারে বেরবার জন্যে ঘরের বাইরে বেরিয়েই সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। লোকটা আগের মতোই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

মামা আবার একটা তাড়া দিলেন। কিন্তু লোকটা একটুও বিচলিত হল না। কোন কথা না বলে আগে আগে চলতে লাগল। স্টেশনের বাহিরে বেরিয়ে একটা গাড়ি ধরবার জন্যে আলোচনা হচ্ছিল। লোকটা বলল ঃ সামনেই তো মন্দির, এটুকু হেঁটে যেতেই ভাল লাগবে। কিন্তু মন্দির খুব কাছে নয়। মামা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বললেন ঃ লোকটার কাণ্ড দেখেছ !

বাজারের পথ ধরে লোকটাকে অনুসরণ করেই আমরা মন্দিরের দরজায় এলুম। একটা দোকানে জুতো খুলে রাখতে বলল, তারপর আর একটি ব্রাহ্মণের হাতে সমর্পণ করে সে বিদায় নিল।

বিরাট একটি গোপুরমের নিচ দিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলুম। কিন্তু মন্দির কোথায় ! সামনেই যে একটা মস্ত উঁচু প্রাকার ! সাদা আর লালে ডোরা কাটা না হলে জেলখানার দেওয়াল বলে মনে হত।

ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল নয় এই ডোরা, এগুলি উপরে নিচে। দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরের দেওয়ালে এমনি সাদা ও লালের ডোরা। এই ডোরা দেখেই মন্দির বা পবিত্র স্থান চেনা যায় দক্ষিণ ভারতে।

দুই প্রাকারের মাঝে প্রশস্ত পথ পাথরে বাঁধানো। যাত্রীরা এই পথে যাতায়াত করছে। পশ্চিম গোপুরমের নিচে দিয়ে আমরা এসেছিলুম, এধার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের পথ নেই। দক্ষিণে আরও একটি গোপুর দেখতে পেলুম। তার সামনেই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ আছে। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মণ বললেন: না, এ পথে আমরা ভিতরে ঢুকব না।

বলে সোজা পূর্বদিকে এগিয়ে গেলেন।

মামা বললেন: গোটা মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করাবে নাকি?

কিন্তু উপায় নেই। ব্রাহ্মণের পিছনে আমাদের এগোতে হল। এদিকেও মস্ত গোপুর আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম যে একটি দুটি নয়, অনেকগুলি গোপুর আছে এই মন্দিরে। ব্রাহ্মণ বললেন: এই রকম গোপুর এই মন্দিরে নটি আছে। প্রত্যেকটিই সুন্দর।

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম এই মন্দিরে। সব গোপুরগুলি অন্যান্য মন্দিরের মতো পাথরের রঙের নয়, কালি ও স্যাওলায় বিবর্ণ হয়ে যায় নি কোন গোপুর। কোনটি সাদা ধবধব করছে, আবার কোনটি লাল রঙে সমুজ্জ্বল। গোপুরটি রঙীন নয়, রঙীন হল গোপুরের মূর্তিগুলি।

ব্রাহ্মণ আমাদের মন্দিরের বাহিরে আসতে বললেন। থমকে দাঁড়িয়ে মামী বললেন: এ আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

আগে বসন্ত মণ্ডপ দেখুন, তারপরে দেখবেন অষ্ট লক্ষ্মীর মণ্ডপ।

বসন্ত মণ্ডপ মন্দিরের বাহিরে একটি সুন্দর মণ্ডপ। নায়ক রাজাদের মানুষ প্রমাণ মূর্তি এই মণ্ডপে সাজানো আছে। সবাইকে চিনতে গেলে সময় লাগবে অনেক, আর ঠাকুর দেখতে এসে এই সব দেখা মামীর পছন্দ নয়। তাই আমরা এই মণ্ডপটি এক রকম না দেখেই ভিতরে চলে এলুম।

মন্দিরের এ ধারেও চওড়া রাস্তা, দোকান পাট ও যানবাহনে সচঞ্চল

হয়ে আছে। এ ধার দিয়েই যাত্রীরা আসছে বেশি। এটিই যে মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ তা আমাদের বলে দিতে হল না। আগে এ কথা জানা থাকলে আমরা এতটা পথ হেঁটে না এসে সাইকেল রিক্সায় আসতে পারতুম। মন্দিরের পশ্চিম দরজায় না নেমে পূর্ব দরজায় নামতে পারতুম অনায়াসে। স্বাতিও এই কথা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

মন্দিরের ভিতরে পা দিয়েই ব্রাহ্মণ বললেন ঃ এই দেখুন অষ্ট লক্ষ্মীর মণ্ডপ।

দুধারে তাকিয়ে দু সারি দোকান দেখতে পেলুম। স্বাতি বলল ঃ মণ্ডপ কোথায় ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ এই তো মণ্ডপ ! অষ্ট লক্ষ্মী দেখুন।

বলে মণ্ডপের থামগুলি দেখালেন। থামতো নয়, অষ্ট ঐশ্বর্যের অধিকারিণী আটজন লক্ষ্মী এই মণ্ডপের ছাদ মাথার উপরে ধারণ করে আছেন। দরজার দুধারে কার্তিক ও গণেশের সুবিশাল মূর্তি।

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ এই চিত্রগুলি দেখুন।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেওয়ালের গায়ে আমরা অনেকগুলি রঙীন চিত্র দেখতে পেলুম।

ব্রাহ্মণ বুঝিয়ে দিলেন এইসব চিত্রের কাহিনী। মীনাক্ষী দেবীর কাহিনীকে রূপ দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে। পুত্রলাভের আশায় শিবের আরাধনা করে বিজয়নগরের কোন রাজা কন্যালাভ করেছিলেন। এই কন্যার নাম মীনাক্ষী। মীনাক্ষী মানুষ হলেন মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো। তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন, রণসাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্য চালনা করেন। এক দিন সুন্দরেশ্বর শিব এলেন প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। তাঁকে দেখে বিহ্বল হলেন দেবী মীনাক্ষী। পরিণতি হল পরিণয়। মন্ত্র পড়লেন ব্রহ্মা ও নারদ, বিষ্ণু কন্যা সম্প্রদান করলেন। যথাসময়ে তাঁদের পুত্র সন্তান হল। তারই হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে দেবী ফিরে গেলেন শিবলোকে।

স্বাতি বলল ঃ কী রুচি দেখ এই লোকগুলোর ! এমন সুন্দর একটা

মণ্ডপে দোকান পেতে বসেছে ; কেউ না দেখিয়ে দিলে কি সাধারণ যাত্রীরা এসব দেখতে পায় !

মামা বললেনঃ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ নেই ! তারা কি এসব দেখতে পায় না !

কথা বলতে বলতেই আমরা এগিয়ে গেলুম। খানিকটা এগিয়ে আমরা বিস্ময়ে ও আনন্দে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। আলোয় ঝলমল করছে সমস্ত মন্দির, অসংখ্য প্রদীপ জ্বলছে। উৎসবের দিনে নাকি লক্ষ প্রদীপ জ্বলে এই মন্দিরে ! আজও কি কোন উৎসব আছে, না এ নিত্যকার রূপসজ্জা ! সাহেবদের একটা কথা আমার মনে পড়ল। মাদুরাকে তাঁরা উৎসবের শহর বলেন, এ সিটি অব ফেস্টিভাল্‌স্ !

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলুম, আর ব্রাহ্মণ এগিয়ে গিয়েছিলেন মামা ও মামীর সঙ্গে। একবার পিছন ফিরে দেখে স্বাতিও এগিয়ে গেল। তাঁদের পিছনে সোজা না গিয়ে আমি চারিদিকটা ঘুরে দেখে নিলুম।

বাঁয়ে একটা মণ্ডপে মন্দিরের হাতিশালা, গোটা কয়েক হাতি আছে উৎসবের জন্য। একটা বারান্দার দেওয়ালে অপরূপ চিত্র দেখলুম। নানা রঙের এই চিত্রগুলি দেওয়ালের গায়ে আঁকা। এগুলি কত দিনের পুরনো তা জানি নে, কিন্তু নতুনের মতো মনে হচ্ছে। যত্ন করে এই চিত্রগুলি দেখবার চেষ্টা না করে আমি মন্দিরের পরিকল্পনাটি বোঝবার চেষ্টা করলুম। এ কাজে আমার বেশি অসুবিধা হল না। স্পষ্ট ভাবেই দেখতে পেলুম যে দুটি বিরাট মন্দির আছে পাশাপাশি, একটার গায়ে আর একটা। পূর্ব দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে যদি আমরা সোজা এগিয়ে যাই তো সুন্দরেশ্বর শিবের দর্শন পাব। ডান হাতে পড়বে হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ। এখন তাকে আর্ট গ্যালারিতে পরিণত করা হয়েছে, আট আনা দর্শনী দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়।

মীনাক্ষী মন্দির এরই উত্তরে। শিবের মন্দির থেকে সে মন্দিরে যাবার পথ আছে। আবার দক্ষিণের দ্বার দিয়ে ভিতরে এলে প্রথমেই পাওয়া যাবে সেই মন্দির, আর প্রবেশ পথের ডান

হাতেই একটি সুন্দর জলাশয়। তার চারিধারের ঘাট পাথর দিয়ে বাঁধানো।

আমি অনেক জায়গায় দাঁড়ালুম, অনেক অপরূপ শিল্পকলা দেখলুম। মন্দিরের থামগুলি তো শুধু পাথরের থাম নয়। প্রমাণ মানুষের চেয়েও বড় মূর্তি। কোনটি দেবদেবীর, রূপকথার জন্তু জানোয়ারের মতো দেখতে কোনটি। শিবেরও অনেক মূর্তি আছে, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের মূর্তি দেখে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। শুনেছিলুম যে এই মন্দিরে একটি সপ্তসুরের স্তম্ভ আছে, তার উপর ও নিচে কারুকার্য করা আর মাঝখানটা ফাঁপা। সাতটি সরু সরু থাম পাশাপাশি এমন ভাবে চেঁচে কুঁদে বার করেছে যে তাদের গায়ে আঘাত করলে সাতটি সুর বাজে। সেই থামটি বাহিরে না হাজার স্তম্ভের মণ্ডপে, তা আমার জানা ছিল না। কাউকে জিজ্ঞাসা করে সে কথা জেনে নেবারও সুযোগ পেলুম না। দেরি হয়ে গেছে ভেবে সুন্দরেশ্বর মন্দিরে গর্ভগৃহের দিকে এগিয়ে গেলুম।

দেবতার নিকটে যাবার নিয়ম নেই। দূর থেকে আমি দেখলুম সুন্দরেশ্বর শিব। দেবরাজ ইন্দ্র নাকি এই শিবের প্রথম পূজা করেছিলেন। আর প্রথম মন্দিরটিও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে। স্থল পুরাণে এই গল্পটি আছে। অপ্সরা পরিবৃত ইন্দ্র গুরুর আগমন জেনেও তাঁকে সম্মান করেন নি। এই অবজ্ঞা দেখে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁকে পরিত্যাগ করে তপস্যার জন্য চলে যান। ক্রিয়াকর্ম লোপ হচ্ছে দেখে ইন্দ্র ব্রহ্মার পরামর্শে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে গুরুপদে বরণ করেন। এই বিশ্বরূপ যজ্ঞের সময় তাঁর মাতৃকুলের দৈত্যদের জন্যও আহুতি দিয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁকে বধ করেন। ইন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ত্বষ্টা দ্বিতীয় পুত্র বৃত্রকে লাভ করেন যজ্ঞাগ্নি দেখে। প্রবল যুদ্ধে ইন্দ্র এই বৃত্রকেও বধ করেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল দেবরাজের। এই পাপ ক্ষালনের জন্য তিনি ত্রিভুবন পর্যটন করে মাদুরার কদম্ব বনে আসতেই তাঁর পাপ ক্ষালন হয়। পরম বিস্ময়ে ইন্দ্র দেখলেন যে কদম্ব বনে আছেন সুন্দরেশ্বর শিব। তাঁরই দয়ায় তিনি পাপমুক্ত হয়েছেন, তাই পূজা করলেন শিবের, আর বিশ্বকর্মাকে ডেকে দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ করে দিলেন।

মাদুরায় প্রবাদ আছে যে এখনও দেবরাজ ইন্দ্র বৈশাখী পূর্ণিমায় আসেন সুন্দরেশ্বরের পূজা করতে। মাদুরায় তাই প্রতিবছর বৈশাখের শুক্লপক্ষে দশদিনব্যাপী উৎসব চলে আসছে।

মামা মামীকে দেখতে না পেয়ে আমি ফিরে আসছিলুম। দেখলুম যে তাঁরা হাজার স্তম্ভের মণ্ডপের দিক থেকে আসছেন। মামা বললেন ঃ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

স্বাতি বলল ঃ সব চেয়ে ভাল জায়গাটিই তোমার দেখা হল না।

মামা বললেন ঃ দেখে এস তাড়াতাড়ি।

আমি বললুম ঃ বাহিরে দাঁড়িয়েই ভিতরটা দেখে নিয়েছি। কতকটা একই রকমের এক হাজার স্তম্ভ আছে ঐ মণ্ডপটিতে।

স্বাতি বলল ঃ পনরটা কম।

নিঃশব্দে মামী এগিয়ে গেলেন মীনাক্ষী মন্দিরের দিকে। কী অপরূপ এই মন্দিরের সজ্জা! কী অপরূপ দেবীর রূপ! আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

বিশালতায় এই মন্দির শ্রীরঙ্গমের চেয়ে ছোট হতে পারে, কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্যে যে অদ্বিতীয় তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

এক সময় ব্রাহ্মণ বললেন ঃ এতক্ষণই যখন রইলেন, তখন আর একটু অপেক্ষা করে যান। মায়ের শয়নারতি শুরু হতে আর দেরি নেই।

মামী জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী হয় তখন ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ আরতি শেষ হলে সুন্দরেশ্বর স্বামীর ভোগমূর্তি পাল্কীতে করে আনা হবে মায়ের কাছে। আসবার সময় প্রত্যেকটি স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে একবার করে আরতি হবে। মায়ের নামে যাঁরা প্রচুর দান করেছেন, তাঁদের স্মরণ করা হয় প্রতি দিন। আগে এই সময় দেবদাসীর নৃত্য হত, আজকাল তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সানাই বাজে, আর উৎসবের দিনে পুরুষ গায়কেরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দিয়ে সেই অভাব পূরণ করেন।

মামী বললেন ঃ কত দেরি আছে তার ?

স্বাতি কঠিন ভাবে বলল ঃ আর আমি শয়নারতি দেখব না।

মন্দিরের বাহিরে বেরিয়েই সেই ছোকরাকে দেখা গেল। লোকটা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের।

মামা আবার একটা ধমক দিলেন। বললেন ঃ ব্যাটার কোন বদ মতলব নেই তো?

আমাদের ক্লান্ত দেখে খানকয়েক সাইকেল-রিক্সা যোগাড় করে দিল। দোকান থেকে জুতো সংগ্রহ করে উঠে বসতেই আমার পাদানিতে উঠে বসল অবলীলাক্রমে। স্টেশনে নেমে বলল ঃ তিনখানা রিক্সা, বারো আনা পয়সাই যথেষ্ট।

চার আনা তারা বকশিশ নিল। মামা এই ছোকরাকেও দিলেন একটি টাকা। বললেন ঃ ফের এলে—

বলে তাঁর লাঠি দেখালেন।

লোকটা নমস্কার করে স্টেশনের ভিতর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

রাতে মামার সঙ্গে এক ঘরে শুতে হল। একখানা দৈনিক হিন্দু নিয়ে তামিল ফর এভ্রিবডি থ্রু দি রোমান স্ক্রিপ্ট্ পড়বার চেষ্টা করছিলুম। ইংরেজীতে নেই এমন দুটি শব্দ আরও আছে—dh আর th, টেবল অফ সাউণ্ডে তাদের উচ্চারণ দেন আর থিনের মতো। তাতেও তফাত আছে। সঠিক উচ্চারণ করতে উপরের দাঁত মাড়ির সঙ্গে জিভে চাপ দিতে হবে, তারপর টেনে নিতে হবে জিভ। dhএর জন্য জিভ টানতে হবে মোলায়েম ভাবে, এবং thএর বেলায় জোরের সঙ্গে।

মামা বিছানায় বসে গভীর ভাবে পাইপ টানছিলেন। আর আমি রোমান অক্ষরে তামিল পড়ার চেষ্টা করছিলুম।—

Pern : en Karuthu · varai ponnāl en mel Kuvithālum, nān avanuku manaiviyāha pōhirathillai!
মানে, মেয়েটি বলল, আমার গলা পর্যন্ত সোনায় ঢেকে দিলেও আমি তার বউ হতে যাচ্ছি না।

খট্ করে কানে লাগল কথাটা। মনে পড়ল হালদারের কথা। লোকটা এমনি একটা দুর্ঘটনার আভাস দিচ্ছিল যেন। পৈতে পুড়িয়ে গোয়েন্দা হলে ভদ্রলোক নাম করত অল্প আয়াসে।

মামা বললেনঃ গোপাল, কী পড়ছ?

মুখের উপর থেকে কাগজখানা সরিয়ে বললুমঃ খবরের কাগজ।

মামা আরও খানিকটা ধোঁয়া নিলেন মুখে, আরও খানিকটা ছাড়লেন। তারপর বললেনঃ কাজটা ভাল কর নি। তবে অমন মন মরা হয়ে থাকা তো উচিত নয়।

আমি উত্তর দিলুম না।

মামা বললেনঃ দু দিন বাদে বিয়ে করে সংসারী হবে। ছেলে বউ নিয়ে রথযাত্রার মেলা দেখতে গিয়ে তাদের হারিয়ে এলে তো চলবে না!

বললুম না যে সেই ভয়েই বিয়ের নামে আজও ডরাই।

মামা বললেনঃ তোমার মামী বড় আঘাত পেয়েছেন। ভয় পেয়েছেন তার চেয়েও বেশি। ধর্মশালায় কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারকে দেখলুম। ধর্মের নামে অধর্ম করে হাত পাকিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া মন্ত্রের নামে নিন্দে ছড়ায়, আর ধর্মসভায় পরচর্চা করে। দেশে ফিরে যা দুর্যোগ আনবে, তাই ভেবেই মরে যাচ্ছেন তোমার মামী।

আমার বলার কিছু নেই।

মামাই আবার বললেনঃ দেশের রুচি জান তো আজকাল। নীতিবাক্য কেউ শোনে না, দুর্নীতির গল্প শুনতে আসে ভিড় করে। পাড়ায় কীর্তন হবে শুনলে পুলিসে খবর দেয়, আর বিড়ির বিজ্ঞাপন নিয়ে মেয়ে বেরিয়েছে শুনলে বড় রাস্তাতেও গাড়ি আটকে যায়। এ দেশে মুখরোচক মিথ্যে কেউ যাচাই করে দেখে না বলেই তোমার মামীর এই ভাবনা।

এবারে আমি লজ্জা পেলুম।

পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মামা বললেনঃ নেভার মাইণ্ড ইয়ংম্যান। আমি তোমার নিন্দা করি না। তবে—

একটু থেমে বললেনঃ তোমার মামীকে একটু সমঝে চোলো।

নিঃশব্দে আমি তাঁর আদেশ মেনে নিলুম।

১৫

সকালবেলায় হালকা বোধ করলুম অনেকটা। প্রাতরাশ এসেছে মামীর ঘরে, স্বাতি এসে ডেকে গেল। চায়ের টেবিলের পাশে চেয়ার নিয়ে মামা গভীর মনোযোগে কাগজ পড়ছেন। আমার আগমন যেন টেরই পান নি।

মামীর চুল আঁচড়াতে আজ দেরি হয়ে গেছে। এবারে কাপড় গামছা কাঁধে ফেলে স্নান করতে গেলেন।

হঠাৎ কাগজ পড়া শেষ হল মামার, ভাঁজ করে রাখলেন টেবিলের এক ধারে। বললেন ঃ তুমি তো ইতিহাসের ছাত্র ছিলে গোপাল, কিন্তু মাদুরার ইতিহাস তো এখনও শোনালে না।

স্বাতি বলল ঃ ওই নীরস শাস্ত্র জানার দেমাক আছে তো খানিকটা, না সাধলে শোনাবে কেন ?

পরিস্থিতিটা যেন বেশ সহজ হয়ে গেছে। বললুম ঃ ইতিহাস জিনিসটা বড় বেয়াড়া স্বাতি, বললে ক্লান্তি আসে একঘেঁয়েমির জন্যে, আর না বললে গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গুণী লোক তাই বলেন, ক্ষীরং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু। অর্থাৎ ইতিহাসের গল্পটুকুই শুধু শুনব— জাহানারার রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ বাদ দিয়ে তার আত্মদানের কাহিনীটুকু। কিন্তু সবটা নিয়ে হল ইতিহাস। যেমন ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের ভূমিকা সম্বলিত কবিতা গুচ্ছের কবি নন, তিনি সিলেকশনটুকু নয়, রাশীকৃত রাবিশেরও কবি। তাঁর ক্ষমতা ও দুর্বলতা, তাঁর রস ও রসানুভূতির অভাব, এ সমস্ত নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ। কাজেই সন-তারিখ-কণ্টকিত নীরস তথ্য হলেও ইতিহাসের যে দাম, বট-তলার নভেল আর রোমহর্ষণ গোয়েন্দা-কাহিনীর জনপ্রিয়তা দিয়ে তার যাচাই হয় না।

চায়ের একটা পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে স্বাতি বলল ঃ ভূমিকাটি ভাল লাগল।

বললুম ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে তিন ভাই তিনটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন —পাণ্ড্য চোল আর চের। আর এই পাণ্ড্য রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ আমরা পাই সিংহলের বৌদ্ধ ক্রনিক্‌লে। খ্রীষ্টের জন্মের তিন শো বছর আগে মেগাস্থিনিস এসেছিলেন এ দেশে। তিনি এই পাণ্ড্য রাজ্য দেখেছেন ভারতেব সর্ব দক্ষিণে, মুক্তার দেশ বলে উল্লেখ করতে ভোলেন নি তাঁর লেখায়। এখন যে মাঝে মাঝে রোমান মুদ্রা খুঁজে পাওয়া যায় এ দেশে, তাতেই স্ট্র্যাবোর কথার প্রমাণ হয়। স্ট্র্যাবো বলেছেন যে রোমানদের সঙ্গে পাণ্ড্য রাজ্যের ছিল বাণিজ্যের সম্বন্ধ। আর সম্রাট অগাস্টাসের রাজ্যে ছিল পাণ্ড্যরাজেব দূতাবাস। প্রথমে করকাইএ ছিল তাঁদের রাজধানী, তারপর এই মাদুরাতে রাজারা উঠে এলেন রাজ্যের মাঝখানে উঠে আসবেন বলে। উত্তরে চোল আর দক্ষিণে সিংহলীদের সঙ্গে এদের লড়াই লেগেই থাকত। দু হাজাব বছরেও ক্ষুণ্ণ হয় নি এদের প্রতিপত্তি। মাত্র চাব শো বছর আগে বিজয়নগরের রাজারাই প্রথম এই রাজ্য দখল করেন। পাণ্ড্য রাজারা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। দীর্ঘ দিন ধরে তামিল সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এই রাজ্য। সঙ্গম-সাহিত্য বলে আজও খ্যাত যে প্রথম তামিল রচনা, তা এই রাজসভার কবিদের লেখা। মাদুরা-সঙ্গম বলে তাঁরা যে অ্যাকাডেমি স্থাপন করেন, তার চেয়ে পুরনো প্রতি-ষ্ঠানের উল্লেখ পাই নি কোনখানে।

স্বাতি বলল ঃ এ কথা তো বলেছ একবার!

কিন্তু তার উত্তর দেবার আগেই বাথ রুমের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। মামা খববের কাগজখানা আবার টেনে নিলেন, আমি মন দিলুম চায়ের পেয়ালায়। স্বাতি হেসে উঠল খিলখিল করে। তার সাহস দেখাবার ভঙ্গি দেখে গা জ্বালা করে।

স্টেশনের বাহিরে বেরিয়েই সেই ছোকরার দেখা পাওয়া গেল। আমি ভেবেছিলুম যে আজও হয়তো সে একটা প্রচণ্ড ধমক খাবে। কিন্তু মামার ভাব দেখে মনে হল যে তিনি তাকেই যেন খুঁজছিলেন। বললেন ঃ ফের পেছু নিয়েছ?

আজ মন্দির দেখা হল সকাল সকাল। মামী পুজো করলেন। দেখবার আরও জিনিস আছে এখানে—তিরুমল নায়কের প্রাসাদ, টেপ্পাকুলম, আলাগার কয়েলে বিষ্ণুমূর্তি, আব তিরুপরানকুণ্ড্রমের সুব্রহ্মণ্য-মন্দির। তারপব আছে শাড়ি কেনা। মাদুরার শাড়ি বলতে কলকাতার মেয়েরা এক সময় মূর্ছা যেতেন, আজকাল স্বাতি নাক সেঁটকায় দক্ষিণের মোটা শাড়ি দেখলে।

মন্দিরের ব্রাহ্মণ এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। দক্ষিণার অঙ্ক মোটা করবার মানসে অযথা ঘোরান একই রাস্তায় বাবে বারে: এই সেই এক হাজার স্তম্ভের মণ্ডপ, আব সেই পোট্রামারাই, ইংরেজীতে যাকে আমরা গোল্ডেন লোটাস ট্যাঙ্ক বলি। কত শিল্পী আব ঐতিহাসিক যে এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন, তাব হিসেব নেই। মীনাক্ষী মন্দিরের উল্টো ধাবে বসন্ত মণ্ডপম্ দেখবেন না?

দোকানে জুতো রাখবার রীতিটি এদের ভাল। এ বেলায় জুতো সংগ্রহ করতে গিয়েই ফাঁদে পড়া গেল। বিচিত্র বর্ণবিভায় উজ্জ্বল এই দোকানগুলি যেন মেয়ে-খদ্দেব ধরবার ফাঁদ পেতেই বেখেছে। এবারে স্বাতির পছন্দ হল ব্লাউসের কাপড়। মোটা সিল্কের উপর ঝকঝকে জরির নানা কারুকার্য। নানা রঙের কাপড় নিল এক এক গজ করে। বলল: শাড়ি পাতলা না হলে যেমন বেমানান দেখায় তেমনি ব্লাউস মোটা না হলে সুরুচির অভাব আছে মনে হয়।

এবারে আমরা তিরুমল নায়কের প্রাসাদ দেখতে যাব। সেই ছোকরাটি আমাদের গাড়ির ভাড়া ঠিক কবে গাড়িতে তুলে দিল। নিম্ন স্বরে বলল: আপনারা যেমন শাড়ি খুঁজছেন, তা পাবেন গোবিন্দা-ইয়ারের দোকানে। তারা কলকাতায় ব্যবসা করে কিনা, আপনাদের পছন্দ জানে। যেখানে যাবেন তার কাছেই দোকান।

মামা আরও কিছু বকশিশ দিলেন তাকে।

মাদুরায় নায়ক বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বনাথ নায়ক। বিজয়

নগরের রাজা এঁকেই মাদুরার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর ধ্বংস হয়ে যাবার পরে এঁরা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। তিরুমল নায়ক এই বংশের একজন কৃতী রাজা। তাঁর সময়েই মাদুরাব সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। তাঁর রাজত্বকাল ১৬২৩ থেকে ১৬৫৯ পর্যন্ত। যে প্রাসাদটি আমরা দেখতে এলুম, সেটি তিনি নিজের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। মধ্য যুগের হিন্দু স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর বিশালকায় থাম আর স্টাকোর কাজ সত্যিই অপূর্ব। এমন একটি সৌধে জাদুঘর কিংবা আর্ট স্কুল না খুলে সরকাবী দপ্তর বসাল কেন, সেই কথা ভেবে আমরা আশ্চর্য হলুম।

দশ-বারো বছরেব একটি ছোকরা পেছু নিয়েছিল। বলল: মাদুরার ছবি পাওয়া যায় এইখানে

বলে ফটকের পাশের একটি লোককে দেখিয়ে দিল। একখানা বড় ফ্রেমে অনেকগুলি ছবি এঁটে সে বসে আছে। তাই দেখে পছন্দ করলেই ভেলক্স কিংবা লুপেক্সেব বাক্স থেকে খদ্দেরকে বার করে দিচ্ছে তার পছন্দের ছবি।

এবারে আমরা সুব্রহ্মণ্য মন্দির দেখব কি আলাগার কয়েল্ যাব তাই ভাবছি। ছোকরা বলল: মাদুরার এই তো বড়বাজার। এখান থেকে সব জায়গায় যাবার সুবিধে।

শাড়ির দোকানের কথা মনে পড়ল মামীর। জিজ্ঞেস করলেন: গোবিন্দাইয়ারের দোকানটা কোথায়?

ছোকরা বলল: এই সামনেই।

স্বাতির জন্যে একখানাও শাড়ি কেনা হয়নি বলে মামী বললেন: দেখেই যাওয়া যাক তা হলে।

চলতে চলতে মামা জিজ্ঞেস করলেন: কেমন লোক গোবিন্দাইয়ার?

নিস্পৃহ ভাবে ছোকরা বলল: আর পাঁচটা দোকানের মতো দরাদরি নেই বলে লোকে পছন্দ করে বেশি। আর কলকাতা-বোম্বাইয়ে তার কারবার আছে, তাই পছন্দ ভাল।

পথ আর ফুরোয় না। অধৈর্য হয়ে মামা বললেন: আর কত দূর?

ছোকরা বলল ঃ ওই বাড়িটা পেরিয়েই।

যে বাড়িটা দেখাল বলে মনে হল, সেটা নয়, রাস্তাও একটা পেরতে হল।

আকাশে আজ ঘনঘোর ঘটা। শির শির করে হাওয়া বইছে। জল নামল বলে। বিরক্ত হয়ে মামা বললেন ঃ রাখ তোমার গোবিন্দা-ইয়ার, একটা গাড়ি নিয়ে ফিরেই যাই।

শিপ শিপ করে জল শুরু হল। সেই ছোকরা একটা দোকানের দরজার উপরকার ত্রিপল সরিয়ে বলল ঃ আসুন ভেতরে।

আমবা ভিতরে এলুম। ছোকরা তার মুখখানা একবার দেখিয়েই আড়ালে গিয়ে বসল। বাহিরে তখন বর্ষা নেমেছে প্রবল ভাবে।

শাড়ি পছন্দ হল না মামারও। এর চেয়ে ভাল শাড়ি নাকি কলকাতাতেই পাওয়া যায় এমনি দামে, কিন্তু বসতে হল প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি—শাড়ির জন্য না হোক, বৃষ্টির জন্য। শেষটায খেসারত দেবার মতো মনোভাব নিয়ে খানকযেক সুতোর শাড়ি কিনলেন। স্বাতি বলল ঃ এগুলো মন্দেব ভাল। পাতলা আছে। কলকাতাব গরমে পরে আরাম হবে।

ভদ্রলোক অনেক যত্ন করে অনেক শাড়ি দেখিয়েছেন। এখানে শাড়ির কেনা-বেচার রীতি আলাদা। শো-কেস নেই টেবিলের মতো, তার সামনে নেই সারি সারি চেয়ার। দোকানীরা ভিতরে দাঁড়িয়ে টেবিলে ফেলে শাড়ি দেখায় না। এখানে ঘর-জোড়া শীতলপাটির মতো, মাদুর বিছানো। তার উপরে নতুন কাপড় কিংবা বেড কভার বিছিয়ে দামী শাড়ি বার করে বাক্স থেকে। সাধারণ কাপড় থাকে দেওয়ালের গায়ে বসানো কাঠের আলমারিতে।

প্রশস্ত ঘরের স্থানে স্থানে মহিলাবা বসেছেন ইতস্ততঃ। পরনে জমকালো সিল্কের শাড়ি। বাড়িতে কাচার দাগ আছে তাতে। নাকে আর কানে হীরের ফুল। খোঁপায় বেলফুলের মালা। সঙ্গে নেই শুধু পুরুষ মানুষ।

আমাদের পাশের ভদ্রমহিলা শাড়ি কিনলেন দুখানা—দু শো আর

আড়াই শো টাকা দামের। কোমর থেকে খান পাঁচেক এক শো টাকার নোট বার করে দিলেন। স্বাতি বলল: আমাদের দেশে বিয়ের উৎসব মিটে গেলে নতুন কনেও এ শাড়ি পরবে না।

দোকানীরা কি বাঙলা বোঝেন! বললেন: নিজের জন্যেই এই শাড়ি নিলেন। রোজকার ব্যবহারের জন্য বেশ টেঁকসই হবে।

মামী তাকালেন মামার মুখের দিকে।

শুনেছি যে এ গরিবের দেশ। এই কি তার নমুনা! কলকাতায় মাদ্রাজী বন্ধু আছে আমার। বড় মিতব্যয়ী তারা। খাদ্য তাদের নিতান্ত সরল, লজ্জা নিবারণ হলেই পরিধেয় হল, আর প্রসাধনের মধ্যে শুধু ফুল। যাদের সঙ্গতি আছে, তাদের মেয়েরা কাঞ্চীব কাপড় পরে আর নাকে হীরের নাকছাবি।

মামীর বোধ হয় লজ্জা হল পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করতে। বারে বারে বললেন: পছন্দমতো কিছুই পেলুম না এখানে।

দোকানী বলল: আমার ভায়ের দোকান আছে সামনে। তার কাছেও খাঁটি জিনিস পাবেন।

মামা ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: আর হাঁটতে পারব না আমি।

দোকানী বললেন: হাঁটবেন কেন? এই সামনেই দোকান, আমাব লোক আপনাদের পৌঁছে দেবে।

স্বাতি বেঁকে না বসলে আমাদের আরও ঘুরতে হত।

সেই ছোকরা দোকানের চাতালে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। লাফিযে নেমে রিক্সা ডাকতে গেল। রিক্সায় তুলে দেবার সময় বলল: এ দোকানের রেশমি শাড়ি তত ভাল নয়, সে হচ্ছে—

মামা এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিলেন। পাকামি করতে গিয়ে তার বকশিসটাই মারা গেল। তবু সে আমার পাদানিতে চেপে স্টেশন পর্যন্ত এল, তারপর ঘুরে ফিরে দেখে গেল জায়গাটা।

বেলা অনেক হয়েছিল। শহর দেখার বিলাস ত্যাগ করতে হয়েছিল জৈবিক প্রয়োজনে। রিটায়ারিং রুমে না গিয়ে আমরা রেস্তোরাঁয় এসে

বসলুম। সবই দোতলায়। বারান্দা থেকে শহরের দৃশ্য দেখা যায় সুন্দর ভাবে। কাল রাতে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম অনেকক্ষণ ধরে। একটার পর আর একটা বিজ্ঞাপন চক্রাকারে এসেছে চোখের সামনে, তারপরে সরে গেছে। একটি বিজ্ঞাপন আবার কতক্ষণ পরে ফিরে এসেছে তা বুঝতে পারি নি।

একটা টেবিলের চারদিকে চারজন বসে ছিলুম। মামা বললেনঃ আমাদের ফেরার গাড়ি কখন?

স্বাতি বললঃ আমরা তো কন্যাকুমারী যাব।

মামা কোন উত্তব দিলেন না। কন্যাকুমারী যাবার প্রস্তাব তিনি কাল নিজেই করেছিলেন। এই টেবিলে বসেই বলেছিলেন যে সকালের এক্সপ্রেস ট্রেন ধরলে সন্ধ্যাবেলাতেই ত্রিবেন্দ্রাম পৌছনো যাবে। কিন্তু মামী বেঁকে বসেছিলেন, বলেছিলেনঃ কী ম্লেচ্ছের মতো কথা! এতবড় একটা তীর্থস্থানে এসে শিবের মাথায় একটা ফুলবেলপাতা দেবার ইচ্ছা নেই কারও?

হার মানবার পাত্র নন মামা, বলেছিলেনঃ চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে যাত্রীর মাথায় ফুলবেলপাতা দিও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সকালে ত্রিবেন্দ্রাম যাত্রাব সংকল্প ত্যাগ করতে হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যে বিকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমরা যাত্রা করব, আর ভোর বেলায় পৌছব ত্রিবেন্দ্রাম। আর একটা ফন্দি আমার মাথায় এসেছিল, কিন্তু সে কথা বলার সাহস পাই নি। কন্যাকুমারী যাবার দ্বিতীয় পথ হল তিরুনেলভেলি হয়ে। সে পথে গেলে তিরুচেন্দুরে সুব্রহ্মণ্য মন্দির দেখারও একটা সুযোগ পাওয়া যেত। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল সকৌতুকে, কিন্তু নিজে কোন কথা বলে নি।

মামী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন মামার জন্যে, তারপরে নিজেই বললেনঃ এখন সে ব্যবস্থা করলে দোষ কী!

মামা এইবারে মুখ খুললেনঃ বললেনঃ সারা রাত বসে যাবে কে?

মানে রিজার্ভেশনের প্রশ্ন। সকালবেলায় মন্দিরে যাবার আগে আমরা কোন ব্যবস্থা করি নি। অভিমানেই বোধহয় মামা এ কথা মনে করিয়ে

দেন নি। কিন্তু এখন আমি তার সুযোগ নিলুম। বললুম ঃ একটা কাজ করা যেতে পারে।

কী?

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

সসঙ্কোচে আমি বললুম ঃ তিরুনেলভেলি হয়েও কন্যাকুমারী যাওয়া যায়। সে পথে গেলে রিজার্ভেশনের দরকার নেই।

কী রকম?

বললুম ঃ ঘণ্টা ছয়েকের পথ তো, দুপুরের কোন ট্রেন ধরলে রাতেই পৌঁছনো যাবে।

তারপর?

সকালে কন্যাকুমারীর বাস ধরা। পথ শুনেছি প্রায় সমান।

রাতে থাকবে কোথায়?

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন। আমি বললুম ঃ স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে কিনা সে খবরও জেনে নেব।

কিন্তু মামা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

খেয়ে দেয়ে আমি একাই নিচে নামলুম, স্বাতিকে মামী নামতে দিলেন না। বললেন ঃ জিনিসপত্র গোছাতে হবে, তুমি থাক।

নিচে নেমেই আমি তিরুনেলভেলির ট্রেনের খবর পেলুম। তুতি-কোরিনের ট্রেন আসছে, দুটোর পরেই ছাড়বে। মনিয়াচি নামে একটা জংশন স্টেশনে গাড়ি বদল করে রাত সাড়ে আটটাতেই তিরুনেলভেলি পৌঁছনো যাবে। স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও আছে, সেখানে ভিড় হয় না।

ট্রেন আসবার আর দেরি নেই বলে আমি তাড়াতাড়ি উপরে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এক বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে আটকালেন, বললেন ঃ মাদুরা দেখা আপনাদের হয়ে গেল?

সংক্ষেপে বললুম ঃ হ্যাঁ।

আলাগার কইল দেখেছেন?

না।

ইস্, কী দেখেছেন তাহলে! শুধু মীনাক্ষী মন্দির দেখেই বোধহয় চলে যাচ্ছেন?

এ কথার উত্তরেও আমি হ্যাঁ বলে পা বাড়াবার চেষ্টা করতেই তিনি বাধা দিলেন, বললেনঃ অমন ছটফট করছেন কেন! ট্রেনের দেরি আছে। এই কুলি! কোথায় মাল রেখেছেন বলে দিন না একে।

বললুমঃ ওপরে রিটায়ারিং রূমে।

কুলিকে আমার কিছুই বলতে হল না, দু তিন জন লোক ছুটে চলে গেল।

ভদ্রলোক বললেনঃ এমন তাড়াহুড়ো করেন বলে কিছুই আপনাদের দেখা হয় না, জানাও হয় না কিছু। এদেশের মানুষ জনের সম্বন্ধে তো কিছু জানলেনই না, শহরটার সম্বন্ধেও কোন ধারণা আপনার হল না।

এমন গায়ে পড়ে কথা বলার লোক আমি দেখি নি। ছাড়া পাবার আশা আমি ছেড়ে দিলুম। ভদ্রলোক বললেনঃ মাদুরা হল এ রাজ্যের দ্বিতীয় শহর। মাদ্রাজের পরেই এর স্থান। বৈগাই নদীর দু তীরে এই শহরটি দেখলে আপনি আশ্চর্য হতেন। রাতের ট্রেনে এসেছেন, না দিনের ট্রেনে?

বললুমঃ দিনের ট্রেনে।

তবে তো এই নদীর পুলের উপর দিয়েই এসেছেন। দেখেন নি নদী?

আশ্চর্য হয়ে বললুমঃ দেখি নি তো!

ভদ্রলোকও আশ্চর্য হলেন, বললেনঃ সেকি! কোথা থেকে এসেছেন বলুন তো!

রামেশ্বর থেকে।

তাই বলুন। তবে আর দেখবেন কী করে! ত্রিচির দিক থেকে এলে দেখতে পেতেন।

তারপরে তিনি আমাকে আলাগার কইলের কথা শোনালেন। এগার মাইল দূরে আলাগার পাহাড়ের নিচে একটি সুন্দর মন্দির আছে। অপূর্ব এই মন্দিরের কারুকার্য। মীনাক্ষী দেবীর ভাইয়ের নাম আলাগার। বোনের বিয়ের খবর পেয়ে তিনি মাদুরায় আসছিলেন। কিন্তু পথেই খবর

পেলেন যে বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি ভাবলেন যে বোন তাঁকে অবহেলা করেছে, তাই মাদুরায় না এসে তিনি আলাগার পাহাড়ের কোলে ফিরে গেলেন।

মীনাক্ষী মন্দিরের সবচেয়ে বড় উৎসব হয় চৈত্র মাসে। সুন্দরেশ্বর শিবের সঙ্গে মীনাক্ষী দেবীর বিবাহ উৎসব। মন্দিরের ভিতর বিবাহ হবার পরে তাঁদের উৎসব মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বেরয়। পরদিন তাঁরা বৈগাই নদী পর্যন্ত যান, নদীর ওপার থেকে আলাগারও আসেন শোভা-যাত্রা করে। তিন দিন উৎসবের পরে তাঁরা ফিরে যান নিজ নিজ মন্দিরে। সমস্ত মাদুরায় নাকি তখন আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।

ভদ্রলোক বোধহয় আরও অনেক কিছু বলতেন আমাকে, কিন্তু তার সুযোগ হারালেন। একজন কুলির সঙ্গে স্বাতি এগিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল: কুলিদের কি তুমি পাঠিয়েছ গোপালদা?

বললুম: চল আমি যাচ্ছি।

ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন, বললেন: আমাকে আগে বলেন নি কেন?

কিছু বলবার যে তিনি সুযোগ দেন নি, মুখের উপর সে কথা বলতে পারলুম না।

মালপত্র নিয়ে আমরা নিচে নেমে এলুম। তারপরেই আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে সকালের সেই ছোকরা প্ল্যাটফর্মে ঘোরা ঘুরি করছে। আমাদের দেখতে পেয়ে একটা নমস্কার করল। তাই দেখে মামী বললেন: কিছু দাও নি কি তখন?

মামার বোধহয় দুপুরে বিশ্রাম করতে না পারার ক্ষোভ ছিল। বললেন: পয়সার হরির লুট দিতে তো আসি নি এদেশে!

ট্রেন আসতেই আর একটি বুড়োকে দেখা গেল তৎপর ভাবে সাহায্য করতে। কুলিদের দিয়ে জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে চক্ষের নিমেষে সাজিয়ে দিল। মামা জিজ্ঞাসা করলেন; কে হে তুমি?

লোকটা বিনীত ভাবে জবাব দিল: আপনার চাকর।

তার মানে?

তেমনি সবিনয়ে সে বলল ঃ আপনাদের সেবা করেই খাই।

কুলিদের পয়সা মিটিয়ে মামা দুজনের মজুরি দিলেন তার হাতে। একটা নমস্কার করে সে নেমে গেল। আমিও চলে এলুম আমার তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়।

প্ল্যাটফর্মের সেই ভদ্রলোক আবার আমার কাছে চলে এলেন, বললেন ঃ কী ব্যাপাব আপনি একা!

আমি কোন উত্তর না দিয়ে হাসলুম।

সকালের সেই ছোকরাটিকেও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। করুণ ভাবে চেয়েছিল মামার গাড়ির দিকে। তাকে কাছে ডেকে মামা তার হাতেও কিছু গুঁজে দিলেন দেখলুম।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন ঃ ঐ ছোকরাটি কে?

বললুম ঃ সকালবেলায় আমাদের শাড়ির দোকানে অনেক ঘুরিয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ ধরেছিল তো! ধরবেই। যাত্রীদের ধরবার জন্যে এরা ফাঁদ পেতে রেখেছে। মন্দিরে ঢোকবার জন্যে এরা জুতো খুলে রাখতে বলে শাড়ির দোকানে। তারপরে সেই জুতো নিতে এসে চরকি বাজীর মতো পাক খেয়ে বেড়াল। গাইড় পরিচয় দিয়ে যে লোকটা আপনাকে স্টেশনে পাকড়াল, আসলে সে একটা শাড়ির দোকানের টাউট। তার নিজের দোকানে জুতো রাখবে, সেখানে গছাতে না পারলে তার ভাইএর দোকানের নাম বলবে, আর টেলিফোনে সংবাদ দেবে তাদের। আমি সরল বিশ্বাসে ভাবলুম যে দুই বৌদির জন্যে দুখানা শাড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু কী কুক্ষণে এই ইচ্ছা হয়েছিল, বৃষ্টি এসে আটকা না পড়লে দুখানা গামছা অন্তত কিনে ফিরতে হত। স্টেশনে এসে ওদের পরিচয় জানলুম—ওরা গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়—দোকানের কমিশন আর যাত্রীদের বকশিস।

ভদ্রলোকের কথা সত্য কিনা জানি নে, তবু আমি মনে মনে স্বাতিকে ধন্যবাদ দিলুম। সে বেঁকে বসেছিল বলেই তাড়াতাড়ি স্টেশনে ফিরে এই ট্রেন ধরতে পেরেছি।

আমাদের ট্রেন ছাড়ল। ভদ্রলোক প্রথমে ত্রিবেন্দ্রাম যাবেন, তারপর কন্যাকুমারী। আমার গাড়ির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন : দিন কয়েক যদি কন্যাকুমারীতে থাকেন তো আবার দেখা হবে।

৩৬

দক্ষিণ ভারতে মাদুরা একটি চৌরাস্তার উপরে। এখান থেকে সর্বত্র
যাওয়া যায় সহজে। ত্রিচিনপল্লী থেকে যে ট্রেন রামেশ্বরমে যায়, তা
মাদুরার উপর দিয়ে যায় না। মনমাদুরাইর উপর দিয়ে সোজা চলে যায়।
মাদুরায় আসবার অন্য রাস্তা, এই রাস্তাই দক্ষিণে পূর্বে মনমাদুরাই গিয়ে
মেলে। আমরা রামেশ্বরম থেকে মনমাদুরাই হয়ে মাদুরা এসেছি। এবারে
দক্ষিণে ভিরুদুনগর হয়ে তুতিকোরিনের পথে চললুম। মাদুরা থেকে আর
একটা শাখা লাইন কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়েছে।

রেলের মানচিত্রখানা আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলুম। রামেশ্বর
যাবার পথে মাদুরা দেখে গেলে রামেশ্বর থেকে কন্যাকুমারী যাবার জন্যে
মাদুরায় ফিরবার দরকার নেই। মনমাদুরাই থেকে সোজা আসা যায়
ভিরুদুনগর। সেখান থেকে তেনকাশী জংশন হয়ে কুইলনের পথে ত্রিবেন্দ্রাম
আসা যায়, আবার আমাদের মতো মনিয়াচি জংশন হয়ে তিরুনেলভেলিও
আসা যায়। মনিয়াচি থেকে তুতিকোরিন যেমন সমুদ্রের তীরে, তেমনি
তিরুনেলভেলি থেকে তো তিরুচেন্দুর। তিরুনেলভেলি থেকে ত্রিবেন্দ্রাম
যাওয়া যায় তেনকাশী ও কুইলন হয়ে।

মাদুরা থেকে মোটরে বা বাসেও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র যাওয়া যায়।
বাসে যাতায়াত এমনি আরামপ্রদ যে ট্রেন না থাকলেও অসুবিধা হত না।
মাদুরা থেকে তিরুনেলভেলির বাস আছে, ছিয়ানব্বুই মাইল পথ।
পালনি ও কোডাইকানাল পাহাড়ে যাওয়া যায়, কোর্টালমের জলপ্রপাত
দেখতে পাওয়া যায়, পশ্চিম ঘাট পাহাড়ে থেকাডির জঙ্গলেও পৌঁছনো
যায়। এক আধবার বাস বদল করে সর্বত্র যাওয়া যায়।

সন্ধ্যা ছটার পরে মনিয়াচিতে গাড়ি বদল করে রাত সাড়ে আটটায়
আমরা তিরুনেলভেলি পৌঁছলুম। আগে এই স্টেশনেরই নাম ছিল

টেনেভেলি। অন্যান্য স্টেশনের মতো এরও নাম এখন বদলেছে।

আমি কাছে যেতেই মামা বললেন: তোমার কথায় তো চলে এলুম, দেখ এখন কী করতে পার।

কুলিদের আমি রিটায়ারিং রুমের কথা বলে তার খোঁজ নেবার জন্য এগিয়ে গেলুম। ছোট স্টেশন, অ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশন মাস্টারকে বলতেই তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। চাবি দিয়ে একজন লোক পাঠালেন ঘর খুলে দিতে। প্ল্যাটফর্মে এই ঘর নয়, প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন একখানা একতলা বাড়িতে দু তিন খানা ঘর আছে সরকারী দপ্তরের পাশে। তারই নাম রিটায়ারিং রুম। দুখানা ঘর পাওয়া গেছে দেখেই মামা খুশী হলেন। কুলিদের বিদায় করে বললেন: তাহলে খেতেও বোধহয় পাওয়া যাবে।

তখন আমার সাহস বেড়েছে খানিকটা। বললুম: আমিষ খাবারই পাওয়া যাবে স্টেশনে।

মামা বললেন: তবে আর কি! মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও।

পিছনের দিকে গিয়ে বাথ রুমের ব্যবস্থা মামী দেখে এলেন, বললেন: ব্যবস্থা খুব ভাল নয়।

মন্দ না হলেই হল।

বলে মামা একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

তিরুচেন্দুরের কথা আমার মনে পড়ল। মাদ্রাজে আসবার পথে শুনেছিলুম এই তীর্থের কথা। কিন্তু কী ভাবে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করব ভেবে পেলুম না। মামা বললেন: তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

স্বাতি বোধ হয় আমার অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল। বলল: গোপালদা বিপদে পড়েছে।

বিপদ কিসের!

এক ভদ্রলোক গোপালদাকে বলেছে যে এ দেশের সবচেয়ে সুন্দর তীর্থ আছে তিরুনেলভেলির কাছে সমুদ্রের ধারে। কন্যাকুমারীর চেয়েও সুন্দর, আর এদেশের লোকের কাছে তীর্থও রামেশ্বরের মতো।

মামা আশ্চর্য হলেন স্বাতির কথা শুনে। বললেন: কী রকম?

আমি মামীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে তিনি বাক্স খুলে কাপড় গামছা বার করছেন। তাই তাড়াতাড়ি বললুম ঃ বাঙলা দেশে কার্তিকের কদর নেই, কিন্তু দক্ষিণে তিনি বিষ্ণু ও শিবের মতো পূজা পান। তাঁর অনেক নাম—কার্তিকেয় সুব্রহ্মণ্য কুমার মুরুগণ। বৈষ্ণবদের কাছে যেমন তিরুপতি বা শ্রীরঙ্গম, শৈবদের কাছে তেমনি রামেশ্বর বা তিরুচেন্দুর। তিরুত্তণি ও পালনিও কার্তিকেব মন্দিবের জন্য বিখ্যাত।

মামী কোন কথা না বলে স্নানের ঘরে চলে গেলেন। আর মামা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে তীর্থ এখান থেকে কত দূরে ?

আমি বললুম ঃ মাইল চল্লিশেক দূরে, এক্সপ্রেস বাসে যেতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে।

স্বাতি হাসছিল মুখ লুকিয়ে। মামা তা দেখতে পান নি। বললেন ঃ বাসে আবার কেন! ট্যাক্সিতে গেলে এক বেলাতেই দেখে আসা যাবে।

মামার কথা শুনে স্বাতি খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল ঃ গোপালদার কথায় তুমি রাজী হয়ে গেলে বাবা !

মামা বললেন ঃ এতে হাসবার কী আছে। দেখবার জায়গা হলে দেখব না কেন ! দেখবার জন্যেই তো বেরিয়েছি।

আমাব মনে হল যে মামার কাছে আমরা হেরে গিয়েছি। নতুন নতুন জায়গা দেখার জন্যে যে কোন ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন নেই, সেই কথা তিনি আমাদের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মামী ফিরে এলে মামা নিজেই তাঁকে বললেন ঃ তোমার তো রামেশ্বর শিব দর্শন হয়েছে, এবারে কার্তিক দেখতে চল। এ দেশে কার্তিকের এমন মান কেন, তাও জেনে আসা যাবে।

যা ইচ্ছে কর।

বলে মামী সিঁদুরের কৌটো বার করলেন।

ভোর পাঁচটার পর তিরুচেন্দুরের ট্রেন ছাড়ে। স্টেশনের কাছে বাস স্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে বাস ছাড়ে নানা জায়গার। অল্পক্ষণ পরে পরে

তিরুচেন্দুরেরও বাস আছে। কিন্তু মামা বললেনঃ চা খেয়ে ট্যাক্সিতেই যাব।

মামী বোধ হয় পয়সার কথা ভেবে বলেছিলেনঃ বাস থাকতে আবার ট্যাক্সি কেন?

মামা উত্তর দিলেনঃ আরাম করে যেতে পারলে কষ্ট করা কেন!

এ বড় লোকের মতোই কথা। এ সব কথায় আমি যোগ দিই না। মিটারহীন ট্যাক্সি ঠিক করি দরাদরি করে। যাতায়াতের জন্য এরা আট আনা মাইল দাবী করে, দূরের যাত্রা বলে ওয়েটিং চার্জ চায় না। দরাদরি করে সামান্য কিছু নামানো যায়।

ট্যাক্সি ছাড়লেই মামার কথাটা মেনে নিতে হয়। বাস আর ট্যাক্সির আরাম আকাশ পাতালের মতো। সকালের রোদ এখন মিষ্টি, বাতাস শীতল, পরিষ্কার বাঁধানো রাস্তায় মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

শহর ছাড়িয়েই আমরা একটি নদীর মস্ত পুলের উপরে উঠলুম। নিচে ক্ষীণস্রোতা নদী এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হচ্ছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এই নদীর নাম তাম্রপর্ণী, আর নদীর এপারে তিরুনেলভেলি ও ওপারে পালমকোট্টা শহর। তাম্রপর্ণীর নাম আমার মনে পড়ল। পিছন থেকে মামা জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ কোন্ নদী গোপাল?

বললুমঃ তাম্রপর্ণী। চৈতন্যদেব এই পথেই কন্যাকুমারী গিয়েছিলেন। এই তাম্রপর্ণীতে স্নান করে উড়ুপ বৃক্ষ দেখে—

সে আবার কোথায়?

বললুমঃ কন্যাকুমারীর পথে।

নদী পেরিয়েই নতুন শহর শুরু হল। নাম পালমকোট্টা। ভারতে জোড়া শহর শুনেছি কোচিন আর এর্নাকুলম, মাঝখানে সমুদ্রের উপরে পুল। এখানেও জোড়া শহর দেখলুম নদীর দুই তীরে, প্রশস্ত পুল দিয়ে যুক্ত। তিরুনেলভেলি এত দিন ভারতের দক্ষিণতম জেলা ছিল, সম্প্রতি কন্যাকুমারীকে কেরালার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকেও একটি জেলা করা হয়েছে। কন্যাকুমারী এখন মাদ্রাজ রাজ্যে।

ড্রাইভারের কাছে জানলুম যে পথ এখান থেকে নানা দিকে গেছে। পাপনাশম এখান থেকে উনত্রিশ মাইল উত্তরে। আম্বা সমুদ্রম থেকে পাপনাশম যেতে হয় তাম্রপর্ণীর জলপ্রপাত দেখতে। তেনকাশী থেকে তিন মাইল দূরে একটি জলপ্রপাত আছে। তার নাম কোর্টানম। চিত্তুর নামে একটি নদী তিনটি ধারায় প্রায় দুশো ফুট উপর থেকে নিচে নেমেছে। বহু যাত্রী যায় এই সব দেখতে।

পিছন থেকে স্বাতি বলল: এই জন্যেই বুঝি তোমার ট্যাক্সি ঠিক করতে এত সময় লেগেছিল!

আমি বললুম: যে ড্রাইভার কথা বোঝে না তার গাড়িতে চাপলে বিপদ হত পদে পদে।

মামা আমাকে সমর্থন করলেন, বললেন: খাঁটি কথা। অন্ধের সঙ্গী হতে নেই।

মামী বললেন: অন্ধ তাহলে চলবে কী করে?

তাকে চালাবার জন্যে সঙ্গী হও তাতে ক্ষতি নেই, নিজেকে চালাবার জন্যে তাকে সঙ্গী নিও না।

আমরা কন্যাকুমারীর পথ ধরলুম না, তুতিকোরিনের পথ ছাড়িয়ে তিরুচেন্দুরের দিকে অগ্রসর হলুম।

স্বাতি বলল: এত দিন আমরা জানতাম যে দক্ষিণে সমুদ্রের ধারে দুটি মাত্র জায়গা আছে—রামেশ্বর আর কন্যাকুমারী। এখন দেখছি যে অনেক জায়গার নামই আমরা শুনি নি।

সত্যিই তাই। শুধু তিরুচেন্দুর বা তুতিকোরিন নয়, আরও অনেক সমৃদ্ধ জায়গা আছে সমুদ্রের ধারে, সে সব জায়গায় ট্রেন যায় নি, কিন্তু মোটরে যাতায়াত করা যায়। তুতিকোরিন তো ভারতের একটি বন্দর, সমুদ্রগামী জাহাজ তীর থেকে ছ সাত মাইল দূরে দাঁড়ায়। যাত্রীরা মোটর লঞ্চে পারাপার করে। তুতিকোরিন থেকেও যাত্রীরা সিংহলে যায়।

মাঝপথে আবার আমরা তাম্রপর্ণীর সাক্ষাৎ পেলুম। নদীর উপরে আবার একটি চওড়া পুল। কিন্তু আমাদের নদী পেরতে হল না।

ড্রাইভার বলল যে ওপারে শ্রীবৈকুণ্ঠম নামে একটি তীর্থস্থান আছে। বিষ্ণুর মন্দির। সাধারণ বাসগুলো নদীর ওপারে শ্রীবৈকুণ্ঠমে যায়, সেখান থেকে ফিরে এসে তিরুচেন্দুর যায়। এক্সপ্রেস সোজা যায় তিরুচেন্দুর. তাইতেই সময় কম লাগে।

নটার কিছু পরেই আমরা তিরুচেন্দুরে পৌঁছে গেলুম। স্টেশন থেকে শহর কিছুটা দূরে, বাস স্ট্যাণ্ডও খুব কাছে নয়। কাজেই ট্রেনে কিংবা বাসে এলে ঝট্‌কায় উঠতে হবে মন্দিরে যাবার জন্যে। মামা তা বুঝতে পেরে বললেন ঃ দেখলে তো, ট্যাক্সিতে কেন আসতে চেয়েছি! বাসে এলে ঐ ঝট্‌কার ভেতরে পা মুড়ে ঢুকে বসতে হত।

মামী বললেন ঃ পা ঝুলিয়েও বসতে পারে একজন।

ড্রাইভার আমাদেব এমন এক জায়গায় নামাল যেখান থেকে মন্দিবের পথ শুরু হয়েছে। সদর রাস্তা থেকে এই পথ মন্দিরের দবজা পর্যন্ত গেছে। উঁচু থামের উপরে এস্‌বেস্টসের ছাদ। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে মনে হল যে পুরাকালেও এই বকমের পথ ছিল। বোধহয় ভেঙে পড়েছিল, তাই নতুন করে আবার তৈরি হয়েছে। মাঝে মাঝে পাথরের পুরনো থামও দেখা যাচ্ছে।

অনেকটা পথ আমাদের হাঁটতে হল, কিন্তু বাঁধানো বলে কষ্ট হল না। এক সময় ছোট ছোট দোকান পাট ও যাত্রীব যাতায়াত দেখে মনে হল যে মন্দিরে আমরা পৌঁছে গেছি। তাই স্বাতি বলল ঃ কই, সমুদ্র তো দেখতে পাচ্ছি না!

সমুদ্র দেখতে পেলুম মন্দিরে পৌঁছে। সমুদ্রের ধারেই মন্দির। স্বাতি আর এক মুহূর্ত দেরি করল না, মন্দিরের মণ্ডপ থেকে নেমে ছুটে গেল সমুদ্রের ধারে। তার কাঁধে ক্যামেরা আছে, সমুদ্রের ধার থেকে সে মন্দিরের ছবি নেবে।

আমিও মন্দিরে ঢুকতে পেলুম না, বাধা পেলুম পূজারীদের কাছে। তারা বললে, পুরুষদের জামা খুলে ঢুকতে হবে।

মামী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন, কিন্তু মামা গেলেন ক্ষেপে, বললেন ঃ একি অসভ্য নিয়ম!

আমি বললুম ঃ কেরালায় সর্বত্র শুনেছি এই নিয়ম। না মেনে উপায় নেই।

মামা বললেন ঃ এ কি মগের মুলুক নাকি যে যা ইচ্ছে নিয়ম করবে!

আমি দেখতে পেলুম যে মামা জামা খোলাব কোন উদ্যোগ করছেন না। বরং আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন, তোমার মামীর সঙ্গে দেখে এস।

বললুম ঃ দেখব আর কী! দরজা থেকেই কার্তিককে প্রণাম করছি।

বলে একটা প্রণাম কবে মন্দির দেখতে লাগলুম ঘুরে ঘুবে। ভারি সুন্দব এই মন্দিবটি, সামনে একটি সুন্দর মণ্ডপ, থামেব গায়ে কিছু কিছু কারুকার্য। দক্ষিণের দিকে এগিযে গিয়ে দেখলুম সমুদ্রের উদার বিস্তার, আর স্বাতি এই মন্দিরের দিকে মুখ কবে ছবি নেবার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখতে পেযেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি চেঁচিয়ে বলল ঃ ভারি মুস্কিলে পড়েছি গোপালদা, এক সঙ্গে সমুদ্র আর মন্দির কিছুতেই পাচ্ছি না।

আমি বললুম ঃ তাহলে তোমাকে উল্টো দিকে যেতে হবে।

বেশ বুদ্ধি তোমাব! ওদিকে গেলে সূর্যকে সামলাবে কী করে!

তাও তো বটে। তবে এই দিকে এস।

এ দিকেও চলবে না। মানে, এ মন্দিবের ছবি নিতে হবে বিকেল বেলায়। তা নাহলে সমুদ্রেব আশা করলে মন্দির কিছুতেই পাবে না।

বালির উপরে সূর্যের আলো ঝকঝক করছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে মন্দিরটি। মন্দিরের পিছনে একটি বিরাট উঁচু গোপুবও দেখতে পাচ্ছি। এখানে আসবার পথে এই গোপুরটি আমরা দেখতে পাই নি। সুব্রহ্মণ্যর এই মন্দিরটি আর কোন মন্দিরের মতো নয়, একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের। যেদিক থেকে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয় সেদিকে গোপুর নেই। সমুদ্র এই মন্দিরের সামনে নয়, পিছনেও নয়, পাশে। আর মন্দিরে আসবার আর একটা ঢাকা পথ সমুদ্রের ধারে ধারে অন্য দিকে গেছে।

যাত্রীদের অনেকেই সমুদ্রে স্নান করে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে, আবার

মন্দির থেকে আসছে সমুদ্রে স্নানের জন্যে। স্বাতি বলল ঃ আগে জানলে আমরাও এখানে সমুদ্রে স্নান করতাম।

আমি বললুম ঃ মন্দিরের ঠাকুর দেখবে না ?

স্বাতি বলল ঃ কার্তিক ঠাকুর আবার কী দেখব !

হেসে বললুম ঃ এ বাঙলাদেশের কার্তিক নয়, এ হল দেবসেনাপতি কার্তিক। যুদ্ধের দেবতা বলে এই দেবতা সারা দক্ষিণ ভারতে পূজো পাচ্ছেন।

সহাস্যে স্বাতি বলল ঃ ময়ূরের পিঠে বসে যুদ্ধ করতেন তো !

মামা মামী বেরিয়ে আসছেন দেখে আমরা এগিয়ে গেলুম। কাছে গিয়ে স্বাতি বলল ঃ আমরা এই দিক দিয়ে ফিরব মা। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি ঠাকুর দেখে আসছি।

আমি দুঃখ করে মামাকে বললুম ঃ আপনার এখানে ঠাকুর দেখা হল না !

মামা বললেন ঃ না হয়ে কি উপায় আছে ! তোমার মামী না দেখলে ছাড়বেন কেন !

স্বাতির জন্য অপেক্ষা করতে করতেই মামী বললেন ঃ সত্যিই এ মন্দিরটি দেখবার মতো।

কন্যাকুমারীর মন্দিরের চেয়ে যে অনেক সুন্দর পরে আমরা তা দেখতে পেয়েছিলুম।

ঠাকুর দেখে ফিরে এসে স্বাতি সমুদ্রের ধারের রাস্তা ধরে এগোল। বলল ঃ একটা নতুন কথা বল তো ?

এ রকম একটা প্রশ্নের জন্যে আমি যেন তৈরি হয়েই ছিলুম এই রকম ভাবে বললুম ঃ কার্তিক শিবের বড় ছেলে না ছোট ?

স্বাতিও তৎপর ভাবে উত্তর দিল ঃ বড় ছেলে।

বললুম ঃ হল না। কার্তিক শিবের ছোট ছেলে।

মামা বললেন ঃ সত্যি নাকি !

তবে আমরা কার্তিক গণেশ বলি কেন ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম ঃ কেন বলে তা জানি না। তবে গণেশ যে পার্বতীর বড় ছেলে সে কথা আমাদের পুরাণেও আছে। গণেশের জন্মের পর স্বর্গের সমস্ত দেবতারা দেখতে এসেছিলেন, আর শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডপাত হয়েছিল।

মামা বললেন ঃ শুনেছি সেই গল্প।

রাস্তাটি সমুদ্রের ধারে ধারে বেশি দূর যায় নি, মন্দির প্রদক্ষিণ করেছে। ডান হাতে একটি গুহার মধ্যে কিছু স্থাপত্যের নমুনা আছে। যে ব্রাহ্মণটি আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন, তিনি আমাদের দুটি দ্রষ্টব্য দেখালেন। দেওয়ালের গায়ে একটি ফুটো দিয়ে দেখতে বললেন। সমস্ত মন্দিরটি দেখা যায় এই ফুটো দিয়ে। আর গোপুর দেখাবার জন্য এক জায়গায় এনে বললেন, দেখুন তো কোন চেনা মানুষ দেখা যায় কি না!

তাঁর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে আমরা তিনজনকে দেখতে পেলুম—গোপুরের গায়ে নানা দেবদেবীর মূর্তির মাঝে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু আর নেতাজী সুভাষ। নেতাজীকে দেখেই স্বাতি খুশী হল সবচেয়ে বেশি। বলল ঃ নেতাজীকেই সবচেয়ে ভাল লাগছে।

তা লাগবেই। নেতাজীকে আমরা যে ভালবাসি।

৩৭

আমাদের আহারের সময় হয় নি, তবু আমি ড্রাইভারকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। সে বলল: ভাল হোটেল এখানে নেই, তবে সাধারণ যাত্রীর উপযোগী হোটেল আছে। বাস স্ট্যাণ্ডেও আছে একটি হোটেল। হোটেলের চেহারা দেখে আপনাদেব ভয় হবে, কিন্তু খাবারে কোন অসুখের ভয় নেই।

তারপরে বলল: যাঁরা এখানে থাকতে চান, তাঁদের জন্যে রেস্ট হাউস আছে পছন্দ মতো।

আমরা তিরুনেলভেলি ফিবছি। খানিকক্ষণ চলবার পরে ড্রাইভার বলল: এবাবে আপনারা কন্যাকুমারী যাবেন তো?

বললুম: হ্যাঁ।

সে বলল: আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। খেয়ে দেয়ে গাড়িতে উঠলে সূর্যাস্তের আগেই আপনাদেব পৌঁছে দেব।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: কী বলছে গোপাল?

বললাম: কন্যাকুমারী পৌঁছবার কথা।

মামা বললেন: মাল পত্রের কী হবে?

ড্রাইভাব বলল: তার ছাদের উপরে মাল নেবার বাবস্থা আছে, কোন অসুবিধা হবে না।

মামা চুপ করে রইলেন, আর ড্রাইভার আমাকে বলতে লাগল: কন্যা-কুমাবী যাবার একটা সোজা রাস্তা আছে। আর একটা রাস্তা নাগের কয়েল হয়ে যায়। তিরুচেন্দুর থেকেও কন্যাকুমারী যাওয়া যায়। বাস বোধহয় একবার বদল করতে হয়।

খানিকক্ষণ পরে মামা বললেন: তোমার তিরুনেলভেলিতে আর কিছু দেখবার নেই?

এ কথার উত্তর দিল ড্রাইভার। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল : মন্দির আছে একটা—শিব ও পার্বতীর মন্দির। ইচ্ছা করলে তাও দেখতে পারেন।

স্বাতি বলল : তার চেয়ে কন্যাকুমারীর সূর্যাস্ত দেখা ভাল। সে নাকি অপূর্ব দৃশ্য। পূর্ণিমার দিন চাঁদ ও সূর্য এক সঙ্গে দেখা যায়। সূর্যাস্তের সময়েই চাঁদ ওঠে আকাশে।

মামা বললেন : তবে আর কী! সূর্যাস্ত দেখতেই চল।

এই ব্যবস্থাই পাকা হল। দুপুরের আহার সেরে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করব। বেরব আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। মাইল পঞ্চাশেক পথ যেতে দু ঘণ্টা সময় লাগবে না। মাঝপথে উডিপিতে আমাদের কফি খাইয়ে দেবে।

ড্রাইভার বলল : এই ব্যবস্থায় আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। বাসে যেতে হলে আপনাদের শেষ রাতে উঠতে হত। এক্সপ্রেস বাস কন্যাকুমারী যায় না, নাগের কয়েলে গিয়ে বাস বদল করতে হত। অবশ্য এই এক্সপ্রেস বাস স্টেশন থেকেই যাত্রীদের তুলে নেয়।

বেলা তিনটের আগেই আমরা যাত্রা করলুম। তাম্রপর্ণী নদীর পুল পেরিয়ে আমরা পশ্চিমের দিকে এগোলুম। খুব সুন্দর পথ, কিন্তু পথের ধারের প্রান্তর বড় শুষ্ক। তাঞ্জোর জেলায় যেমন হরিৎ ক্ষেত্র দেখেছি চারিদিকে, এধারে তেমন নেই। তিরুচেন্দুরের পথেও কলার বাগান দেখেছি দু ধারে। এক একটি কলার চারা পোঁতা হয়েছে ক্ষেতের পরে ক্ষেতে, ছোট ও বড় চারার ক্ষেত, কিন্তু একসঙ্গে দুটি চারা নেই কোথাও। কন্যাকুমারীর পথ এক সময় রুক্ষ হয়ে উঠল। পথের দুধারে গাছপালাও আর দেখতে পাওয়া গেল না।

ড্রাইভার আমাদের বলল যে ত্রিবেন্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারীর পথ এরকম রুক্ষ নয়। পুরনো ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ছিল কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। শস্যশ্যামল সেই দেশ। প্রচুর ধান হত সেখানে, আর সমস্ত রাজ্যের লোক সেই চাল খেত। এখন এই শস্যের ভাণ্ডার

কন্যাকুমারী জেলা মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মাদ্রাজের লোক খাচ্ছে সেই চাল।

এক সময়ে আমরা উডিপি পৌঁছলুম। ড্রাইভার আমাদের একটা কফির দোকানে নিয়ে এল। কফি খেতে খেতে আমরা অনেক কথা জানতে পেলুম। তিরুনেলভেলি থেকে নাগেরকয়েলগামী সমস্ত বাস এখানকার বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ায়, মস্ত বড় ওয়েটিং হল আছে, তার সঙ্গে রেস্তোরাঁ। যাত্রীরা সবাই এখানে চা কফি খায়, খায় ইডলি বড়া, যার যা খুশি।

আমার মনে পড়ল মাধ্বাচার্যের কথা। যত দূর মনে পড়ে, এইখানে তাঁর জন্ম হয়েছিল, এবং তাঁর সাধনার স্থল এইটিই। চৈতন্য চরিতামৃতে যে উড়ুপ কৃষ্ণের কথা পড়েছি, সেও বোধহয় এইখানে। ভাল করে এ কথা জেনে নেবার মতো কাউকে দেখতে পেলুম না। কিন্তু পরে শুনেছিলুম যে সে জায়গা এখানে নয়। তা মালাবার উপকূলে।

সূর্যাস্ত দেখবার লোভে স্বাতি আমাদের সময় নষ্ট করতে দিল না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে ফিরে এসে আমরা আবার যাত্রা করলুম।

গাড়িতে বসে স্বাতি বলল : যাবার পথে শুচীন্দ্রম আমাদের দেখা হবে না মা, শুচীন্দ্রম দেখতে হবে ফেরার পথে।

মামা বললেন : কেন

স্বাতি বলল : শুচীন্দ্রম দেখতে গেলে সূর্যাস্ত আর দেখা হবে না।

আমি বললুম : তা নয়। শুচীন্দ্রমের উপর দিয়ে আমরা যাব না। শুচীন্দ্রম নাগের কয়েলের কাছে, আর আমরা অন্য পথে যাব কন্যাকুমারী।

বাম হাতে একটা পথ ধরে ড্রাইভার বলল : সোজা পথ গেছে নাগের কয়েল। ত্রিবেন্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারীর পথে এই নাগের কয়েল একটা মস্ত বড় শহর। বাসের এত বড় আড্ডা এ দিকে আর নেই।

রৌদ্রে আর উত্তাপ নেই। আর একটু পরেই যে আমরা কন্যাকুমারী পৌঁছে যাব তা বুঝতে পাচ্ছি। মামা বললেন : কোথায় আমাদের তুলবে গোপাল ?

বেরবার আগে আমি গাইড বইগুলো দেখে নিয়েছিলুম। বললুম ঃ কেরালা হাউসে।

ড্রাইভার বলল ঃ কেরালা হাউস আপনাদের খুব পছন্দ হবে। কেপ হোটেলের চেয়েও ভাল লাগবে।

মামা বললেন ঃ কেরালা হাউস কী ?

বললুম ঃ কেরালা সরকারের রেস্ট হাউস। একখানা ডবল বেড রুমের ভাড়া আট টাকা, খাবার চার্জ আলাদা।

পেড চৌল্টি্র নাম আমি করলুম না। ধর্মশালার নামেই মামী নাক সেঁটকাবেন, আর মামাও উঠবেন চটে।

ড্রাইভার আর কোন আদেশের অপেক্ষা করে নি। কন্যাকুমারী পৌঁছে সদর রাস্তা থেকে ডানদিক ঘুরে কেরালা হাউসের পিছনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারপরে সামনে পোর্টিকোর নিচে এসে থামল।

গাড়ি থেকে নেমে স্বাতি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। সামনে অকূল সমুদ্র দিগন্ত অবধি বিস্তৃত, আর তার ঢেউ এসে রাস্তার নিচেই আছড়ে পড়ছে। স্বাতি অস্ফুট স্বরে বলে উঠল ঃ এর চেয়ে ভাল জায়গা আমরা দেখি নি।

কেরালা হাউসের দুজন বেয়ারা এগিয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গে আমি ম্যানেজারের ঘরে এলুম। উপর তলার এক ধারেই দুখানা ঘর পাওয়া গেল। বেয়ারারাই আমাদের জিনিসপত্র উপরে পৌঁছে দিল।

ড্রাইভারকে মামা বিদায় দিলেন। সে বলেছিল ঃ যদি বলেন তাহলে অপেক্ষা করি। ত্রিবেন্দ্রামে পৌঁছে দিতেও আমার আপত্তি নেই।

এর উত্তরে মামা ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ঃ ক দিন থাকব তার ঠিক নেই।

উপরে চা পাঠাবেন কিনা, ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এর উত্তরে স্বাতি বলল ঃ না না, এখন আমরা সূর্যাস্ত দেখতে বেরব।

ম্যানেজার হেসে বললেন ঃ সূর্যাস্তের এখনও দেরি আছে। এক পেয়ালা চা খেয়েও বেরতে পারবেন।

পূব দিকে এর অত্যাচার নেই। অন্য ধারে বালির রঙও অন্য রকম। তিন সমুদ্রের বালি এখানে কিনতে পাওয়া যায় বাজারে।

পশ্চিমের আকাশ তখন নানা রঙে ভাস্বর হয়েছে। বিশ্বকর্মার রঙের বাক্সে এত রঙও আছে! কিন্তু সূর্য কোথায়! এই একটু আগেই তো মেঘের আড়ালে দেখেছিলুম!

স্বাতির মতো আরও অনেকে ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত আছে। স্বাতি উসখুস করছে ছবি নেবার জন্যে। কিন্তু যার ছবি নেবে সে বড় বেরসিক। হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হল, কেউ দেখল না। আকাশ তার প্রতিদিনের প্রসাধনের ত্রুটি করে নি। সমুদ্রের উচ্ছল তরঙ্গে দেখেছে তার প্রতিবিম্ব। কিন্তু যার জন্য এই প্রসাধন, সে নাগর চাতুরিতে ভরা। অনাদি কাল ধরে এই লুকোচুরির খেলা খেলেও তার ক্লান্তি নেই এতটুকু।

সিরসিরে বাতাসে খানিকটা বালি উড়ল। পূবের আকাশ থেকে এবারে ছায়া নামছে, নিঃশব্দে আমরা শহরের দিকে পা বাড়ালুম।

কেপ হোটেলের পরে আমাদের কেবালা হাউস। পিছনের দিকে একটু আড়ালে নাকি সস্তার রেস্ট হাউস আছে একটা। আর একটু এগিয়ে ডান হাতে সেই অদ্ভুত সুন্দর গৃহ—গান্ধীস্মৃতিমন্দির। এই তিনতলা মন্দিরটি খুব সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু মামী সে দিকে গেলেন না, বললেন: যে মন্দির দেখতে এসেছি, সেই দিকেই চল।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: মন্দির দেখতে তো আসি নি!

আমি বুঝতে পারি যে এই উত্তর দিয়ে মামা মামীকে স্মরণ করালেন যে তিনি মন্দির দেখতে আসেন না, আসেন মন্দিরের ঠাকুর দেখতে। কিন্তু মামী আজ কোন বাদানুবাদ করলেন না।

স্বাতি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কোন্ দেবতার মন্দির এখানে বল তো?

বললুম: কন্যাকুমারীর।

কন্যাকুমারী কে?

তাতো জানি নে।

স্বাতি খুশী হল অপরিসীম, বলল: দেখেছ বাবা, এত দিনে গোপালদা হার মেনেছে।

আমি হাসলুম তার আনন্দ দেখে, বললুম: তোমার কাছেই তাহলে গল্পটা শুনি।

স্বাতি বলল: বাণাসুরের গল্প। কঠোর তপস্যা করে বাণাসুর ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন যে দেব দানব যক্ষ নরনারী গন্ধর্ব কিন্নর কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। বাণাসুর তারপরে ত্রিভুবন জয় করে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাড়ালেন অমরাবতী থেকে। নির্বাসিত ইন্দ্র যজ্ঞ করলেন বিষ্ণুর পরামর্শে। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে এক কুমারী কন্যার জন্ম হল। এই কন্যাই বধ করলেন বাণাসুরকে। কিন্তু তার আগেই দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়ে গেল। ইন্দ্র প্রমাদ গুনলেন, এই কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে বাণাসুরকে বধ করবে কে! ইন্দ্র তাই দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হলেন, বললেন, এ বিবাহ পণ্ড করতেই হবে। নির্দিষ্ট দিনে শিব কৈলাস থেকে যাত্রা করলেন সেজে গুজে ষাঁড়ের পিঠে চেপে। লগ্ন উত্তীর্ণ হবার আগে তাঁকে কন্যাকুমারী পৌঁছতেই হবে, তা না হলে শর্ত মাফিক এ বিয়ে আর হবে না। কিন্তু জ্ঞানারণ্যে অত্রি মুনির আশ্রমের কাছে এসেই তিনি নারদের সাক্ষাৎ পেলেন। নারদ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা জুড়ে দিলেন। সে আলোচনা শেষ হবার আগেই লগ্ন পার হয়ে গেল। শিব তাই জ্ঞানারণ্যেই রয়ে গেলেন, জ্ঞানারণ্যেরই নাম এখন শুচীন্দ্রম। আর এই কন্যাকুমারীতে আজও অপেক্ষা করছেন সেই কুমারী কন্যা।

মামা বলে উঠলেন: সাবাস, কে বলে আমাদের মেয়ের ধর্মজ্ঞান নেই!

সগৌরবে স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: এইবারে তুমি একটা নতুন কথা বলতো!

বললুম: কন্যাকুমারীর কপালে এক খণ্ড হীরে আছে, তার আলো দেখে জাহাজের নাবিকরা লাইট হাউস ভাবত। ভুল করে অনেক জাহাজ ডুবেছে বলে মন্দিরের পূর্বদ্বার এখন বন্ধ রাখা হয়।

সবিস্ময়ে স্বাতি বলল: এ অসম্ভব কথা।

আমরা মন্দিরের উত্তর দরজায় এসে পৌঁছলুম। সমুদ্রের ধার দিয়ে

না এসে আমরা সদর রাস্তা ধরে বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরে এলুম। দুধারে ছবি ও ফুলের দোকান, টুকিটাকি নানা জিনিস বিক্রি হচ্ছে। একটা তোরণ পার হতেই প্রহরী আমাদের বাধা দিল, বলল: পুরুষদের জামা খুলতে হবে।

এক ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বললেন: আমার হাতে দিন।

এক মুহূর্ত দেরি না করে আমি আমার জামা আর গেঞ্জি খুলে তাঁর হাতে দিলুম। ব্রাহ্মণ তা একটা দোকানে জমা দিল।

মামা ইতস্তত করছিলেন। আমি তার কারণ অনুমান করতে পারি। পয়সা কড়ি কোথায় রাখবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। মামী বললেন: আমার হাতে দাও।

ব্রাহ্মণ তখন আমাকে বোঝাচ্ছিলেন যে প্যাণ্ট পরে এলেও অসুবিধা নেই, ওপরে একটা ধুতি জড়িয়ে নিলেই হল। কিন্তু গায়ের জামাটি খুলতেই হবে। শিশুরা শর্টস পরে ভিতরে যাচ্ছে দেখলুম, কিন্তু একটি বালকের প্যাণ্টের উপরে একখানা গামছা জড়িয়ে নিতে বলল।

ব্রাহ্মণ আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুরে পূর্বের দরজা দিয়ে ঢুকলুম। এদিকে মন্দিরের দেওয়ালেও একটি দরজা আছে, সেটি বন্ধ। ব্রাহ্মণ বললেন: এইটি মন্দিরের প্রধান দ্বার, কিন্তু বছরে মাত্র একটি দিন খোলা হয়।

স্বাতি এই কথা শুনে আমার দিকে তাকাল।

ব্রাহ্মণ বললেন: এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধাপে ধাপে সমুদ্রের জলে নামা যায়। ঘাটের সামনে যে দুটি ন্যাড়া পাহাড় দেখা যায়, তারই নাম বিবেকানন্দ রক্স্। স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্র সাঁতরে ঐ পাহাড়ে বসে তপস্যা করেছিলেন। ঐ পাহাড়ে তাঁর স্মৃতি মন্দির গড়বার কাজ শুরু হয়েছে।

ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে আমরা মন্দিরের ভিতরে এসে ঢুকলুম। প্রদীপে আর ফুলের মালায় মন্দিরের অভ্যন্তর আজ সজ্জিত হয়েছে। ধূপ দীপ বাদ্য ও উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে আমরা কন্যাকুমারীকে দেখলুম। চন্দনচর্চিতা কুঙ্কুম-রঞ্জিতা বালিকা মূর্তি, বসনে ভূষণে মাল্যে ও সৌরভে

তাঁর অধিবাস তখন সম্পন্ন হয়েছে। শিবের আগমনের প্রতীক্ষায় দেবীর এখন মোহিনী মূর্তি।

স্বাতি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মামী পিতলের হাতলে মাথা রেখে তন্ময় হয়ে গেছেন। এখানেও দেবীর কাছে যাবার রীতি নেই।

খানিক ক্ষণ পরে স্বাতি বলল: একটা নয় গোপালদা, দুটো হীরে দেখছি। একটা কপালে আর একটা নাকে। নাকের হীরেটা অমন প্রদীপের শিখার মতো দেখাচ্ছে কেন!

ব্রাহ্মণ বললেন যে সকালের দর্শন অন্যরকম। বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু শিব আসেন নি। সে কী অপরিসীম ক্ষোভ তাঁর! গলার মালা আর পুষ্পাভরণ ছিঁড়ে ফেললেন, খুলে ফেললেন মহার্ঘ বসন ভূষণ। প্রেম যাঁর ব্যর্থ হল, কী প্রয়োজন তাঁর বাহিরের আড়ম্বরে! দেবীর সেই অবক্ষণীয়া কুমারী মূর্তি দেখি সকালের দর্শনে।

মন্দির ছেড়ে চলে আসতে আমাদের মন চাইছিল না। ব্রাহ্মণ বললেন: আজ রাতে আবার আসবেন, মন্দিরে উৎসব আছে।

আমরা এ কথার কোন উত্তর দিলুম না।

রাতে আমি জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। দুরন্ত বাতাসে দু ধারের পর্দা দুলছে, আর সমুদ্রের একটানা ডাক আসছে ভেসে। সামনের পথে ও প্রাঙ্গণে সমুদ্রের নীল জলে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। কী উদার অনাবিল মুক্তি! ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে এই মুক্তির আস্বাদ যেন পুরো-পুরি পাওয়া যাচ্ছে না।

মামা একখানা আরাম চৌকিতে বসে পাইপ ধরিয়েছিলেন। খানিকটা ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করে বললেনঃ ঘরে বুঝি মন টিঁকছে না?

নিঃশব্দে আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালুম।

মামা বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের কথা। বললেনঃ বেশি দেরি কোরো না যেন!

আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করলুম না। পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলুম ঘর থেকে। পাশের ঘর থেকে স্বাতি আমাকে কটাক্ষে দেখল। যেন দেখতে পায় নি, এমনি ভাবে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

পথে নেমে আমি একবার পিছন ফিরে দেখলুম। না, পিছনে কেউ আসছে না। আমাদের জানালার দিকেও একবার চেয়ে দেখলুম। মনে হল যে কেউ সরে গেল জানালার সামনে থেকে।

মন্দিরের দিকে খানিকটা এগিয়ে আমি শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেলুম। মৃদঙ্গ ও নাগস্বরমের শব্দও ভেসে আসছে। কিন্তু মন্দিরের দিকে আমার পা গেল না। মন টেনেছে যে রাক্ষসী, পা দুটো সেই দিকেই গেল। গান্ধী স্মারক মন্দিরের ভিতর দিয়ে দেওয়ালের সরু ফাঁক দিয়ে গলে মাতৃতীর্থের ঘাটের কাছে চলে এলুম। ঘাটের উপরের ছোট মণ্ডপটি এখন জনশূন্য, কয়েক ধাপ নিচে নেমে আমি একেবারে জলের কাছাকাছি গিয়ে বসলুম। মনে হল যে প্রকৃতির এমন রূপ আমি এ জীবনে আর দেখি নি।

জলের শেষ নেই চোখের সামনে, ঢেউএরও শেষ নেই। একটার পর আর একটা ঢেউ এসে পায়ের উপরে আছড়ে পড়ছে। চতুর্দশীর চাঁদের আলো এই তরঙ্গ বিক্ষোভের উপর ঝিকমিক করছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে একটানা বিরামহীন বৈচিত্র্যহীন। ঝড়ের মতো বাতাস বইছে, বিস্রস্ত বিপর্যস্ত করে যাচ্ছে গায়ের জামা কাপড় আর মাথার চুল।

পূর্ব দিকে মন্দিরের প্রাকার উঠেছে সমুদ্র গর্ভ থেকে। ক্রমে সেই ভূমি সংকীর্ণ হয়ে সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে শেষ হয়েছে। লোকে একেই বলে ল্যাণ্ড্স্ এণ্ড্। ভারতের মাটির এই শেষ।

খানিকটা জল পেরিয়ে সেই পাহাড় দুটো অন্ধকার জড়ো করে আছে। মাথাকাটা বেঁটে পাহাড় দুটোকে চারিদিকের ঢেউ এসে অবিরাম আক্রমণ করছে। জব্বলপুরের মার্বল পাথর হলে ক্ষয়ে এত দিনে নিঃশেষ হয়ে যেত। এই পাহাড়েরই নাম বিবেকানন্দ রক্স্, বিবেকানন্দর মতোই অটল আর অক্ষয়।

মনে পড়ল, একদিন ভিক্ষা করে স্বামীজী এসেছিলেন কন্যাকুমারী। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন মাদুরায়। গুরুকে শিকাগোর সর্বধর্ম মহাসভায় পাঠাবার ব্যয়ভার বহন করতে তিনি রাজী ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী ভিক্ষা করে পাথেয় সংগ্রহ করে এলেন কন্যা-কুমারী। তাঁর ইচ্ছা হল যে ঐ পাহাড়ে বসে এই ভারতকে দেখবেন। সাঁতরে তিনি সমুদ্র পার হলেন।

কিন্তু ঐ পাহাড়ের উপরে বসে ধ্যানমগ্ন নেত্রে তিনি ভারতের অন্য রূপ দেখলেন। ভুখা মূর্খ ভারতবাসী আজও পশুর মতো জীবন যাপন করছে। বিদেশীরা যুগ যুগ ধরে এদেরই বুকের রক্ত খেয়ে দু পা দিয়ে সবাইকে পদদলিত করছে। ভাবলেন, এদের দর্শন শেখাবার চেষ্টা কি পাগলামি নয়! খালি পেটে কি ধর্ম বোঝা যায়! বিবেকানন্দ বুদ্ধ হয়েছিলেন এই পাহাড়ে বসে। তাইতেই আজ ঐ পাহাড়ের মাথায় তাঁর স্মৃতি মন্দির গড়বার ব্যবস্থা হচ্ছে।

কে একজন নিঃশব্দে আমার পাশে এসে বসেছিল, খেয়াল করি নি। আমারই মতো কোন পাগল ভেবেছিলুম। কিন্তু চমকে উঠলুম তার

আঁচলের স্পর্শে। হাতের চুড়ির সঙ্গে তার আঁচল সমালাবার চেষ্টা দেখলু আর তার চুলের সৌরভে তাকে চিনতে আমার সময় লাগল না।

স্বাতি!

স্বাতিই তো। হেসে বলল : অমন গভীর ভাবে কী ভাবছ বল তো!

কী ভাবছি!

মন তোমার এ রাজ্যে তো নেই!

বললুম : একা বেরিয়ে এসেছ তুমি, অনুমতি পেয়েছ তো!

অনুমতি!

স্বাতি আবার হেসে বলল : অনুমতি না পেয়ে তা অমান্য করাব চেয়ে না চাওয়াই তো ভাল। নিজের কর্তব্য নিজে স্থির করতে না পাবলেই অনুমতির দরকার।

পথে বেরবার সময় আমি স্বাতির কথাই ভেবেছিলুম। তার সমস্ত সাহস আর দর্প কি আজ এইখানে এসে এই পরিবেশের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল! মায়ের শাসনটাই আজ তার কাছে বড় হয়ে উঠল! কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তাকে পাশে দেখে আমার ভাবনাই হল বেশি। বললুম : তারপর?

স্বাতি বলল : দোহাই তোমার। তার পরের কথা আজ আর ভাবতে পারছি না।

একটানা গর্জন আসছে সমুদ্রের, পায়ের নিচে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। বাতাসে স্বাতির আঁচল উড়ছে, আর আকাশে আলোর প্লাবন। স্বাতি বলল : কী ভাবছ তা বললে না তো!

বললুম : আমার ভাবনার কথা থাক। তুমি কেন এলে তাই বল।

স্বাতি বলল : সে কথাও থাক।

একটা বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। ফেনা আর জল ছিটকে এল উপরে। আস্তে আস্তে বললুম : সেদিন আমার গভীর অপরাধ হয়েছে।

কিসের অপরাধ!

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

তোমাকে মন্দিরে এনে হারিয়ে ফেললুম, সে আমার অপরাধ নয়।

দৃঢ়স্বরে স্বাতি বলল : রামেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিয়েও কি তোমার দায়িত্ব ফুরোবে না ! এ যদি অপরাধ হয় তো—

স্বাতি থেমে গেল, সম্পূর্ণ করল না তার কথা। খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম : তোমার সাহসকে ধন্যবাদ দিই, এই সাহস তোমাকে বড় করবে। কিন্তু ভয়ে সেদিন আমার বুক শুকিয়ে উঠেছিল। এত দিন কোন দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন হয় নি বলেই অমন হয়েছিল। সেদিনের ব্যর্থতা আজও আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধছে।

দুরন্ত সাগর দূর থেকে গর্জন করে উঠল।

এক সময় স্বাতি বলল : তোমার সঙ্গে আমার তফাত কত গোপালদা ! তুমি স্বাধীন, তোমার স্বাধীনতায় কেউ কোন দিন হাত দেবে না।

হেসে বললুম : সত্যি। নটা কুড়ির লোকালে হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে আসব কলকাতা, বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার। দশটা পাঁচটা কলম পিষে আবার সেই পাঁচটা তিরিশের লোকাল। কী সুন্দর স্বাধীনতা বল।

স্বাতি বলল : সেও আমার চেয়ে ভাল। মনের ওপর ছাপ না পড়লে তাকে স্বাধীনতাই বলব। ইংরেজের জেলে বন্দী ছিলেন নেতাজী, তাঁর স্বাধীনতা তাতে কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় নি।

হেসে বললুম : তোমাকে পরাধীন করল কে ?

গভীরভাবে স্বাতি বলল : দেশে ফিরে আমাকে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে সব মেয়েই করে, আমিও ভয় পাই নে বিয়ে করতে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে হবে যাকে, আমি তাকে মানুষ ভাবি নি।

আমি চমকে উঠলুম তার কথা শুনে, চোখের দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন জানালুম তাকে।

স্বাতি আমার প্রশ্ন দেখতে পেল না, তবু বলল : লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে। মনুষ্যত্ব বিকিয়ে সাহেবিপনা এনেছে সেখান থেকে। তার সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, দরকার বান্ধবীর। আর সে দরকারটাও—

স্বাতি শেষ করল না তার কথা, আমিও কোন প্রশ্ন করলুম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এক এক সময় মনে হয় যে তার গলায় মালা দেবার চেয়ে রামখেলাওনের সঙ্গে ইলোপ করাও আমার কাছে মঙ্গলের মনে হবে।

মানুষের মনের উপরে জোর খাটে শুধু মনেরই। মুখে তাই তর্ক করার প্রবৃত্তি হল না।

স্বাতি বলল : কন্যাকুমারীর সান্ত্বনা ছিল মনে। শিব তাঁকে গ্রহণ করেন নি সত্য, কিন্তু গ্রহণ করে প্রবঞ্চনা করেন নি। প্রত্যাখ্যানের আঘাত আছে, কিন্তু প্রবঞ্চনার পরিতাপ নেই।

এত জল, এত আলো, এমন আকাশ, এমন অসীম উদার পরিবেশেও স্বাতি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারল না। বলল : তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে গোপালদা। বল রাখবে ?

কিছু না জেনেও বললুম : রাখব।

দেশে ফিরে বাবার কাছে কোন অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট কোরে না।

স্বাতির কাছে আমি কি বড় হয়ে উঠতে পেরেছি যে সে আমার ছোট হবার কথা ভাবছে ! এক বেদনার্ত আনন্দে আমি বললুম : আমি কী ভাবছি জান ?

বল।

আমি ভাবছি, এই দিনগুলো আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল।—

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মূরতি।

স্বাতি প্রতিবাদ করল কঠোর ভাষায়। বলল : ভুল। এ হচ্ছে দুর্বলের মনোভাব। আঙুর খেতে না পেয়ে তাকে টক ভেবে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা। তোমার কবি বলেছেন—হেথা মোর তিলে তিলে দান। কিন্তু তুমিই বল, হৃদয় কি তিলে দিলে দেবার জিনিস ! না কাউকে দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় !

একটু থেমে বলল : ব্রাউনিঙকে তাই আমার ভাল লাগে। বলিষ্ঠ

…নর পরিচয় আছে তাঁর কবিতায়। পরম পাওয়ার মুহূর্তকে ধরে রাখবার জন্যে পরফিরিয়াকে হত্যা করেছে তার লাভার।

বললুম: কাব্যে আর জীবনে অনেক তফাৎ আছে। আঙুর টক লে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দের মুহূর্তকে চিরন্তন করবার জন্যে প্রিয়ার গলায় চুল জড়িয়ে তাকে হত্যা করা যায় না।

স্বাতি বলল: সেই মুহূর্তকে ধরে রাখার চেষ্টাতেই যে পৌরুষ, সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।

বাতাস আরও দুরন্ত হয়ে উঠেছে। অসভ্যের মতো খেলা করছে স্বাতির আঁচল আর চুলের সঙ্গে। কাছে ও দূরে সর্বত্র সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গ ভঙ্গ, আর তার নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর গর্জন। অস্পষ্টভাবে স্বাতি বলল: Who knows but the world may end to-night!

আজ রাতেই যে পৃথিবীর শেষ নয় তা কে জানে?

আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে বসেছে নক্ষত্রের নৃত্য সভা। নিচে মরা দুজন। এমন পরিপূর্ণতার মধ্যেও যেন অসম্পূর্ণতার আভাস চ্ছি। মুখে তাই উত্তর এল: পূর্ণিমার আরও একটি দিন বাকি স্বাতি, াজই সব কিছুর শেষ চেয়ো না।

তামিল পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভ্রমণের আনন্দ চিরন্তন—নূতন দেশ দেখার বাসনা একটা নেশার মতো। ারা ভ্রমণ করেন, তাঁদেব কাছে তো অপরিহার্য; যাঁরা ভ্রমণ না করেও ভ্রমণেব আনন্দ পেতে চান, তাঁরাও ববীন্দ্র-পুবস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর আশ্চর্য গ্রন্থ বম্যাণি বীক্ষ্যর পর্বগুলি পব পর পড়ে যান। ভ্রমণেব শখ তাঁদের অনেকাংশে মিটবে।

বম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমেব একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহাবি'। তাব মানে, বম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল তারই কথা। আব বাস্তবিকই ম্য-দর্শনই হল রম্যাণি বীক্ষার মূল সুব, তাব বিস্তার অতীতেব ঐতিহ্য লোচনায়। ভারতেব বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোবম দ্রষ্টব্য স্থান ছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তাব বিববণ লিপিবদ্ধ কবে গ্রন্থকার ধারাবাহিক ভাবত দর্শনেব কাহিনী পাঠকেব সামনে উপস্থাপিত কবেছেন। এই গ্রন্থে ভারতেব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, পৌবাণিক কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। এতে সমগ্র ভারতেব বিচিত্র দর্শনায় স্থান-গুলির সবিস্তার বর্ণনার সূত্র ধবে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট-আলোকিত কুঠরিতেও যথেষ্ট আলোকপাত কবেছেন। তীর্থ-মাহাত্ম্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকাব মন্দির-স্থাপত্যের বা সংশ্লিষ্ট তীর্থ ও জনপদেব বর্তমান পরিচয় দানেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাব অতীত কাহিনী কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে বিবৃতি হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ—নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভাবতেব একটি সামগ্রিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পাঠকেব দৃষ্টির সমক্ষে।

শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর পাশে পাশে একটি রম্যকাহিনীও গ্রথিত আছে। এই জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনী বইগুলিব ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চাব করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এ গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসরসসিক্ত—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাঁদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এ সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। কিন্তু সামাজিক মাপকাঠিতে গোপালের বাজারদর যাই হোক, সুরুচি ও সুশিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন আর গোপালও স্বাতির চোখের তারায় আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। ফলে সেও হল তাঁদের সহযাত্রী।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ধরা দেবার মতো সহজ পাত্রীও সে নয়। সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুর ও পক্ষী তীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কর্ণাট পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কেরালা রাজ্য থেকে নীলগিরি, সেখান থেকে মহীশূর রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত দেখা গেল। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়। মামা গোপালকে গরিব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু নিতান্ত সামাজিক কারণে মামীর তাতে গভীর আপত্তি।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্যস্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **মহারাষ্ট্র পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুণা ভ্রমণে ব্যস্ত। তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু বিদিশা ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ও খাজুরাহো।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল শ্বেতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা। কুমায়ুনের শৈলাবাস ও হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলির পরিচয়ও এতে বাদ পড়ে নি।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা-মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে

কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্যদিকে ক্ষীরভবানী ও অমবনাথে যাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীব সারা বিশ্বেব বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামেব পবিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও অহোম বাজাদের সভ্যতাব কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগারাজ্য ও মণিপুরেব কথা এবং এই স্বল্প পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়। .

এব পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুবাব কথা। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়েব কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

বাকী আছে **পশ্চিম বাঙলার** কথা।